৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ১ম খণ্ড।

তৃতীয় বর্ষ।

নানাবিধ বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও বেদব্যাস পূর্ণ দুইটি বৎসর স্বকার্য্য-সাধন করিয়া তৃতীয় বৎসরের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। বেদব্যাস ভবিষ্যতে কিরূপ দক্ষতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা স্বয়ং ভগবান্ হরির কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের নিজের এমন কোন ক্ষমতাই নাই যদ্দ্বারা আমরা, বেদব্যাস যে উদ্দেশ্য লইয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সংসিদ্ধ করি। সরল ভাবে বলিলে, ইহাই আমরা বলিতে বাধ্য, যে, বেদব্যাস একদিনও আমাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হয় নাই। বেদব্যাস কেনইবা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন এবং কিরূপেই ইহা পরিচালিত হইতেছে, তাহা অবগত হইলে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা বুঝিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। আমরা সময়ান্তরে ও স্থানান্তরে তাহা প্রকাশ করিব। বেদব্যাসের উদ্দেশ্য উচ্চ—অতি উচ্চ। ভগবানের কৃপা ব্যতিত কেবল মানুষের কর্ত্তৃত্বে সে উদ্দেশ্যসাধন হওয়া অসম্ভব; সুতরাং

আমাদের সমস্ত আশা ভরসা তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রমান্বয় দুই বৎসর ধরিয়া বেদব্যাসকে সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দেখিয়াও, বেদব্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। এবং তাহা না পারিয়াই তাঁহারা স্বকপোল কল্পিত নানা কারণ নির্ণয় করিয়া বেদব্যাসের সেবকগণকে অন্যায় আক্রমণ করিয়া বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কএকমাস ধরিয়া মাসিকপত্র নবজীবনে এই ভাবের কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লেখক এই সমস্ত প্রবন্ধ প্রকটন করিয়াছেন। ইহা ব্যতিত বেদব্যাসের প্রধান হিতৈষী ও লেখক শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার মহাশয়দিগের উপর অতি তীব্র কটাক্ষ করিতেও লেখক কোনরূপ সঙ্কুচিত হয়েন নাই। আমরা এরূপ বিবাদ বিসম্বাদের বড়ই বিপক্ষ, সুতরাং বেদব্যাসে এ সমস্ত ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতিবাদেও অনিচ্ছুক। সাধারণের বিশ্বাস যে, "বঙ্গবাসী এবং বেদব্যাস এ উভয়ই চূড়ামণি মহাশয়ের কাগজ এবং এই উভয় কাগজে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তৎসমস্তই তাঁহার অনুমোদিত"। ইহা অপেক্ষা ভ্রমাত্মকবিশ্বাস আর কি হইতে পারে। চূড়ামণি মহাশয় নিজে কখন এরূপ কথা বলেন নাই যে, বঙ্গবাসী কি বেদব্যাসে যাহা প্রকাশিত হয়, সমস্তই তাঁহার অনুমোদিত, বরং তিনি ইহার বিপরীত কথা বঙ্গবাসীতে লিখিয়া কাহারও সহিত যে তাঁহার কোনরূপ বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ নাই তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বিশেষরূপই জানি যে, বঙ্গবাসীর অনেক কার্য্যই আচার্য্যদেব অনুমোদন করেন না। অথচ অজ্ঞলোকে যেরূপ বঙ্গবাসীর সকল কার্য্যেই, আচার্য্যদেবকে জড়িত করিয়া নানারূপ শ্লেষবাক্যে তাঁহাকে বিরক্ত করে, সেইরূপ উক্ত প্রবন্ধ লেখক বিপথে পড়িয়া বেদব্যাসের লেখকদিগকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। বেদব্যাস ও নবজীবনের উদ্দেশ্যের পার্থক্য কতদূর, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে আমরা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের লিখিত "নবজীবন ও বেদব্যাস" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়া তৃতীয় বর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

নবজীবন ও বেদব্যাস।

নবজীবন ও বেদব্যাস এ উভয়ের মধ্যে কে দোষী ও কেই বা নির্দ্দোষী? নবজীবনের "নিরপেক্ষ" মীমাংসায় স্থিরীকৃত হইতেছে যে বেদব্যাস দোষী! যদি বেদব্যাস বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরিচালিত না হইয়া কিয়ৎপরিমাণেও নিরপেক্ষ হইতে পারিতেন.. তাহা হইলে হয়ত নির্দ্ধারিত হইতে পারিত যে, নবজীবনই দোষী। কারণ নিরপেক্ষমীমাংসার মূলসূত্র এই যে, আমি ভিন্ন অন্য সকলেই অজ্ঞানী ও অধার্ম্মিক, অতএব দোষী। সে যাহা হউক, আমরা এ সমস্ত গভীর প্রশ্নের আলোচনা করিতে একান্তই অক্ষম। তবে নবজীবনে ও বেদব্যাসে কি পার্থক্য আমরা সংক্ষেপে তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

১। নবজীবন ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন। বেদব্যাস সংরক্ষণের পক্ষপাতী। নবজীবন বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিমার্জ্জন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন না করিলে, ইহা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইবে না। বেদব্যাস বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মকে সময়ের উপযোগী করিতে চেষ্টা না করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজকে হিন্দুধর্ম্মের উপযোগী করা উচিত। নবজীবন বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মকে কোন কোন স্থলে নবীন উন্নতির বশবর্ত্তী না করিলে, উহা লোকের মনে প্রভুত্ব করিতে পারিবে না। বেদব্যাস. বলেন, যে হিন্দুধর্ম্ম নিষ্কলঙ্ক, যদি হিন্দুসমাজ নিষ্কলঙ্ক হইতে চায়, তবে পুনরায় ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করুক। অন্য অন্য সর্ব্বস্থানেই সংস্কার ও সংরক্ষণের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছে, নবজীবন ও বেদব্যাসেও সেই বিবাদই চলিতেছে।

২। কালসহকারে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচারে, যে সমস্ত অশাস্ত্রীয় আবর্জ্জনা পতিত হইয়াছে, সে গুলি বিদূরিত করার উপায় কি? নবজীবন বলেন, হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইয়ুরোপীয় চিন্তা ও যুক্তির মিশ্রণ। বেদব্যাস বলেন, হিন্দুধর্ম্মের পুনরালোচনাই হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করার প্রধান উপায়। নবজীবন বলেন, ব্রীটিশ ফরমাকোপীয়া ভিন্ন অন্য কোথাও আত্মার পীড়ার ঔষধ নাই। বেদব্যাস বলেন, যে হিন্দুর নিদানেই হিন্দুর আত্মার মহৌষধ বর্ণিত আছে।

৩। নবজীবন বলেন যে, যুক্তিই সন্মার্গ প্রদর্শন করিতে পারেন। বেদব্যাস শাস্ত্রীয় উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তদনুসারেই নিজ জীবন

নিয়মিত করেন। বেদব্যাস যুক্তির অবমাননা করেন না। তবে, বেদব্যাস নিজ যুক্তির অনুসরণ না করিয়া ঋষিগণের যুক্তির অনুসরণ করেন। বেদব্যাস মনে করেন যে, অধুনাতন পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের যুক্তি অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের যুক্তির মূল্য ও সারবত্তা অনেক অধিক।

৪। নবজীবন সর্ব্বজনীন উদারতা চাহেন। তিনি বলেন যে অন্য কোন ধর্ম্ম বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করা অনুচিত। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উদারতা দুই প্রকারঃ—প্রকৃত ও বিকৃত। যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও মৃত্তিকা, বিষ্ঠা ও চন্দন, হস্তী ও পিপীলিকা, আত্ম ও পর, এ সমস্তে তুল্যজ্ঞান করিতে পারেন, তাঁহার উদারতা প্রকৃত উদারতা। যদি নবজীবনের এ উদারতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি নবজীবন ও বেদব্যাসে এত প্রভেদ করিতেন না, তাহা হইলে তাঁহার নিকট উভয়ই তুল্য বলিয়া বোধ হইত। বিকৃত উদারতা স্বতন্ত্র পদার্থ। নিজের প্রতি অনাদর, অন্য সকল বস্তুর প্রতি উপেক্ষা, আলস্য প্রভৃতি তমঃ প্রধান প্রবৃত্তি সমূহ, বিকৃত উদারতার মূল। পুত্রহীন ব্যক্তি কোন শিশুকেই প্রকৃত স্নেহ করে না। তাহার নিকট সকল শিশুই তুল্য। সুতরাং শিশু সম্বন্ধে তাহার এক প্রকারের উদারতা আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐ উদারতা বিকৃত উদারতা। যাহার পুত্র আছে, সে নিজ পুত্রকে অন্য সকল শিশু অপেক্ষা রূপবান্ ও গুণবান্ বলিয়া মনে করে। বেদব্যাস হিন্দুধর্ম্মকে ভক্তি করে। সুতরাং, বেদব্যাস হিন্দুধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা ভাল বলিয়া মনে করে। ইহা অনুদারতা বা সঙ্কীর্ণতা হইলেও বিকৃত উদারতা নহে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আবশ্যকতা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভারতের প্রাণের ধর্ম্ম, ভারতবাসীর শরীর মন অস্থি মাংস মেদ মজ্জার অনুকূল ধর্ম্ম; ভারতের জল, ভারতের বায়ু, ভারতের আকাশ এবং ভারতের মাটীর যদি কিছু উপাদান থাকে, তবে সমষ্টিভূত সেই উপাদান হইতেই এই

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। এবং উহা ঐরূপ উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়াই—অদ্য সেই শ্রবণ প্রিয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সুমহান্ সর্ব্বব্যাপী বিস্তা-রের পর, দুরন্ত মূলোচ্ছেদী মুসলমান ধর্ম্মের কঠোর উৎপীড়ন সহ্য করিয়া এবং এইক্ষণে খৃষ্ট ধর্ম্মের চাতুর্য্যপূর্ণ হৃদয়াকর্ষিউপদেশ শ্রবণ করতঃও —নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করে নাই এবং কখনও যে করিবে এমনও বোধ হয় না।

আমাদের একথা শুনিয়া লোকে যেন এরূপ না মনে করেন যে, ভারতবাসিগণ বুঝি কখন আপনাদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। যদি কেহ এরূপ বুঝিয়া লন, তাহা হইলে লেখকের সম্পূর্ণ দুরদৃষ্টই বলিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, বৌদ্ধদেবের যুক্তি পূর্ণ উপদেশ শ্রবণে ভারতবাসী দলে দলে জাতিভেদ তুচ্ছ করিয়া, বেদে জলাঞ্জলি দিয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। রাজা, প্রজা, পিতা, পুত্র, স্ত্রী স্বামী, কেহ কাহারে শাসন করিবার নাই, কেহ কাহারে আট্‌কাইবার নাই, একেবারে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সহিত গ্রামকে গ্রাম রাজ্যকে রাজ্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; দুই একটি স্থান ভিন্ন, ভারতের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধবিহারের প্রাঙ্গণে বৌদ্ধ পতাকা, পত পত শব্দে উড়িয়াছিল। অথবা কেবল ভারতবর্ষ কেন? বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহার সীমা উত্তীর্ণ হইয়াও চীন তাতার প্রভৃতি দেশেও সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ সকল কথাই আমরা বিশ্বাস করি, তবে আমরা এই মাত্র বলি যে, সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় ও অসতের উন্নতিতে ভীত সাধুর ন্যায়, অথবা দস্যুভয়ে পলায়িত নিরীহ ভালমানুষ গৃহস্থের ন্যায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যেটুকু স্থান অধিকার করিয়া অজ্ঞাত বাসের মত গুপ্তভাবে বাস করিয়াছিল, সেখানে স্বাভাবিক পবিত্রভাবেই অবস্থান করিত বলিয়াই, আবার পূর্ব্বের মত আপনার সর্ব্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তাহার পর, ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম আসিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি আপনার অধিকার স্থাপন করিল। ইহার অনুচরেরা সুধু কথায় নয়, রাজ বলে, বাহু বলে, তরবারের তীক্ষ্ণধারে, স্বধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল। তাহারা এক দিকে যেমন রাজ্যের বিস্তৃতি, অতুল ধন লাভের ও ঐহিক সুখভোগের পন্থা-

কাষ্ঠালাভের নিমিত্ত সমুল্লাসিত, অন্যদিকে তেমনি বিধর্ম্মের উচ্ছেদ, বিধর্ম্মীর প্রাণনাশের দ্বারা অনন্ত স্বর্গভোগের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রলোভিত। এতাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন ইসলাম্ ধর্ম্মের অনুচরেরা যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে, অত্যন্ত শোচনীয়দুরবস্থা হইয়াছিল তাহা কে না স্বীকার করিবে? বর্ণাশ্রমিদিগের দেবালয় সকল ভূমিসাৎ হইয়াছিল, দেবপ্রতিমা গুলি চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। শাস্ত্রের অগণ্য পুস্তকরাশি ছিন্ন ভিন্ন ও অন্য প্রকারে সম্পূর্ণ অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিজাতির শিখার সহিত অগণিত উপবীত সূত্র প্রজ্বলিত অনল গর্ভে বলপূর্ব্বক দাহিত হইয়াছিল। আর যে কত কি হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? তাহার প্রত্যেক চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও অনেক চিহ্ন ভারতের অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান। এ হেন মুসলম্মান ধর্ম্মের প্রাবল্য সময়ে, প্রত্যহ চারিদিকে গ্রামকে গ্রাম, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়াও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যেটুকু স্থানে ছিল, সেখানে নির্ম্মল ভাবেই ছিল এবং সেই নির্ম্মলভাবে থাকাতেই ভারতে আবার ভগ্ন দেবালয় গুলি যেখানকার সেই স্থানে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। দেবপ্রতিমাগুলি পুনর্জ্জন্মের মত নূতন কলেবর ধারণ করিয়া পূর্ব্বের মত আপন স্থানে বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বের সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চার মূল ও ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানাবিধ শঙ্কর বর্ণ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদিতে প্রদর্শিত ধর্ম্ম পথের অনুসরণ করিতেছে। [যেরূপ কুজ্‌ঝটিকার সময় ঘট পটাদি পদার্থ সকল 'হিমানীতে আবৃত হইয়া চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে এবং যেমন কুজ্‌ঝটিকায় অপগম হইতে থাকে বস্তুগুলিও তেমনি একে একে পূর্ব্বাকারে প্রকাশ পাইতে থাকে, ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। ইহা সময়প্রভাবে অন্য ধর্ম্মের তমোময় ছায়ায় কিছু দিনের জন্য প্রচ্ছন্ন হয় মাত্র; সেই ছায়া অপসৃত হইলে, ইহা আপনার স্বরূপেই প্রকাশ হয়। মলরাশি দর্পণের স্বরূপ বাহিরে আচ্ছাদান করে মাত্র, কিন্তু সামান্য ফুৎকারে উহা অপসারিত করিলে পুনরায় সেই স্বচ্ছস্ফটিকসঙ্কাশস্বরূপ আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে; ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবস্থাও যে ঠিক সেইরূপ ইহা একটু স্থিরতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে ঠিক বুঝিতে পারা যায়।

খৃষ্টান পাদরীগণ যেখানে যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন সেইখানেই তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষেই তাঁহাদের মন্দাগতি। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এ পর্য্যন্ত যে সকল ভারতবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অতিঅল্পই কৃষ্ণবন্দ্যোর মত বংশ মর্য্যাদা সম্পন্ন; আবার সেই অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে অনেকেই জন্মান্তরের পাপ প্রভাবেই হউক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ প্রভাবেই হউক্ নানারূপে ক্লিষ্ট ও কুসঙ্গী ও পাপাচারীই অধিক। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অস্থিমজ্জায় ওত প্রোতভাবে জড়িত, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ তিষ্ঠিতে পারে কি না সন্দেহ এবং ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সত্তা অবশ্যম্ভাব্য। যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সহিত ভারতের এরূপ বাঁধা বাঁধি সম্বন্ধ তখন বুদ্ধিমান ভারতবাসীমাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে ইহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে পূজ্যপাদসুপ্রসিদ্ধ ভট্টপল্লী নিবাসী স্বর্গবাসী পণ্ডিতবর আনন্দচন্দ্র শিরোমণি পিতামহ ঠাকুর একখানি যুক্তি পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান। ঐ গ্রন্থ যথাযথ 'বিদ্যোদয়' নামক মাসিক সংস্কৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, আমরা এস্থলে তাহার, মর্ম্মানুবাদ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইব।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

হিন্দুমাত্রেই অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় অবগত আছেন। আমরা প্রথমে ঐ অষ্ট অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাক্রমে বিবৃত করিতেছি।

১ম। যম—গৃহস্থ সর্ব্বাগ্রে স্বীয় জাতিধর্ম্ম অনুসারে নিজ বর্ণাশ্রম-কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবেন। চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া তিনি সংসারপরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্দরে পর্ব্বতে তপোবনাদি নির্ম্মাণ করিবেন। পরে ঐ তপোবনে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। সংসার পরিত্যাগানন্তর নিভৃত তপোবনে ব্রহ্মচর্য্যা অবলম্বন করার নাম 'যম'। ইহা যোগের প্রথম অবস্থা বা অঙ্গ।

২য়। নিয়ম—পূর্ব্বোক্ত আশ্রমবাসী উদাসীন, পুণ্যতীর্থ প্রভৃতিতে স্নানাদি দ্বারা যোগের নিয়ম সমস্ত প্রতিপালন করিবেন। অর্থাৎ তিনি যথাকালে ও যথা নিয়মে আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক যোগাচার প্রতিপালন করিবেন। শাস্ত্রো বিধি অনুসারে নিজ জীবন নিয়ন্ত্রিত করার নাম 'নিয়ম'।

৩য়। আসন—পবিত্র স্থানে একাকী নিজ মানসিক অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আসন কল্পনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যোগ অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমে কুশ, পরে মৃগচর্ম্ম ও তদুপরি বস্ত্র রচনা করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথাবিধি সংস্থান করার নাম 'আসন'। আসন নানাবিধ। তন্মধ্যে কুমারসম্ভবে যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেবের যে বীরাসনের কথা বর্ণিত আছে, পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন।

৪র্থ। প্রাণায়াম—অ উ ম এই তিন অক্ষর দ্বারা গ্রথিত যে ওম্, যোগী অনবরত তাহারই আবৃত্তি করিবেন। যদি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া অবিচলিত ভাবে এই ওঙ্কারের বারংবার স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনকে নিজ আয়ত্ত করিতে পারা যায়। বারংবার ওঙ্কার উচ্চারণ করিলে মন তদ্গাত হইয়া অন্যান্য বিষয় হইতে আপনাকে বিচ্যুত করে এবং একাগ্র-ভাবে ব্রহ্মচিন্তনে সমর্থ হয়।

৫ম। প্রত্যাহার—মন, নিজ আয়ত্ত হইলে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ যাহার চিত্ত একাগ্র ভাবে ব্রহ্মপদার্থে আসক্ত হয়, তাহার ইন্দ্রিয় সকল আপনা হইতেই ভোগ্য বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয়। ইন্দ্রিয়জয় করিবার জন্য ইহাও সর্ব্বদা চিন্তা করা উচিত যে বিশ্ব সংসার অতি অপকৃষ্ট ও ব্রহ্মই একমাত্র উৎকৃষ্ট পদার্থ।

৬। ধারণা—পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ মন পুনঃ পুনঃ কর্ম্মে অথবা তৎ-চিন্তায় আসক্ত হয়; বারংবার মনকে ও ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিলেও সময়ে সময়ে তাহারা আমাদের অবাধ্য হইয়া নিজ নিজ অভীপ্সিত পথে গমন করে। তখন তাঁহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে পরাজিত করিবার জন্য ঈশ্বর চিন্তা করার প্রয়োজন হয়। ইহার অর্থ এই যে সংসার হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য ঈশ্বর চিন্তাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। গীতাতেও ইহা উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরদর্শন ব্যতিরেকে সংসার হইতে

মনকে পরাবৃত্ত করা যায় না। মনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট ও নিরবলম্বন করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না।

৭ম। ধ্যান :—ঈশ্বর চিন্তা দুই প্রকার। সমষ্টি ভাবে বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের আলোচনা করার নাম 'ধারণা'। (Synthetical conception of God)। কিন্তু ঈশ্বরের অঙ্গ বিশেষের প্রতি দৃঢ়রূপে মন সমাহিত করার নাম 'ধ্যান'। অর্থাৎ ব্যষ্টি ভাবে ঈশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃঢ় মনঃসংযোগ করার নাম 'ধ্যান'। (Analytical abstraction of Divine attributes)

৮। সমাধি :—যখন মন, ঈশ্বরপদ ভিন্ন তিলার্দ্ধও অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না, যখন ঈশ্বর চিন্তাই জীবের একমাত্র সুখের কারণ হয়, সেই অবস্থাকেই 'সমাধি' কহে।

পূর্ব্বে অষ্টাঙ্গ যোগের যে আভাস দেওয়া গেল, তাহা ভাগবত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা ভাগবতের শ্লোক কয়েকটীও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

১ম। যম :—"গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ"।

২য়। নিয়ম :—"পুণ্যতীর্থ জলাপ্লুতঃ"।

৩য়। আসন :—"শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে"।

৪র্থ। প্রাণায়াম্। অভ্যাসেম্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃৎ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্"। "মনো যচ্ছেৎ জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্"।

৫ম। প্রত্যাহার :—"নিয়চ্ছেৎ বিষয়েভ্যোঽক্ষান্মনসা বুদ্ধিসারথিঃ"।

৬ষ্ঠ। ধারণা :—"মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া"।

৭ম। ধ্যান :—"তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েৎ অব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা"।

৮ম। সমাধি :—"মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃকিঞ্চন নস্মরেৎ"।

যোগের এই অষ্টাঙ্গের ভাবার্থ এই যে যেমন সোপানে উঠিতে হইলে একটী পংক্তি হইতে অপর পংক্তিতে উত্থান করিতে হয়, সেইরূপ যোগী হইতে হইলে ক্রমান্বয়ে একটী কার্য্যের পর অন্য একটী কার্য্যে অধিরোহণ করিতে হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাদি, "যম" অবলম্বন না করিলে নিয়মী হওয়া যায় না। যম ও নিয়ম এ উভয়ে সমর্থ না হইলে যোগাসনে অধিকার জন্মায় না। যম নিয়ম ও আসন এই তিনে পরিপক্বতা লাভ না করিলে, প্রাণায়ামে ক্ষমতা জন্মায় না।

যিনি যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এই কয় কার্য্যে সাফল্য লাভ করিলে ধারণার শক্তি জন্মে। এইরূপে যম, নিয়ম, আসন 'প্রাণায়াম' প্রত্যাহার ও ধারণা এই কয়েকটির সাহায্যে ধ্যানে সক্ষম হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধকার্য্যে সক্ষম হইলে যোগের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ সমাধিতে সাফল্য লাভ করা যায়। এই কএকটি কথা মনে রাখিলে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ধ্যান ধারণা ও সমাধি, ক্রীড়ার বস্তু নয়। ধর্ম্মপ্রধানভারতবর্ষে, অতিপূর্ব্বকালেও সমাধিক্ষম কেবল দুই চারি জন মাত্র যোগী দেখা যাইত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এক্ষণে কর্ণেল আল্‌কটের প্রসাদে গৃহে গৃহে হাটে মাঠে সর্ব্বত্রই যোগিরাজ সমস্ত আমাদিগের চক্ষে পতিত হয়। এমন কি, কেরাণি বাবু পর্য্যন্ত লম্বা লম্বা দাড়ি চুল প্রভৃতি রাখিয়া আপনাকে যোগিরাজ বলিয়া পরিচয় দেন। যাহারা সংসারে থাকিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য প্রতিপালনেই অক্ষম, তাহারাও আপনাদিগকে যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন কল্পনাতেও অনু-মান করা যাইতে পারে না।

যোগ গৃহীর কর্ত্তব্য নহে, গৃহীর কর্ত্তব্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা। যোগ উদাসীনের ধর্ম্ম, কিন্তু আমাদের সমাজে এক্ষণে এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে গৃহী উদাসীনের ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন এবং উদাসীন গৃহীর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন। সুতরাং, কি গার্হস্থ্য কি সন্ন্যাস, উভয়ের কোন ধর্ম্মই আমাদের সমাজে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে না। যদি আমরা চক্ষু দ্বারা শ্রবণ, কর্ণ দ্বারা ভোজন ও নাসিকা দ্বারা দর্শন করি, অথবা করিবার প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আমাদের দেহ মধ্যে কি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা উপ-স্থিত হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সেইরূপে, সমাজ মধ্যে যখন সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য বিস্মৃত হইয়া অন্যের আচরণীয় ধর্ম্মপ্রতিপালনে যত্নবান্ হয়, তখনও সমাজ মধ্যে ঘোরতর অকুশল উপস্থিত হয়। "স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। ঐ দেখুন বালক নিজ ধর্ম্ম—বিদ্যাশিক্ষা—পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক পতাকা স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতেছে। আবার, অন্তঃপুরস্থা রমণীগণ সন্তান

প্রতিপালনে অমনোযোগী হইয়া বিদ্যা শিক্ষা ও কবিতারচনার জন্য লালায়িতা হইতেছেন। আর কেরাণিবাবু নিজ স্বাস্থ্য ও স্বকীয় পরিবারের স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ না করিয়া, আফিসে বসিয়াই, নাড়ী-চক্রভেদ করতঃ কুলকুণ্ডলিনীর সাক্ষাৎকার লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ সমস্তই অধঃপতন ও বিনাশের পূর্ব্বলক্ষণ। শাস্ত্রোক্ত ক্রম ও বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত পথে অগ্রসর হইলে এইরূপ অধঃপতন ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে ধারণা ও ধ্যান এতদুভয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে আরও কএকটি কথা বলিতেছি। ধারণার সময় সামান্যতঃ অর্থাৎ মোটামুটি রকমে ঈশ্বরের বিরাট মূর্ত্তির চিন্তা করিতে হয়। ভাগবতে লিখিত আছে " জিতাশনো জিতাশ্বাসো জিতাঙ্গো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। স্থূলে ভগবতোরূপে মনঃসন্ধারয়েৎ ধিয়া"। ... ... অণ্ডকোষ শরীরেঽস্মিন্ সপ্তারবণ সংযুতে। বৈরাজ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ। অর্থাৎ তিস্রোক্ত অদ্বিতীয় পুরুষ ভগবানের তিস্রোক্ত রূপে কল্পনা করিতে হয়। প্রথমতঃ কল্পনা করেন যে এই পৃথিবী একটি আবরণ স্বরূপ ইহার চতুর্দ্দিকে ইহাকে বেষ্টন করিয়া জলময় আর দ্বিতীয় আবরণ আছে; আবার ঐ জলরাশিকে বেষ্টন করিয়া তেজোময় আর একটি তৃতীয় আবরণ আছে ঐ তেজো-রাশির চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া বায়ুময় আর একটি চতুর্থ আবরণ আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে তেজোময় আর একটি পঞ্চম আবরণ আছে, ঐ ব্যোম রাশিকে বেষ্টন করিয়া অহংকারময় আর একটি আবরণ আছে, তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া মহত্তত্ত্বনামক সপ্তম আবরণ। এই সপ্ত-আবরণে আবৃত বিশ্বের পরিমাণ পঞ্চাশৎ কোটী যোজন; এবং এই সমস্ত আবরণ ব্যাপিয়া এক জন বিরাট পুরুষ আছেন, অন্তরীক্ষ তাঁহার চক্ষু-গোলক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়, যম তাঁহার দন্তপংক্তি, সমুদ্র সকল কুক্ষিদেশ, পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি, নদী সকল তাঁহার নাড়ী এবং বৃক্ষ সকল তাঁহার লোম। এই বিরাট পুরুষই ধারণার বিষয়। যে ব্যক্তির মন বিশেষরূপে উন্নত অথচ আয়ত্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই এই বিশাল অনন্ত জীবের ধারণা করিতে সমর্থ। কেরাণী বাবু হয়'ত ইহার অস্তিত্বের বিষয়ও অবগত নন্। ধারণা করা দূরে থাকুক, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে এই অসীম অনমুমেয় জীবের কল্পনা করাও

একপ্রকার অসম্ভব। ধারণার সময় মনের নিশ্চলতা থাকে না (অর্থাৎ এই বিরাট্ পুরুষের ধারণা কালে মন উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে)।

ধ্যান চিত্তের নিশ্চল অবস্থা। ধ্যানের বিষয় সম্বন্ধে ভাগবতে লিখিত আছে "একৈকশোঙ্গান ধিয়াচ ভাবয়েৎ" অর্থাৎ ধ্যান কালে বিরাট্ পুরুষের সমস্ত অঙ্গের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া তাঁহার এক একটি অঙ্গের ধ্যান করিতে হয়, অর্থাৎ যথাক্রমে এক এক অঙ্গ হইতে অপরাপর অঙ্গে উত্থিত হইতে হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ পাদ, পরে জঙ্ঘা, পরে জানু প্রভৃতির চিন্তা করিতে হয়। যে ব্যক্তির বিষয়ানুরাগ যত কম অর্থাৎ যাহার চিত্তশুদ্ধি যত প্রবল তাহার ধারণা ও ধ্যান সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন বহুকাল ধ্যানান্তর মনুষ্যের মন, ঈশ্বর হইতে ক্ষণার্দ্ধও বিচ্ছিন্ন না হয়, তখন সেই অবস্থাকে "সমাধি" বলে। *

---

* ধারণা অগ্রে, না ধ্যান অগ্রে, ইহা লইয়া ইংরাজী দর্শনে ঘোরতর মতভেদ আছে। ম্যানসেল প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেন, যে আমরা প্রথমে বস্তুকে সমষ্টিভাবে (synthetically) ধারণা করি, পরে আমরা, ঐ বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুভব করি। দূর হইতে যখন আমরা একটিবৃক্ষদর্শন করি, তখন আমাদের সর্ব্ব প্রথমে উহা "একটি বৃক্ষ মাত্র" এই বলিয়া অনুভব হয়। ইহার নাম সমষ্টিসূচক ধারণা। পরে আমরা যতই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হই, ততই আমাদের মনে ঐ বৃক্ষের রূপ গুণ প্রভৃতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, সংস্কৃত দর্শনের সহিত এই মতের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। বৃক্ষাদি সম্বন্ধে অনুভবের যে নিয়ম, ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। অর্থাৎ যখন মনুষ্যের মনে ঈশ্বর ভাব সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুরিত না হয়, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে মনন একটী মোটামুটী ধারণা হয়। পরে যতই আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই, ততই তাঁহার রূপ গুণ সুস্পষ্টরূপে আমাদের মনে প্রতিফলিত হয়। এবং এই অবস্থাকেই ধ্যান কহে। ভাগবতে ইহা উক্ত হইয়াছে, যে যাহারা ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিত, তাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ একটী পদার্থ (Substance) বলিয়া মনে করে। পরে যতই আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই, ততই ঈশ্বরকে আমরা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কিরীটকুণ্ডলবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ ইউরোপের Deism এবং আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অবস্থা। কৃষ্ণোপাসনা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত। কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর ধারণার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বিষয়। ধারণা অপেক্ষা ধ্যান অনেক উন্নত। পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় আমাদের একলক্ষেই সন্ধ্যাবন্দনাদির

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় সমস্ত পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সংসারে, অরণ্যে, গার্হস্থ্যে, সন্ন্যাসে সর্ব্বত্রই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শাস্ত্রের মূলমন্ত্র। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা আমাদের জীবনে এই চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিনা। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চরিত্রোৎকর্ষ ব্যতিরেকে মনুষ্যের কোন উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। আমরা সর্ব্ব বিষয়েই সমালোচন মধ্যে আন্দোলন দেখিতে পাই, আমরা রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সমাজ-নীতি সকল বিষয়েই আন্দোলন করি, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি অভাবে আমরা সকল বিষয়েই অকৃতকার্য্য হই। রাজনীতির ফলে আমা-দের পক্ষে গৃহবিবাদ, সমাজনীতিতে আমাদের আন্দোলনের ফল অবিবেকতা ও হট্‌কারিতা, ধর্ম্মনীতির ফল অশান্তি ও অসূয়া। এই সমস্ত অমঙ্গল পরিহার করিবার জন্য আমাদের সকলেরই সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি অর্জ্জন করিবার যত্ন করা উচিত।*

সময় যোগের মূলসূত্র অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু ইহা যোগ নহে। ভবিষ্যতে আমরা যোগী হইতে সমর্থ হইব এই আশয়ে আমরা আমাদিগকে গৃহস্থ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত করি; এইমাত্র। ফলতঃ প্রকৃত যোগী হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি অর্জ্জন না করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম ত্যাগ করা অবিধি। অতএব আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা। এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করার সময়েই আমরা ভবিষ্যতে যোগী বা সন্ন্যাসী হইবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে আমাদিগকে প্রস্তুত করিতে পারি। গীতার শিক্ষাও এইরূপ। "অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার। অচিরেতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥"

* এই প্রবন্ধে অষ্টাঙ্গ যোগের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে পাতঞ্জল ও বেদা-ন্তাদি ব্যাখ্যাত অষ্টাঙ্গযোগের সহিত আপাততঃ সম্পূর্ণ বিরোধ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে পরস্পরে বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। প্রবন্ধ লেখক মহা-শয়কে আমরা ইহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য দেখাইয়া একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি। তিনি সত্বরই আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

বে, সং

মুক্তিবাদ।

পূর্ব্ববন্ধ।

গৌতমঃ—দুগ্ধ পয়োধেরমৃত করংপিত্তরং তমানতোঽস্মি।
ঈশোনাস্তিযদন্যো যেন চ মননং সতোবাপি॥

এসংসারে সকলেই সুখের জন্য পাগল, সুখের জন্য কত অকার্য অবিচলিত ভাবে অনুষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু কিছু'ত হইতেছে না, কেহ'ত সুখলাভ করিতে পাইতেছে না। না হয় সুখলাভ নাই হউক, দুঃখের হস্ত হইতেওত কাহারও অব্যাহতি নাই। তরুতলশায়ী দরিদ্র হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত, বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খ হইতে ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধ পর্য্যন্ত, অধিক কি সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলকেই দুঃখভোগ করিতে হয়, প্রকৃত সুখভোগ প্রায়, কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এ পৃথিবীতে ধনার্জ্জনে, শাস্ত্রানুশীলনে, মৃদুমন্দমলয়মারুত সেবনে, বীণাবেণুনিনাদানুগত সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে বা অন্য কোন দৃষ্ট উপায়ে যে সুখ হয় তাহা ক্ষণিক। জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক, ভয় শঙ্কা, আশা এবং অভিমান্ প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিজনিত দুঃখরাশির সহিত তুলনা করিলে সে সুখ যে ক্ষণিক সুখ, সুখের মধ্যেই গণ্য হয় না। অধিকন্তু অনেক সময়ে ধনার্জ্জনাদি উপায়ে ক্ষণিক সুখও জন্মেনা। অধিক কি সুখের উচ্চকল্পনা স্থল, স্বর্গেও দুঃখ আছে। "প্রতিদণ্ডেই পুণ্য-ক্ষয় হইতেছে। আবার সুখ ছাড়িতে হইবে, আবার গর্ভ যন্ত্রণা, আবার পার্থিব ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইবে। তাইত, করি কি? এইরূপ বিবিধচিন্তা মধ্যে মধ্যে হৃদয়েজাগরূক হইয়া স্বর্গবাসীদিগের সুখ ভোগে বাধা দেয়। তাই বলিতেছি দুঃখবর্জ্জিত সুখলাভ নাহয় নাইহউক, শুদ্ধ দুঃখের হস্ত হইতেওত অব্যাহতি পাইবার যো নাই। ইহা গেল তত্ত্ব-কথা। সংসার নরকের মহাকীটরূপী সাধারণ মনুষ্যগণ দুঃখের অবস্থাতেও ভবিষৎ সুখের আশায় বুক বাঁধিয়া থাকে, সংসার প্রকৃতপক্ষে দুঃখময় হইলেও সুখময় বলিয়া মনে করে, জীবনে দুঃখভোগ অধিক হইলেও তাহা বুঝিয়াও বুঝেনা, সুখবিন্দুকে ত্রিভুবনপ্লাবী বিশাল সাগর ভাবিয়া নিজ নিজ ভ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, অতএব তত্ত্বদৃঃখ ভোগে যেরূপ কাতর হওয়া

উচিত সেরূপ কাতরতাপন্ন নহে; তথাপি হিতৈষী ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ, মহামায়ামুগ্ধ মনুষ্যগণকে, সেই মরীচিকাভ্রান্ত মৃগগণকে সেই অত্যুজ্জ্বল দীপশিখায় প্রবেশ করতে উদ্যত শলভ সমূহকে, সেই ব্যাধ গীতি প্রতারিত হরিণবৃন্দকে দেখিয়া কিরূপে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে থাকিতে পারেন? রোগী আপন রোগের বিষমতা না বুঝিয়া কুপথ্য সেবনে রত হইলে সুচিকিৎসক আর তাহাতে সম্মতি দেন না; অন্যে যে যাহা বলুক, যে যাহা বুঝুক, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলিয়াছেন "দুঃখের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পার্থিব স্বর্গীয় সুখে উপেক্ষা করিয়া মুক্তিলাভ করিতে জীবগণের যত্নকরা কর্ত্তব্য; সেইজন্য মুক্তিই পরম পুরুষার্থনামে অভিহিত হইয়াছে। এই মুক্তির স্বরূপকথন এবং উপায় নির্দ্ধারণ করাই, বেদবেদান্ত দর্শন পুরাণাদির প্রধান উদ্দেশ্য। মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য সেই মুক্তি সম্বন্ধে ঋষিগণোক্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া যে মুক্তিবাদ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, জিজ্ঞাসুর পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত ফলপ্রদ। কিন্তু ঐ গ্রন্থন্যায় শাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া অনেকেরি বোধগম্য নহে, এই জন্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্ব সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অপেক্ষিতাভাব।

ন্যায় শাস্ত্রের যে কোন বিষয় হউক না কেন, একটু বিশাল করিয়া বুঝাইতে হইলে অনুমানের আবশ্যক, সুতরাং এ গ্রন্থেও যে অনুমানের প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা বলা বাহুল্য। সেই অনুমান কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য ক্ষণকাল প্রস্তুত বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হইল।

জ্ঞেয় বস্তুর ব্যাপ্য অর্থাৎ সমস্থানবর্ত্তী বা অল্পস্থানবর্ত্তী (যে বস্তু যে স্থানে থাকে সেই সকল স্থানস্থিত অপর বস্তুকে "সমদেশবর্ত্তী" এবং তন্মধে কতিপয় স্থানস্থিত অথচ স্থানান্তরে অনবস্থিত বস্তুকে "অল্প দেশবর্ত্তী" বলা যায়) অন্য বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞান যে জ্ঞানের কারণ তাহার নাম অনুমান।

বস্তু সমূহের সম্বন্ধ ও নিঃসম্বন্ধ ভাব দেখিয়া কে কাহার ব্যাপ্য এবং কে কাহার অব্যাপ্য এ বিষয়ে একটা ধারণা হইয়া যায়। যে

পূর্ব্বে পাকশালা প্রভৃতি স্থলে বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ অবলোকন করিয়াছে, সেব্যক্তি বহ্নি আনয়ন করিতে গিয়া, যদি কোন্ স্থানে ধূম আছে বলিয়া বুঝিতে পারে'ত তাহার বহ্নিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঐ স্থানে বহ্নি আছে বলিয়া জানিতে পারে। তখন সে মনে করিলে সেইসেই কারণ দর্শাইয়া সেখানে যে বহ্নি আছে, ইহা অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারে। এই বহ্নিজ্ঞান বহ্নি প্রত্যক্ষ নহে, বহ্নির অনুমান; কেননা বহ্নির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ হয় নাই, উহা না থাকিলে প্রত্যক্ষ ও হইতে পারে না। এখন শেষ হয় উক্ত জ্ঞানে অনুমান লক্ষণ সঙ্গত হইল? বুঝিয়া লও এখানে জ্ঞেয় বস্তু বহ্নি, অন্য বস্তু ধূম তাহার ব্যাপ্য, কেননা বহ্নি যে সকল স্থানে থাকে, ধূম তন্মধ্যে কতিপয় স্থানে অবস্থিত, সকল স্থানে নহে। উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ডাদি স্থলে ধূম থাকে না অথচ স্থানান্তরে অর্থাৎ যেখানে বহ্নি নাই এমত স্থানেও থাকে না, ঐ ধূমের অস্তিত্ব জ্ঞান কোন্ জ্ঞানের কারণ হইল? না উক্ত বহ্নি জ্ঞানের।

এখন লক্ষণ ও উদাহরণের সামঞ্জস্য ও তাৎপর্য্য বুঝিলে'ত এই জাতীয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সকল জ্ঞানকেই অনুমান বলিয়া জানিবে।

প্রকৃত প্রস্তাব

মুল।

ওঁ নমঃ শিবায়। প্রয়োজনমুদ্দিশ্যৈব পুমাংসস্তদুপায়ে প্রবর্ত্তন্তে অতঃ শাস্ত্রস্য প্রয়োজনং প্রথমতো দর্শয়ন্তি শাস্ত্রকৃতঃ ১।

ব্যাখ্যা।

প্রয়োজন থাকিলেই লোক সেই প্রয়োজনীয় কার্য্য সিদ্ধির অভিলাষে তাহার উপর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, আর প্রয়োজন না থাকিলে নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" এইজন্য শাস্ত্রকর্ত্তাগণ প্রথমতঃই শাস্ত্রের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আয়ুর্ব্বেদীয় স্বভাবতঃ হিত দ্রব্যজাতের মধ্যে পঁুইশাক হিত হইলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ। শূদ্রের পক্ষে উহা দ্বাদশীতে অধিক নিষিদ্ধ।

"কুসুম্ভংনালিকাশাকং বৃন্তাকং পৌতিকন্তথা।
ভক্ষয়ন্ পতিতস্তস্যাদপি বেদান্তগোদ্বিজঃ॥"

উশনাঃ।

কুসুম্ভ (কুসুমফুল), শ্বেতকলম্বী, বর্ত্তুলাকার বেগুন, পঁুইশাক ভক্ষণ করিলে বেদান্তগ দ্বিজও পতিত হন।

"লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানিচ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাং অমেধ্যপ্রভবাণিচ"॥ মনুঃ।

লশুন, গাঁজর, পলাণ্ডু, ছত্রাক, ও অমেধ্যপ্রভব পদার্থ দ্বিজাতি প্রভৃতি সকলের অভক্ষ্য। বিষ্ঠাদিজাতকে অমেধ্যপ্রভব বলে।

"পলাণ্ডুং বিট্‌বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রাম্যকুক্কুটং।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পলাণ্ডু, বিট্‌বরাহ (গ্রাম্যশূকর) ছত্রাক, গ্রাম্যকুক্কুট, লশুন ও গৃঞ্জন ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ বিধানে যাহা অহিত বলিয়াছে তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হইলে অভক্ষ্য হয়। ভোজন করিলে অদৃষ্ট দ্বার দোষের কে বারণ করিবে? "অদৃষ্টদ্বারদোষাস্তু জায়ন্তে পাপিনামিহ"। আয়ুর্ব্বেদীগণ নিরাময় জন্য ঔষধও পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকেও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু পাপ হইবে কিনা, সত্বশুদ্ধি হইবে কিনা, ইহা তাঁহারা তত দেখিতে অবকাশ পান না। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসন সর্ব্বোপরি বিদ্যমান। আবার দেখা যাইতেছে ব্যাধিও ত্রিবিধ, কর্ম্মজ, দোষজ, কর্ম্মদোষজ,।

"কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তিচাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

ভাব প্রকাশ ঃ।

কর্ম্মজব্যাধি যথা—

"যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতা যথাব্যাধি চিকিৎসিতাঃ।
ন শমং যান্তি যে রোগাস্তে জ্ঞেয়া কর্ম্মজাবুধৈঃ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

ব্যাধি যথাশাস্ত্র নির্ণীত হইয়া যথাবিধি চিকিৎসিত হইয়াও শম প্রাপ্তি না হইলে উহা কর্ম্মজব্যাধি। প্রাক্তন-দুষ্কর্ম্ম প্রাবল্যে উহার উৎপত্তি। কোন স্থলে ভোগে স্বয়ংই নাশ পায় কোন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুরূপ প্রায়শ্চিত্তে নাশ পায়।

দোষজ — "দোষজাঃ মিথ্যাহারবিহারপ্রকুপিতবাতপিত্তকফজাঃ"। মিথ্যাহার ও বিহারে বাতপিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া ব্যাধি হইলে দোষজ ব্যাধি হয়। এই স্থলেই চিকিৎসকের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। প্রাক্তন-সুকৃতিশালি-লোক মিথ্যাহার বিহার করিয়াও রোগের অধীন হয় না। "ননু মিথ্যাহারবিহারিনাং অপি প্রাক্তনসুকৃতেন নৈরুজ্যং দৃশ্যত এব" ভাবমিশ্রঃ। এখন কর্ম্মদোষজ ব্যাধির কথা বলা যাইতেছে।

যেমন মিথ্যাহার-বিহারীর প্রাক্তন-সুকৃতি বলে নীরোগতা দৃষ্ট হয়, তেমন দোষজ ব্যাধির ও প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মই কারণ। ঐ দুষ্কর্ম্ম মিথ্যাহার-বিহাররূপ, তাহাতে বাতপিত্ত কফ দুষ্ট হইয়া পীড়া জন্মায়, এইজন্য ঐ সমস্ত ব্যাধিকে দোষজ ব্যাধি বলে।

কর্ম্ম দোষোদ্ভব ব্যাধি।

"স্বল্পদোষা গরীয়াংসস্তে জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মদোষজাঃ।"

ভাব প্রকাশঃ।

অতি অল্প দোষে গুরুতর ব্যাধি হইলে তাহা কর্ম্মদোষজ ব্যাধি। প্রবল দুষ্কর্ম্মই উহার কারণ।

ইহা অহরহ প্রত্যক্ষ হয় যে, অল্প অহিতাচারে প্রবল ব্যাধি হইতেছে, আবার পীড়া নির্ব্বাচিত হইয়া যথোচিত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াও নিরাময়তা লাভ হইতেছে। অনেকে সাবধানে চিকিৎসিত হইয়াও যমসদনে গমন করিতেছেন। এইরূপ বহুবিধ শারীর-ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ জ্ঞান-বলে জানিয়াছেন, এবং শিষ্য সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, ধর্ম্ম-সাধন-শরীর নিরাময় রাখিতে হইলে, ভক্তি-প্রবণ অন্তরে অন্তরীশ্বরের চির-ব্যাপি-ভজন করিতে হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান প্রতিপালনীয়। নচেৎ, পাপ, তাপ প্রবল হইয়া অশেষ অকল্যাণ ঘটাইবে। দৈবোপায় ভিন্ন, কেবল দৃষ্টোপায়ে কায়িক স্থায়ি-হিত, সুতরাং মানসিক হিত সাধিত হইবে না; সেইজন্য আর একটী কথা আবার বলা যাইতেছে।

"কর্ম্মক্ষয়াৎ কর্ম্মকৃতা দোষজা স্বস্বভেষজৈঃ।
কর্ম্মদোষোদ্ভবা যান্তি কর্ম্মদোষক্ষয়াৎ ক্ষয়ম্"॥

ভাব প্রকাশঃ।

আমরা সঞ্জাত রোগের নিদান, দোষ, কর্ম্ম কি কর্ম্মদোষ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হই না, সেই জন্য রোগোৎপত্তিমাত্র ভিষকের শরণ গ্রহণ করি। স্থূলদর্শী ভিষগ্ বহুবিধ উপায়ে প্রকোপিত রোগের প্রবৃত্তি অবগত হইয়া তদনুরূপ ভৈষজ্যের যথা শক্তি বিধান করেন। কেবল দোষজ-ব্যাধি তদীয় ভৈষজ্য সেবনে নিরাকৃত হয়, কিন্তু অন্য দ্বিবিধ ব্যাধি ভোগ ও প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা নির্ধূত হইয়া যায়। এই জন্য ব্যাধি ও ত্রিবিধ হইয়া থাকে।

"সাধ্যা যাপ্যা অসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
সুখ-সাধ্যঃ কষ্ট-সাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে॥"

ভাব প্রকাশঃ।

সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্যভেদে ত্রিবিধ ব্যাধি হইয়া থাকে সাধ্য রোগ আবার সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য ভেদে দ্বিবিধ। এবম্বিধ বহুবিধ বৃত্তান্ত বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে।

অত্যাচারে অশেষবিধ রোগ জন্মে, এবং পাপ পুঞ্জীকৃত হইয়া জীবকে কলুষিত করে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যদি আচরণদো

স্বাস্থ্যনাশ ও পাপোৎপত্তি হয়, তবে আহারদোষেও অবশ্যই উহা হইতে পারে। কোন্ আহার পাপ, কোন্ আহার অহিত, ইহা কেবল তর্কজালে সংবদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

আর্য্য শাস্ত্র ভিন্ন কোন শাস্ত্রে সম্পূর্ণ রূপে পাপ পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে নাই ও পারিবে না। দুই একটী সৎকথা থাকিতে পারে। ঐ আর্য্যেতর শাস্ত্রে দুই একটী সৎকথা থাকিলেও তাহা তত্তৎ-প্রকৃতি-সম্পন্ন লোকগণের জন্য। ঐ সমস্ত শাস্ত্র প্রকৃতার্থে শাস্ত্র নহে, শাস্ত্রাভাস, বিশেষতঃ লৌকিক। যাহা লৌকিক তাহা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ। যাহা অলৌকিক তাহা অভ্রান্ত, অভ্রান্ত বাক্যের অভয় প্রদান ভিন্ন কখনও হৃদয়ে ও দেহে স্বস্তি জন্মে না। আর ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপিত হইতে পারে না, এই জন্য বেদ বিহিত ধর্ম্মই ধর্ম্ম তদ্বিপরীত অধর্ম্ম। "বেদপ্রণিহিতোধর্ম্মস্তদ্বিপরীতোহধর্ম্মঃ" অজ্ঞাত বিষয়ই শাস্ত্রে জ্ঞাপন করিয়া দেয়। এখন হয়ত বাবুগণ আপত্তি করিতে পারেন, বেদ যে অলৌকিক, তাহার প্রমাণ কি? আমরা এস্থলে তদুত্তর দিতে বসি নাই, অবসর হইলে সময়ান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অন্নানুরূপ মন গঠিত হয়। এখন প্রতিপাদিত হইল, শারীরতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসকগণের নির্ব্বাচিত খাদ্যজাত ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইলে অগ্রাহ্য। চিকিৎসকগণ যে সকল পদার্থ হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা ধর্ম্মানুমোদিত হইলেই প্রকৃত হিত হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত খাদ্য জাত ও যুক্তরূপে ব্যবহৃত না হইলে দোষের প্রকোপ জন্মায়, সুতরাং পীড়া ঘটে। আর তাহা দুষ্কর্ম্ম হইলেও সাক্ষাৎরূপে পাপাচারই, প্রকৃত দুষ্কর্ম্ম; সেই পাপাচারে দোষের প্রকোপ হইয়া যে সকল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি জন্মে তাহা চিকিৎসক দূর করিতে সমর্থ হয় না। এই সমস্ত কারণে সনির্ব্বন্ধ বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। এবং খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। এখন সঙ্ক্ষেপতঃ খাদ্য গ্রহণের সময় প্রভৃতির কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। সেই সমস্ত নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে ও বাত পিত্ত কফের বৈষম্য হইয়া অচিরে স্বাস্থ্যনাশ হইয়া থাকে। আর্য্যের আর্য্যত্বের ইহাও একতর কারণ যে, আর্য্যজাতির প্রতিকর্ম্ম ধর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিমুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য অবধারণ

করিয়াছেন। দিবামানকে পঞ্চদশ ভাগে বিভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে এক মুহূর্ত্ত বলে। শাস্ত্রে প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্যাবধারণ রহিয়াছে। ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারীতি প্রতিপালিত হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, সুতরাং নিবৃত্তি ও ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া পরকাল পর্য্যন্ত নির্বিঘ্ন করিয়া দেয়। অধুনা অজ্ঞতায়, স্বেচ্ছায় ও বিজাতীয় আচারে অশেষ অকল্যাণ ঘটিতেছে। সেইজন্য দেশ, রুগ্ন, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু। যাহারা ভ্রমান্ধকূপে নিপতিত তাহারা উহা বুঝাইলেও বুঝেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। উপদেশ ভিন্ন কোন কাজ হয় না।

আপ্তোপদেশ সাপেক্ষ সর্ব্বকর্ম্ম, সুতরাং আহার সম্বন্ধেও আপ্তবাক্যার্থ গ্রাহ্য। নচেৎ স্বেচ্ছাচারে পাপ তাপ উৎপন্ন হইয়া অচিরে আত্মার কালিমা জন্মাইবে। কেহ কেহ বলেন আহারের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। আহারের সহিত জীবনের সম্বন্ধ আছে, ইহা সকলেরই যদি অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তবে ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ নাই কেন? চিত্ত সংযত না হইলে অন্তরে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকিতে পারে না। আহার বিহার বিষয়ে সংযত না থাকিলে কখনও চিত্তের সংযম হইতে পারে না, সেই জন্য ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে আহার বিষয়েরও অনল্প উপদেশ আছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে আহার গ্রহণের সময় সম্বন্ধেও উপদেশ আছে, আমরা তাহারও কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করিতেছি।

"সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতীনামশনং দেব নির্ম্মিতম্।
নান্তরা ভোজনং কার্য্যমগ্নিহোত্রসমোবিধিঃ। মনু।

এই মনুবচনানুসারে সায়ং ও প্রাতঃকালে দুইবার মাত্র মানবের ভোজনের কথা আছে কিন্তু ইহাতে স্পষ্টরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। এই বারদ্বয় ভিন্ন আর ভোজন করিতে হইবে না ইহা বুঝাইতেছে। মহামুনিকাত্যায়ন ছন্দোগপরিশিষ্টে উহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

'মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং নিত্যম্।
অহনিচ তথা তমস্বিন্যাংসার্দ্ধপ্রহরযামান্তঃ।

দিবা ও রাত্রিতে আড়াই প্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে, প্রথমোক্ত মনুবচনই কাত্যায়ন স্পষ্ট করিয়াছেন। কোন বিরোধ নাই। মনু-

বচনে যে প্রাতঃ ও সায়ং শব্দ আছে তাহা বাস্তবিক কাত্যায়নোক্ত কাল। মনুবচনের ঐ প্রাতঃশব্দের অর্থ টীকাকারগণ বিশেষতঃ শরীর-তত্ত্ববিদ্‌গণে স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

"প্রাতঃ প্রথমযামাদুপরি"।

অধস্তন স্মৃতিসঙ্কালকও ঐ সমস্ত বচনানুসারে পঞ্চম যামার্দ্ধে ভোজনের মুখ্য কাল বলিয়াছেন।
"পঞ্চমযামার্দ্ধে মুখ্যকালঃ।" রঘুনন্দনঃ।

এই নির্দ্ধারিত কালের সহিত বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত বিধির যদি ঐক্য থাকে তবে অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী বিধি, এতদূর জ্ঞানে পরিচালিত যে, কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা অসঙ্গতি নাই। ঋষিদের জ্ঞান অপ্রতিহত ছিল সেই জন্যই কার্য্যকলাপ ধর্ম্মানুমোদিত করিয়া সুশৃঙ্খলা করিয়াছেন, পরং ধর্ম্মসাধন-শরীর ও সুস্থ থাকিবে। এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৈদ্যক শাস্ত্রে বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রাখিয়া সুব্যবস্থা প্রণালী অন্ত কোন জাতির নাই। এস্থলে আর একটী কথাও এখনই বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আড়াইপ্রহরের মধ্যে ভোজনের মুখ্যকাল। তা বলিয়া এক প্রহরের মধ্যে আহার করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব "যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং ইতি দক্ষঃ।"

এখন আয়ুর্ব্বেদে কিরূপ সময় আছে তাহা লেখা যাইতেছে।

"যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
যাম মধ্যে রসস্তিষ্ঠেৎ ত্রিযামেতু রসক্ষয়ঃ।"

যাম মধ্যে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু ত্রিযাম কোনমতেই লঙ্ঘন করিবে না। কারণ যাম মধ্যে রসের পরিপাক হয় না। আবার ত্রিযামে রসের ক্ষয় হয়। এই সব ভাবিয়া রঘুনন্দন পঞ্চম যামার্দ্ধকে মুখ্য-কাল নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

ভুক্তান্ন পরিপক্ক হইলে উহা হইতে যে সারভাগ শারীরকার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহাকে রস বলা যায়। রসন শব্দের অর্থ গতি, সর্ব্বদেহে গমন করে বলিয়া ঐ সারভাগকে রস বলে।

"গত্যর্থোরসধাতুর্যস্ততোঽভবদয়ং রসঃ।
সদৈব সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্মৃতঃ॥
সম্যক্‌পক্বস্য ভুক্তস্য সারোনিপদিতোরসঃ।
সতু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলোভবেৎ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

গত্যর্থক রস্‌ধাতু হইতে রস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সতত সর্ব্ব-দেহে রসন করে বলিয়া উহার নাম রস। ভুক্তদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পরি-পাক পাইলে তাহাতে যে সারাংশ শারীর-কার্য্যে প্রয়োজিত হয়, তাহাকে রস বলে। উহা দ্রব, সিত, (সাদা) শীত, স্নিগ্ধ, স্বাদু ও চল। ভুক্ত দ্রব্যের অসার ভাগ মলাদিরূপে বহির্গত হইয়া যায়। সার ভাগ প্রথমতঃ রসে পরিণত হয়, পরে ক্রমে শোণিত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্ররূপে পরিণত হইয়া দেহাবয়ব রক্ষা করে। এই সাতটী দেহ ধারণ করে বলিয়া ঐ সাতটীকে ধাতু বলে।

"এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যন্নৃণাম্।
রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ॥

ভাব প্রকাশঃ।

ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। সেই পরিণমন কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ না হইলে, পুনর্ব্বার আহার গ্রহণ করিলে পাকস্থলীর কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ও ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। হাঁড়ীতে তণ্ডুল ও জল দিয়া উত্তাপ দিলে ভাত হয় ইহা অনেকেই জানেন। ভাত প্রায় হই-য়াছে এমন সময়ে তাহার মধ্যে তণ্ডুল প্রদান করিলে কতক গলিত, কতক অর্দ্ধ গলিত ও কতক তণ্ডুল থাকে। অধিক হইলে পড়িয়া যায়। অধ্যশন করিলে তদ্রূপ ঘটে। পাকস্থলীর পচ্যমান দ্রব্য নিঃশেষ হইতে আরম্ভ হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হইতে থাকে। ক্রমশঃ প্রাবল্য ধারণ করিয়া দ্রব্যভাবে জঠরাগ্নি মন্দীভূত হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব এমন এক সময়ে আহার গ্রহণ করিতে হইবে, যে, তখন ভোজ্যদ্রব্য জীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোৎপন্ন রসের কোনরূপ উপদ্রব না ঘটে এবং নব্যভুক্তদ্রব্যেরও পরিপাক কার্য্যে

প্রতিবন্ধক না হয়। দিবাভাগ কার্য্যকাল, রাত্রিভাগে বিরাম সময়। শরীরকার্য্যদ্বারা শীঘ্র বুভুক্ষা হয়। রাত্রিতে আহারান্তে বিশ্রামানন্তর সুষুপ্ত হইতে হয়। তখন পাক কার্য্যের কোন বাধা না থাকিলেও কেবল স্বাভাবিক বলে প্রায় জীর্ণ হয়। কিন্তু জীর্ণ প্রায় হইলেও রসের পরিপাক হয় না। দিবাভাগে বর্ত্তমান কালানুসারে আহার গ্রহণ করিয়া অপরাহ্নে বুভুক্ষার উদ্রেক হইতে থাকে, তাহার কারণ পরিশ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু দশটার সময় যাহারা আহার গ্রহণ করেন তখন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অতি অল্পমাত্র ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সুতরাং বিষমাশন হইতেছে। আর্য্যঋষিগণ উহা বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিলেন, সেই জন্য পঞ্চম যামার্দ্ধ মুখ্যকাল স্থির করিয়াছেন। তদ্রূপ ব্যবহারে তাঁহারা দীর্ঘায়ু ও সুস্থ থাকিতেন। এখন বিষমাশন ও অধ্যশন প্রভৃতি দ্বারা অজীর্ণ, দেশব্যাপক জ্বর, বিসূচিকা, মূত্রাতিসার, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অশেষ দুর্গতি ঘটিতেছে।

ক্রমশঃ

প্রকৃতি মাহাত্ম্য।

যাহার, যে স্বভাবাপ্রকৃতি অভ্যাস, চেষ্টা, সংসর্গ এবং উপদেশাদির সাহায্য ব্যতীত আপনা হইতেই বর্ত্তমান থাকে তাহাকে তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি বলা যায়। এই জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই কোন না কোনরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি আছে। জীবগণ সেই সকল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে। যেমন ব্যাঘ্রের স্বভাব হিংসা, পক্ষীর স্বভাব উড্ডয়ন ও মৎস্যের স্বভাব সন্তরণ। উহাদের এই সকল ক্রিয়াকে উহাদের স্বভাব জাত ক্রিয়া বলা যায়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্ট পদার্থ সকলের এই যে স্বভাবজাত ক্রিয়া কোথা হইতে আসিল! শাস্ত্র বলেন যৎকালে সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছিল, তখনই ঐ ত্রিগুণের বিদ্যমাণতার তারতম্যানুসারে এই স্থাবর জঙ্গমাদি প্রত্যেক পদার্থের স্বভাব সৃষ্ট হইয়াছিল এবং তদবধিই ঐ প্রকৃতির গতি-অনুসারে প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থে ক্রিয়া করিতেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে এই কথাই বলিয়াছেন।

'ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগুর্ণৈঃ।"

অর্থাৎ এই পৃথিবী, স্বর্গ বা দেবলোকে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা উক্ত প্রকৃতিজ গুণ ক্রিয়া হইতে বিমুক্ত ভাবে আছে। উদ্ভিজ্জ, কীট, পতঙ্গ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। এইরূপ সত্বগুণের দ্বারা ব্রাহ্মণের স্বভাব, রজোগুণের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের স্বভাব, এবং তমোগুণের দ্বারা শূদ্রের স্বভাব গঠিত হইয়াছে। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁহার স্বভাব সম্পূর্ণ সাত্বিক। সম্পূর্ণ সাত্বিক স্বভাবের ক্রিয়া সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছেন।

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

অর্থাৎ—শম (মন সংযমন করার ক্ষমতা) দম (দশবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করার ক্ষমতা) তপঃ (বেদব্রাহ্মণাদির পূজা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্য প্রয়োগ, বেদ এবং প্রণবাদির অভ্যাস করা, মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌন, আত্মবিনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি ইত্যাদি) শারীরিক এবং মানসিক শৌচ, ক্ষমাশীলতা, জ্ঞান (বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা) বিজ্ঞান, (অন্তর্জগতের অনুভূতি) এবং আস্তিক্য (সাত্বিকী শ্রদ্ধা) এই সকল ব্রাহ্মণ জাতির স্বভাবজ ক্রিয়া।

"শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"

অর্থাৎ—শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, যুদ্ধাদি কার্য্য, দক্ষতা, মৃত্যু বা পরাভব নিশ্চয় হইলেও যুদ্ধে পলায়ন না করা, দানশীলতা, এবং ঐশ্বর্য্য এই সকল ক্রিয়াগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত।

"কৃষি গোরক্ষং বাণিজ্যং বৈশ্যধর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"

অর্থাৎ—কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্ম বৈশ্যাদির এবং পরিচর্য্যা কর্ম্মই শূদ্রের স্বভাব জনিত ক্রিয়া।

এক্ষণে যে সকল ক্রিয়াগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত বলা হইল, ঐ সকল

ক্রিয়ার কোন কোনটী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যেও দেখাযায় এবং এখনকার ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐ সকল ক্রিয়ার কোন কোনটীর সম্পূর্ণ অভাবও দৃষ্ট হয়। এই সদ্ভাব ও অভাব নৈমিত্তিক ক্রিয়াজনিত, স্বভাবজাত নহে। যেমন সন্তরণ মনুষ্যের স্বভাবজাত ক্রিয়া নহে কিন্তু শিক্ষার সাহায্যে সন্তরণ করিতে পারা যায়। আধুনিক বিদেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র সমভাবে জ্ঞানলাভ করিয়া সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন—তবে জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব কৈ? ইহার উত্তরে এই বলাযাইতে পারে যে, ম্লেচ্ছ শাস্ত্রের অন্তর্গত বিদ্যাসকল বৈষয়িক বিদ্যা, উহা সকলজাতির পক্ষেই সমান। ম্লেচ্ছ সংসর্গবাসী, ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজীগণের উক্ত বিদ্যাতে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিবার অধিক সম্ভাবনা; কারণ ঐ সকল বিদ্যা অধিকাংশ সময় আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ পরমজ্ঞানের বিরোধী। এজন্য হক্সলী, টিণ্ডেল, স্পেন্সার, প্রভৃতি ইউরোপীয় আধ্যাপক গণের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিলে রাসায়নিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যার সম্যক্ অধিকার হইতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপ পরমজ্ঞান লাভের ক্ষমতা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অর্থে কেহ যেন ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞান না মনে করেন। ব্রহ্মনিরূপণকারিণী, অথবা আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান প্রদায়িণী বিদ্যার নামই আধ্যাত্মিক বিদ্যা। ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞান, স্থূল তত্ত্বপ্রকাশক এবং ব্যক্তিবিশেষের নিজনিজ যুক্তি অনুসারক। ইউরোপ, পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এখন অনেক পশ্চাৎবর্ত্তী। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ত দূরের কথা। আমরা মনের যে সংস্কাররাশি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও জন্মাবধি পার্থিব সংশ্রবে থাকিয়া যে সংস্কাররাশি অর্জ্জন করিতেছি, এই সকল সংস্কারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারাই আমাদের মন গঠিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের মন অবিচ্ছিন্ন সংস্কারের দাস। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, উহা ঐ অবিচ্ছিন্ন-সংস্কার সমষ্টির অবস্থান্তর মাত্র। এরূপ সংস্কারাচ্ছন্ন মন লইয়া ইউরোপীয়গণ মনেরস্বরূপ নিরাকরণ করিতে যান; এইজন্য উঁহারা কখনই প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হন নাই। পাগল কেমন? এইকথা পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনই ঠিক উত্তর দিতে পারে না, কিন্তু কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাগল কেমন বুঝাইয়া দিতে পারেন। তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে সংস্কার

বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইলেই নির্ম্মল আকাশে চন্দ্রকিরণের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব বিকাশিত হইবে।

মন ব্যতীত, আত্মা বলিয়া আর একটী স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা আজ্ও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনকেই আত্মা বলিয়া থাকেন, এবং আত্মার দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা তাঁহারা মনেতেই আরোপ করিয়া থাকেন। মন যে জীবাত্মার একটী অঙ্গ বিশেষমাত্র তাহা ইহাঁরা জানেন না।

শিক্ষা অভ্যাস প্রভৃতি নৈমিত্তিক কারণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির স্বভাব পরিবর্ত্তনের আর একটী মুখ্য কারণ আছে তাহার নাম "সংস্কার" সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি গুণবশে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত ভালমন্দ সংস্কার রাশি হইতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সকল ক্রিয়া গুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ বলিয়া লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে,—আমাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নয়। জন্ম জন্মান্তরের সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত সংস্কার রাশি দ্বারা গঠিত, প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বভাব হইতে আমাদের স্বভাব অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আবার ইহ জন্মে ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিক্ষা, ম্লেচ্ছ সংসর্গ এবং অন্যান্য নানাবিধ কুসংসর্গ এবং কদ-নুষ্ঠান জনিত নূতন সংস্কাররাশির অর্জ্জন হইতে চলিল। এইরূপে আমরা যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে পশু, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, নিষাদ প্রভৃতি শাস্ত্রে যে-দশবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, সেই সকল অব্রাহ্মণত্বে পরিণত হইয়াছি, এবং ইহ জন্মে সদাচার এবং সদনুষ্ঠান হইতে বিরত হইলে পরজন্মে আরও নীচত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে। এখন কার সকলে কেহ বা পশু ব্রাহ্মণ, কেহ বা ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইলেও ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ক্রিয়া গুলির অঙ্কুর সকল সুপ্ত প্রায় ভাবে বর্ত্তমান আছে, অথচ হয়ত বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতির স্বভাবোচিত কোন কোন ক্রিয়াগুলি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষাও উপদেশাদি রূপ জল শেচন হইলেই এই সকল শুষ্কপ্রায় অঙ্কুর ত্বরায় বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ক্রিয়া দোষে এতদূর অবনতি হয় যে, তাঁহাদের জাতীয় স্বভাবজাত ধর্ম্ম একবারে লোপ পাইয়া যায়, তাহা হইলে পর জন্মে তিনি ব্রাহ্মণ গৃহে না জন্মিয়া নিজ ক্রিয়ানুসারে ক্ষত্রিয়

বৈশ্যাদির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বভাবজ ধর্ম্ম সকল প্রাপ্ত হইবেন। দর্শনাদি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ"

যিনি ব্রাহ্মণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি অতি কদাচারী এবং কুচরিত্র হইলেও বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাতে ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম্ম সকল, অননুষ্ঠিত এবং শুষ্ক মৃত্তিকায় রোপিত বীজের ন্যায় নিহিত আছে—নিয়মিত রূপে জল শেচনাদি করিলে এবং উৎকৃষ্ট সার প্রদান করিলে অবশ্যই ঐ বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইবে। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা আপনাকে শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া জানিবেন। কারণ যদি তিনি ব্রাহ্মণত্ব হইতে একেবারে পতিত হইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেন না। এইরূপ শূদ্র শিক্ষা, সদাচার ও সদনুষ্ঠান দ্বারা উন্নত হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিকে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। অবশ্য তাঁহার সৎকার্য্য সকলের নিমিত্ত তিনি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের নিকট সম্মানার্হ হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক যখন তিনি নিজ ক্রিয়া গুণে তাঁহাদের সমান হইবেন তখন (অবশ্য জন্মান্তরে) তিনি আর শূদ্রের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ না করিয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহ জন্মে তিনি কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণ হইতে সক্ষম হইবেন না। কারণ বীজ গত দোষ বিনষ্ট হওয়া এক জীবনে একরূপ অসম্ভব। শূদ্র বীজে যদি যাঁহার জন্ম হয়, তিনি এক জীবনে কায়ার বিনা পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণ বীজ লাভ করিবেন কি উপায়ে? এই নিমিত্ত ম্লেচ্ছগণ বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা যতই উন্নত হউন না কেন, তাঁহারা কখন আর্য্য হইতে পারিবেন না, এবং আর্য্য ক্রিয়া দোষে পতিত হইলেও তিনি আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া ম্লেচ্ছ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা, প্রভৃতি জাতি বিভাগ নৈসর্গিক, একারণ মনুষ্য কর্ত্তৃক উহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যদি উহার কখন পরিবর্ত্তন হয়, নৈসর্গিক নিয়মেই উহার পরিবর্ত্তন হইবে। আমারা নিজ বুদ্ধি বা ক্ষমতা বলে অথবা জোর জবর্দস্তীতে কোন ব্রাহ্মণকে শূদ্র বা কোন শূদ্রকে ব্রাহ্মণ, কোন ম্লেচ্ছকে আর্য্য বা কোন আর্য্যকে ম্লেচ্ছ করিতে পারিব না।
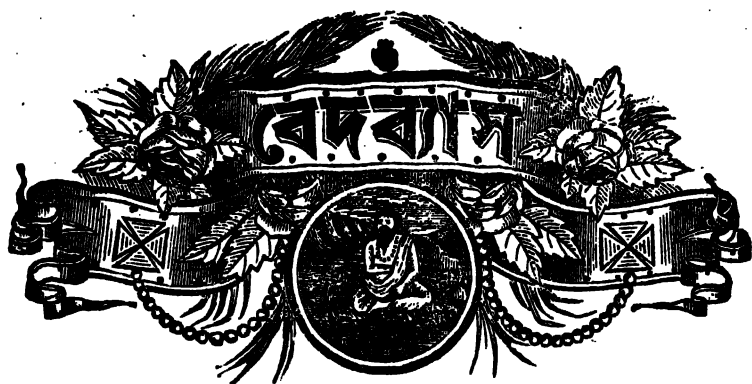
৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ২য় খণ্ড।

খাদ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পক্ষান্তরে সময়াতিপাত করিয়া আহার করিলেও বিষমাশন হইয়া থাকে। আবার সকল সময়েই কেবল সময়ের উপর আহার নির্দ্দেশ হইতে পারে না, অবস্থাভেদে ইতর বিশেষও হইতে পারে। কিন্তু তাহা সাধারণ বিধি নহে। রসাদির পরিপাক হইলেই সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহাই অন্নগ্রহণের কাল।

"ক্ষুৎসম্ভবতি পক্কেষু রসদোষমলেষুচ।
কালে বা যদি বাকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

এখন জল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। জলের এক নাম জীবন। জলপান করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন বুভুক্ষা ভোজন করিতে প্রণোদিত করে, তেমন পিপাসা ও জল পানার্থ প্রবর্ত্তিত করে। নির্ম্মল ও শুদ্ধ জল পান করাই উচিত। জলাদিতে পাপসংস্পর্শ

পরিত্যজ্য, নচেৎ সহজে পাপ সংক্রামিত হইয়া পড়ে। সেই জল ভোজন সময়েই পান করিবে। উহাতেও মান ঠিক হওয়া চাই। অধিক জল পান করিলে পরিপাক হইতে পারে না, পাকযন্ত্র ভাসিয়া যায়। অল্প হইলেও কার্য্য সমাধা হয় না, এবং একেবারে না হইলেও চলে না। অতএব মান ঠিক রাখিয়া অন্ন ও জল গ্রহণ করিতে হইবে।

"অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্ন-
মনম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায়
মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি" ॥

ভাব প্রকাশঃ।

অম্বুপানে অন্নের পরিপাক হয় না অনম্বু পানেও সেই দোষ, অতএব বহ্নিবর্দ্ধনার্থ মুহুর্মুহু জল পান করিবে। তাহা অধিক নহে। ইহাদ্বারা জলপান অবশ্য কর্ত্তব্যমাত্র বুঝা গেল। ভোজনের পূর্ব্বে পরে কি, মধ্যে তাহা বুঝাইবার জন্য আর এক শ্লোকে বিস্তার করিয়াছেন্।

"ভুক্তস্যাদৌ জলম্পীতং কার্শ্যমন্দাগ্নিদোষকৃত্।
মধ্যেঽগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠমন্তে স্থৌল্যকফপ্রদম্ ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

ভোজনের পূর্ব্বে জল পান করিলে কৃশতা ও মন্দাগ্নিদোষ জন্মে মধ্যভাগে অগ্নি-দীপিত হয়, অন্তে স্থূলতা ও কফদায়ক হয়। অতএব মধ্যভাগে শ্রেষ্ঠ। জল অমেধ্যবস্তুদ্বারা পরিশ্রুত করাও দোষ (ফলতঃ নির্দ্দোষ জল পান করা কর্ত্তব্য)। অন্ততঃ "বস্ত্র-পূতং জলং পিবেৎ" আর কে বারণ করে?

এখন মোটামুটি খাদ্য সম্বন্ধে একরূপ বলা হইল। বলা হইল যে, প্রকৃতি-ভেদে রুচি ভেদ হইলেও উত্তম হইতে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য। বলা হইল ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ি-বিধানানুসারে অন্নগ্রহণ করিতে হইবে। কারণ খাদ্য-জাতের সহিত ধর্ম্মের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। এমন কি প্রায় প্রত্যেক কার্য্যের সহিতই ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে। জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন খাদ্য, খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই কেন? ধর্ম্ম

অনুষ্ঠান সাপেক্ষ। অনুষ্ঠানে পাপ থাকিলে কিরূপে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে? ধর্ম্ম ধর্ম্ম-শব্দ করিলেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মাচরণ জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া অনুষ্ঠান না করিলে ধর্ম্মসাধন ঘটে না। মন পবিত্র না হইলে, সত্ত্বোদ্ভব বলবৎরূপে না ঘটিলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে আন্তরিক ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছার প্রাবল্য না হইলেও লোক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সেই ইচ্ছার প্রাবল্য সাধন করিতে হইলে সাত্ত্বিক আহার বিহারের নিরতিশয় প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক আহার বলিয়াছি। লোকের আহারাদিগ্রহণপ্রবৃত্তি-পর্য্যালোচনা করিলেই কিদৃশী রুচি তাহা বুঝা যাইতে পারে।

আধুনিক কলিরোগগ্রস্ত বাবুধর্ম্মাক্রান্তগণ আহার গ্রহণে অতিশয়স্বেচ্ছাচারসম্পন্ন। খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে ইহা বাবুরা বুঝেন না, সুতরাং মানিয়া চলেন না। তাঁহারা প্রায়ই শ্বেতদ্বৈপায়নের শরণাগত হইয়া বিজাতীয়প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ইহা সঙ্গত কি অসঙ্গত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়নগণ যে সমস্ত রত্নসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা বাবুরা দেখিতে পান না। যাহা দর্শন করেন তাহাও পরের মুখে, সুতরাং তথ্যলাভে বঞ্চিত। পাণ্ডুরোগী যেমন সমস্তই পাণ্ডুবর্ণ দেখে, বাবুদেরও তেমন অবস্থা হইয়াছে, না কি? তাঁহারা যাহাদের অনুকরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে চান তাঁহাদের জ্ঞান আছে কি? প্রকৃত জ্ঞানলাভে তাহারা, সুতরাং বঞ্চিত। যাহা ইংরাজি কলকৌশল প্রদর্শিত হইতেছে উহা রজোগুণের কার্য্য। সত্ত্বগুণের কার্য্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এই ভারত পূর্ব্বে সত্ত্বপ্রধান ছিল। সেই জন্যই ভারতে এতদূর ধর্ম্মোন্নতি হইয়াছিল। এমন ধর্ম্মপ্রাণ দেশ জগতে আর আছে কি? যেই, সেই ধর্ম্মভাব অপসারিত হইতেছে, অমনি নানাবিধ বাধা বিপত্তি ক্রমে ক্রমে ভারতকে জীর্ণ শীর্ণ করিতেছে। আশ্রমবিশেষে সাত্ত্বিক রাজসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব আছে, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য সত্ত্বের প্রতি। একজন প্রাতঃস্নায়ী নিরামিষাশী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে যতদূর ধর্ম্মভাব দৃষ্ট হয়, আর একজন প্লুষ্ট-মাংসভোজী শৌচাচারবিহীন গান্ধারদেশীয় যবনান্তঃকরণে তেমন ধর্ম্মপ্রবণতা দৃষ্ট হয় কি? একজন পরদুঃখে কাতর, অন্য নিষ্ঠুরতাপ্রিয়। একে ধর্ম্মতত্ত্বের গভীরতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় নিমগ্ন। অন্য অযথা বলপ্রকাশ জন্য আস্ফালন-নিরত। একের গাত্রের পবিত্রগন্ধসংস্পর্শে পবিত্রতা লাভ হয়। অন্যের উৎকট গাত্রদুর্গন্ধে নাসিকা আচ্ছাদন করিতে হয়। একজন আত্মবলে বলীয়ান্, বিদ্যুদ্দামের ন্যায় অন্তর্জ্যোতিঃ দেদীপ্যমান, অন্যে পাশববলে

মহিষসদৃশ। এইরূপ বৈষম্যের অনেক কারণ। আহার তন্মধ্যে প্রধান। ইহা কে অস্বীকার করিবেন? এইরূপ যতই আলোচনা করা যায় ততই দৃষ্ট হইবে খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। দেশ নষ্ট হইলে অবশ্য কাহারও স্বার্থসাধন অনায়াসে হইতে পারে, সেজন্য কলিদেব বাবুদের স্কন্ধ সম্পূর্ণরূপে আরোহণ করিয়াছেন। তাহা না হইলে বাবুদের এরূপ মোহ ও ভ্রম কেন?। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসন্ততি-বাবুগণ! তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, তাঁহারা দিন দিন অধঃপাতে বসিয়াছেন, কি, কি হইতেছেন। যাহাদের চরণরেণু গ্রহণের জন্য মনুষ্যমাত্রেই হস্ত প্রসারণ করিত, আজ তাহাদের সন্তানগণ পতিত এবং বিজাতীয়পদানুসরণে বিলোল। একবার পূর্ব্বাপর ভাবিয়া কার্য্যকরাও মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

বাবুদের কতিপয় ভ্রমপ্রদর্শন করা যাইতেছে ঐ ভ্রমপ্রাধান্যেই তাঁহারা খাদ্যগ্রহণ-নিয়মে অনিয়মিত সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল।

১। বাবুদের সনাতনবেদের প্রতি আস্থা নাই। বেদের অপৌরুষেয়তা মনে ধারণা হয় না। ঈশ্বরে ভক্তি নাই। পরং, বেদ ঋষিবিরচিত, জড়োপাসনার স্তবরাশি ইহাই ধারণা। মেক্‌সমূলরপ্রভৃতি উঁহাদের আচার্য্যগুরু। যেমন বাইবল-প্রভৃতি বেদও তেমন। ইত্যাদি মূলভ্রান্তি।

২। ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের অনুগত। সুতরাং উহার আর অধিক প্রমাণ কি? বিশেষতঃ স্বার্থপরতার বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত আছে এই ভ্রমে মানুষমাত্রই সমান। অধিকারিভেদের অপ্রয়োজনীয়তা, সুতরাং বাবুবৃন্দ উচ্ছৃঙ্খল। আর্য্য, অনার্য্য ম্লেচ্ছ, যবন, শকপ্রভৃতি সকলই সমান।

৩। আয়ুর্ব্বেদীয়ে উপযোগিতা নাই। কারণ পূর্ব্বে নরদেহ নির্ণয় জ্ঞান ছিল না, মানব দেহতত্ত্ব (physiology) আবিষ্কৃত ছিল না, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও উপদেশ অকিঞ্চিৎ কর। এই অন্ধবিশ্বাসে বাবুদের বিশ্বাস, আয়ুর্ব্বেদ হইতে সুদূরে অবস্থিত। বাবুরা অন্ধ না হইলে এইরূপ প্রলাপোক্তি কোন সাহসে করিবেন। আদৌ এ দেশের গ্রন্থাবলী বাবুদের নয়নের ও মনের বহির্ভূত। আজীবন পরবিদ্যায় শিক্ষিত। সুতরাং এতত্ব নারাখা আশ্চর্য্য নহে। (বেদ অপৌরুষেয় কিনা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রদর্শিতব্য) যদি কল, কৌশল, আগ্নিপত্য. দর্শনে বিশ্বাসের গোনী (থলে) শ্বেতদ্বীপে যায় এবং অনুচিকীর্ষা বলবতী হয়, তবে বাবুরা কেন একবার দেখেন না যে উহা প্রচুর পরিমাণে

ভারতে ও ছিল। এমন কি তত্ত্ব আছে যাহা ঋষিদের জ্ঞানবলে আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা উচ্ছিষ্ট খাইয়া মানব হন নাই, যাহা করিয়াছেন স্বীয়তপস্যাবলে। তদানীন্তনআবিষ্কৃততত্ত্বসমূহের অনুবলে অদ্য ইউরোপ যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছে। তবে কেন জাতীয় গৌরব অবহেলা করিয়া পরপদরেণুগ্রহণার্থ হস্তকণ্ডূয়নে বাবুদের প্রবৃত্তি। উহাতে পরিণামে ধিক্কার ও অধোগতি ভিন্ন আর কি লাভ আছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র জগতের আদি চিকিৎসাগ্রন্থ। উহাতে ভৈষজ্যাবলী, অস্ত্র-প্রয়োগ, শবব্যবচ্ছেদপ্রণালীপ্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয়ই বিশদরূপে ব্যক্ত আছে। দীর্ঘপর্য্যবেক্ষণে উহা সম্যক্ পরিপুষ্ট ও মার্জ্জিত। ক্রমে আদিগ্রন্থ ও যাবতীয় গ্রন্থ অধ্যাপনা না করিয়া সহজোপায়ে সর্ব্বফলপ্রদা সংক্ষিপ্তগ্রন্থাবলী অধ্যাপিত হইত। তাহাতেই সুচারুরূপে চিকিৎসা কার্য্য চলিত। জ্ঞানের আধিক্যেই সংক্ষেপে সম্পূর্ণ কথা প্রকটিত হয়। এই জন্য অধস্তনবৈদ্যগণের শব-ব্যবচ্ছেদাদিক্রিয়ার প্রয়োজন হয় নাই। যেমন মৌলিক গণিতগ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলেও শুভঙ্করী আর্য্যা অভ্যাস করিয়াই সামান্য পণ্যবিক্রেতা বাবুদিগকে ব্যবহারিক অঙ্কে সতত পরাস্ত করিয়া থাকে, তেমন নিদানাদি গ্রন্থেও পাশ্চাত্য ভূরি ভূরি চিকিৎসাগ্রন্থ পরাস্ত হইয়া থাকে। যদিও যবন ম্লেচ্ছের অত্যাচার ও প্ররোচনায় বৈদ্যক শাস্ত্রের তাদৃশ আদর ও আলোচনা হয় নাই তথাপি বৈদ্যগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসক হইতে কোন ও অংশে হীন নহে। ইহা অহরহ দৃষ্ট হইতেছে তথাপি বাবুগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় সুতরাং উপদেশে আস্থা স্থাপন করিতেছেন না, তবে বাবুদের অন্ধ বিশ্বাস ভিন্ন কি বলিব?

"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" ঘরের কোণে মধু-থাকিলে কি জন্য পর্ব্বতে মধু আনিতে যাইবে? যদি দেশে না ঘটে না থাকে তখন উহা অনুসর্ত্তব্য। আরও দেখিতে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য-চিকিৎসাগ্রন্থে কর্ম্মজ বা দোষকর্ম্মজব্যাধির কথা নাই। উহা কি অসম্পূর্ণ অল্প শিক্ষা নহে?—

এই যে অসময়ে অতিশীঘ্র আহার সমাপন করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অসময়ে ধাবিত হইতে হয় ইহা সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টের কারণ।

"ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ধাবনং যানমেব চ।
যুদ্ধং গীতঞ্চ পাঠঞ্চ মুহূর্ত্তং ভুক্তবাংস্ত্যজেৎ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

ভোজনান্তর মুহূর্ত্তকাল বিরাম কর্ত্তব্য। নচেৎ বিশেষ অনিষ্ট ঘটে।

দিবামানকে পনরভাগ করিলে ভাগফল যাহা হয় তাহা এক মুহূর্ত্ত। ভোজনের পরে মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম করিয়া ব্যয়াম, ব্যবায় (মৈথুন) ধাবন, যানারোহণ, যুদ্ধ, গীত, ও পাঠ করা নিষিদ্ধ। বাবুদের ইহা মনে স্থান পায় কি? বর্ত্তমান সময়ে প্রায়ই উহা প্রতি পালিত হয় না। ফলও হাতে হাতে, উহাই দৌর্ব্বল্যের, রোগের, সুতরাং অল্পায়ুর নিদান। বাবুরা তাহা দেখিতে পান না, সেইজন্য ভুক্তভোজন, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির আন্দোলন উত্থাপন করেন।

যতদিন ভারত আবার সাত্ত্বিক হইতে চেষ্টা না করিবে, আহার বিহারে সংযত থাকিয়া শাস্ত্রোক্তবিধিনিষেধে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি না জন্মিবে, আত্মবোধ না হইবে, জাতীয় গৌরব যাহাতে পরমুখাপেক্ষ না হয় এরূপ আন্তরিক প্রয়াস না ঘটিবে, হিন্দু-হৃদয় ধর্ম্মপাণে প্রাণিত না হইবে, ততদিন ভারতের মঙ্গল নাই ইহা নিশ্চয়। ঐ যে মরুদেশসম্ভূত-যবন-নিকর-সমীপে বৈদেশিক প্রভাব তিরস্কৃত হইল উহার একমাত্র কারণ ধর্ম্মসূত্রে দৃঢ় বন্ধন। ধর্ম্মবন্ধনে সুদৃঢ় বদ্ধ হইতে হইলে প্রথমতঃ খাদ্যের প্রতি যথাশাস্ত্র সংযত হইয়া আশ্রমোচিত নিত্যকর্ম্মের সতত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাত্ত্বিকভাবে বিভোর ছিল বলিয়াই দণ্ড্যাচার্য্যের তেজঃপূর্ণ বাক্যের নিকট জগজ্জয়ী আলেক্জেণ্ডারের বৃহন্মুকুট অবনত হইয়াছিল। এতাদৃশ বহুবিধ উদাহরণ, যুক্তি ও আপ্তবাক্য সনির্ব্বন্ধ বলিয়াদিতেছে খাদ্যের প্রতি সংযত হও, কারণ খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিশেষ সংসক্ত। শোণিতের উষ্ণতায় বুদ্ধিও উষ্ণ হয়। আর তমঃপ্রাবল্যে নিরুদ্যমতা ঘটায়। এই উভয়ই প্রবল হইয়া দেশে স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার প্রবর্ত্তিত করিতেছে। উত্তম সহজেই অধম হইতে পারে, কিন্তু উত্তম হওয়া প্রয়াস-সাপেক্ষ। তমোভাব অপসারিত না হইলে উত্তম হইতে পারা যায় না, তমোমল অপসারণ করিতে হইলে আহার বিহারে সংযম আবশ্যক। ইহা বারংবার বলার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম

কি? যাহার বোগধম্ম্য সে অবশ্যই ইহাদের প্রতি সাবধান হইবে। আর যে, নয়ন মুদিত করিলেই হাতে ২ ঈশ্বর পায় তাদৃশ সুবাহু সুগুণ পুরুষ অবশ্যই যথেচ্ছাচারে বিনিয়োজিত থাকিয়া ধর্ম্মের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক নাস্তিকতার অকৃদামে মস্তক মণ্ডিত করিবে। লোভ সংবরণ গুণ মানুষেরই আছে। যাহার নিরোধক্ষমতা নাই সে নরাকৃতিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা লোভ-পরবশ হইয়া বাষ্পীয়শকটে-বিরাম-স্থানে পর্য্যুষিত অমেধ্য কুণ্ডলী (জিলেপী) প্রভৃতির ভগ্নাংশ গ্রহণে লোলুপ তাহাদের উপর আর আশা কি? ব্রহ্ম জ্ঞান যদি মুক্তির একমাত্র কারণ হয়, উপাসনা যদি মধ্যম মানবের সার কার্য্য হয়, অনার্য্য ম্লেচ্ছ যবন হইতে বিশিষ্ট থাকা যদি আর্য্যকার্য্য হয়, শৌচাচার, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৃতি, ক্ষমা সমূহ যদি মানবের ভূষণ হয়, ঔদার্য্য, বিনয় ও শিষ্টাচারব্রত যদি সমাজ বন্ধনের মূল হয়, ধর্ম্মই যদি অবশ্য প্রতিপালনীয় হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে চিত্তের সংযম জন্য খাদ্যের প্রতি শাস্ত্রীয় প্রথায় সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। যথেচ্ছব্যবহারে মনঃ সতত চঞ্চল থাকে, সুতরাং শান্তিলাভ হয় না, শান্তি না থাকিলে কখনই নিত্যতত্ত্বের ধারণা হয় না। ভগবান নারদ যাবদীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত ছিলেন, উহার জন্য তাঁহাকে বারংবার ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার গুরু ভগবান সনৎ-কুমার, ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা নির্ধূতকল্ম নারদকে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-রত্নে বিভূ-ষিত করিয়াছিলেন। ভগবান সনৎকুমার শেষকালে যে সত্ত্বাহার বিহারের জন্য অনুসাশন করিয়াছিলেন, তদনুসারেই নারদের হৃদয় উপযুক্ত হইয়াছিল।

"—আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ স্মৃতি লভ্যে সর্ব্ব-গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ, ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। ভূমাত্মাকে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি মন্দিরে স্থাপিত করিতে হইলেও প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি আবশ্যক, উহাতে সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া থাকে এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে ঐরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি শক্তির উৎপত্তি হয়। ভগবান নারদকেও যে উপদেশ শিরোদেশে রক্ষা ররিতে হইয়াছিল আধুনিক উন্নতিধ্রুব বাবুকদম্ব, অনায়াসেই উহা অবহেলা করেন। উন্নতির উৎ, সম্পূর্ণ উৎপাটিত হইয়াছে, কলিদেব উহার প্রবর্ত্তক, নচেৎ এরূপ সুজনোপদেশ বাক্যে বীতশ্রদ্ধ হইতে হইবে কেন? আমরা এখনও

বিনীত-ভাবে বলি, খাদ্যে সংযত হইয়া অধিকারানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে মন প্রাণ সমর্পন করা কর্ত্তব্য। দিন যায় এখনও কি প্রস্তুত হইবে না? আর কুখাদ্য কেন।

প্রাতঃকৃত্য।

অনুবৃত্ত।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিত্তকে একান্ত ধর্ম্ম প্রবণ করিয়া এইক্ষণে কর্ম্মক্ষেত্রে মানব তাহার পদে পদে পরিচয় প্রদান করুন্। ক্রমে আচার্য্যগণ তদীয় পথ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—

"নিদ্রাং জহ্যাদ্ গৃহীরাগ নিত্যমেবারুণোদয়ে।
বেগোৎসর্গং ততঃ কৃত্বা দন্তধাবন পূর্ব্বকম্।
স্নানং সমাচরেৎ প্রাতঃ সর্ব্ব কল্মষনাশনম্॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

প্রত্যহ অরুণোদয়কালে উঠিয়া মলাদি পরিত্যাগ করিয়া দন্তধাবনান্তে সকল মালিন্যহারক স্নান করিতে হইবেক। অরুণোদয়ের অর্থ—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দণ্ডচতুষ্টয়াত্মক প্রাতঃকাল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

"চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে।"

মলমূত্রাদির বেগ রন্ধ করা কখন উচিত নহে।

"বেগরোধং নকর্ত্তব্যমন্যত্র ক্রোধবেগতঃ।"

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর।

ক্রোধের বেগ ভিন্ন অন্য কোন বেগ রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। এইক্ষণ পুরীষত্যাগের জন্য শাস্ত্রকারগণ স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা

"ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈঋত্যামিষু বিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ।
তিষ্ঠেন্নাতি চিরং তস্মিন্নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥"

বিষ্ণু পুরাণ।

"মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ম্।
হস্তানাস্তু শতেসার্দ্ধে লক্ষ্যং কৃত্বা বিচক্ষণঃ॥

পিতামহ।

শয়ন স্থান হইতে দেড়শত হস্তের বহির্ভাগে লক্ষ্য করিয়া মধ্যম প্রকার ধনুর্দ্ধারা বাণ বিক্ষেপ করিবে, যে স্থানে বাণ পড়িবে, সেই বাণ চিহ্নিত ভূভাগ বা শরপতন যোগ্যস্থান অতিক্রম করিয়া, মল ত্যাগ করিবে; সেই দুর্গন্ধময় স্থানে অধিক কাল থাকিবে না এবং কোন কথা বলিবে না। স্থূল কথা—বাটীর নৈঋত কোণে অন্ততঃ দেড়শত হস্তের মধ্যে কোনরূপ অপরিষ্কার না হয়। নৈঋত কোণে পুরীষ ত্যাগ বিধানের অভিপ্রায় এই যে, গৃহমাত্রের বাটীর সম্মুখভাগ দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী হওয়া উচিত; সুতরাং সেই সম্মুখভাগে জলাশয় সন্নিহিত স্থান পুরীষ পরিত্যাগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকাই সঙ্গত; অন্তঃপুর বা অভ্যন্তরভাগ কোনরূপে নহে। কিন্তু তাহাতে বসন্তাদি ঋতু বিশেষে দাক্ষিণানিল ভবনাভ্যন্তরে দুর্গন্ধ আনিতে পারে; এই জন্য সম্পূর্ণ সম্মুখভাগে বা দক্ষিণদিকে অপরিষ্কার করা হয় না, সুতরাং নৈঋত কোণের নির্দ্দেশ। অগ্নিকোণে রন্ধন শালার বিধান আছে, সেই দিক পরিষ্কার রাখিতেই হইবে। পক্ষান্তরে উত্তরদিক্ অপরিষ্কৃত হইলে, শীত ঋতুতে পূতিগন্ধ বাটীর ভিতরে আসিতে পারে এবং প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগে শয়ন গৃহের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং সেই সেইদিকে হইতেই পারে না। ইহাই বুঝিয়া শাস্ত্রকারগণ—নৈঋ‌র্ত কোণে আপস্কর নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।—

"ঐশান্যাং দেবশালাস্যাৎ আগ্নেয্যান্তু মহানসম্।
আপস্করস্তু নৈঋ‌র্ত্যাং বায়ব্যাং কোষমন্দিরম্॥

সার সংগ্রহ।

বাস্তুর ঈশান কোণে দেব শালা, অগ্নিকোণে পাকাগার, নৈঋত কোণে আপস্কর (পায়খানা) ও বায়ুকোণে ধনাগার করিবে। আর্য্যগণের বাস্তুবিধির পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এই সব যুক্তি আরও অন্তরস্পর্শিনী হইবে; কিন্তু অদ্য তাহা আমাদিগের আলোচ্য নহে। এইক্ষণ প্রকৃতই অনুসরণীয়।

মৌন ও অনুদ্বিগ্নচিত্তে নিভৃত স্থানে আহার, বিহার, মলমূত্রত্যাগ, যোগ ও তপশ্চর্য্যা করিতে হইবে।

"আহার-নির্হার-বিহার-যোগাঃ সুসম্বৃতা ধর্ম্মবিদাতু কুর্য্যাৎ।
বাগ্বুদ্ধিগুপ্তিস্তু তপস্তথৈব, ধনায়ুষীগুপ্ততমেতু কার্য্যে॥"

বশিষ্ঠ।

ইহার মর্ম্ম সহৃদয় সংবেদ্য। মহাত্মা মনু আবার স্থান বিশেষের নিষেধ করিতেছেন্।

"নমূত্রং পথি কুর্ব্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে।
ন কালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্ব্বতে॥
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন গচ্ছন্নাপি সংস্থিতঃ॥
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্ব্বত মস্তকে।
বায়্বগ্নিবিপ্রাণাদিত্যমপঃপশ্যংস্তথৈব চ।
ন কদাচন কুর্ব্বীত বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্॥"

পথ, ভস্মরাশি, গোস্থান কৃষ্টভূমি, জল, চিতাস্থান, পর্ব্বতচূড়া, জীর্ণদেবালয়, বল্মীক, সর্পাদি সমন্বিত গর্ত্ত ও নক্র চক্র সঙ্কুল নদী-তীরে এবং বায়ু, অগ্নি, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, সূর্য্য ও জলের সম্মুখেও গমন ও দণ্ডায়মান অবস্থায় বিণ্মূত্রত্যাগ করিবে না।

যে স্থলে প্রাণগত বিপৎপাতের সম্ভব আছে, সেখানে সুবিধানুসারে উক্ত নিষেধ অতিক্রম করিতেও পারে।

"ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথাসুখ মুখঃকুর্য্যাৎ প্রাণবধভয়েষুচ॥" মনু।

এইরূপ বিধি ও নিষেধের ফল প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না?

এই প্রকারে যথোক্ত স্থানে বিণ্মূত্র ত্যাগের পর পূতিগন্ধ বিকীর্ণ না হইবার জন্য, তৃণ লোষ্ট্রাদি দ্বারা সেই স্থান আচ্ছাদন করিয়া স্বভাবতঃ বামহস্ত বা রোগাদি গুরুতর কারণ বশতঃ উভয় হস্তের দ্বার শৌচ করিবে।

" ধর্ম্মবিদ্দক্ষিণং হস্তমধঃশৌচে ন যোজয়েৎ।
তথৈব বামহস্তেন নাভেরূর্দ্ধং ন শোধয়েৎ।
প্রকৃতিস্থিতিরেষাস্যাৎ কারণাদুভয় ক্রিয়া॥"

দেবল।

অবস্থাভেদে জল মৃত্তিকাদি দ্বারা বহু বা অল্প বার শৌচ করিবে। বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ ও লেপের লেশ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শৌচ করাই চাই।

" দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্।
উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা শৌচং প্রকল্পয়েৎ॥"

দক্ষ।

" প্রমাণং শৌচসংখ্যাবা ন শিষ্টৈরুপদিশ্যতে।
যাবচ্ছুদ্ধিং ন মন্যেত তাবচ্ছৌচং প্রকল্পয়েৎ"

ব্রহ্ম পুরাণ।

বাহ্য ও আন্তরিক মলিনতায় মনুষ্য সর্ব্বদা আক্রান্ত। মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা বাহ্য মালিন্যের পরিহার হয় এবং সাত্ত্বিকভাবোদ্রেকে মানসিক মলের অবসান হয়।

"শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং ভবেদ্বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥"

ব্যাঘ্রনাদ।

"স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্ম বিধিক্রিয়াঃ।
মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিষ্ফলাঃ॥"

হারীত।

একবার বাবুবর্গ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন, মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি বা শিষ্টতার শেষসীমা (Highest pitch of civilization.) লাভ করিতে হইলে অনেক চাই; কেবল পরিষ্কৃত কৃত্রিম পরিচ্ছদ পরিধান করিলে চলে না। যাহাতে স্বভাবজাত শারীরিক ও মানসিক মল পরিষ্কৃত হয়, প্রত্যহ সেই দিকে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত আর্য্যকার্য্য বিধি, তাহার পরিচায়ক নহে?

যাহারা স্ব-পর-বোধ বা ভেদজ্ঞান রূপ মানস মলে ম্লান, তাঁহাদিগের অগ্রে জলাদি দ্বারা বহির্ম্মল পরিহার করিয়া, অন্তর্ম্মল দূর করিতে চেষ্টা-করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের মানস মল নাই বা অট্টালিকা ও কুটীরে সমান জ্ঞান, তাঁহাদিগের বহিঃশৌচ সুতরাং অনাবশ্যক।

মানস মল কাহাকে বলে শুনুন—

বিষয়েষ্বভি সংরাগো মানসোমল উচ্যতে।

তেষ্বেবহি বিরাগোঽস্য নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্ ॥"

মহাভারত।

চন্দনসৌরভ সেবনে, যাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট ও চিতাগন্ধের ঘ্রাণ লইতে বিপ্রকৃষ্ট, যাহাদিগের স্বপদাভিমান অভ্রভেদী, এবং গৃহিণীর অলঙ্কারের ঝনৎকার যাহাদিগের কর্ণামৃত, তাহারা বিষয়ী না বিরাগী? সেই সব ভেদবোধের পক্ষপাতি ব্যক্তি বর্গের পক্ষে পক্ষান্তরে শৌচাচারের প্রতি উপেক্ষা, ভ্রমের বিজৃম্ভণ নহে?

আর্য্যগণ সংসারী মনুষ্যের পক্ষে যে পরিষ্কার পরিপাটীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতি হতাদর হইয়া, কেবল শৌচাচার-সম্পর্ক শূন্য, পশুসুলভবৃত্তিবিশিষ্ট বিজাতির আংশিক পরিষ্কার পদ্ধতির গুণ-গানে যাহারা প্রবৃত্ত, তাহারা কখনই হৃদয়বান্ নহে। শাস্ত্রীয় শৌচাচার, মুখপ্রক্ষালন, স্নান, অশন, দর্শন, স্পর্শন এবং উপাসনা প্রভৃতি বাহ্য ও আন্তরিক মালিন্য পরিষ্করের উপায় স্বরূপ ইতি।

ক্রমশঃ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

এক্ষণে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের সেই অমূল্য গ্রন্থের মর্ম্মার্থ অনুবাদ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলাম। তবে একথা এখানে বলা আবশ্যক মূল গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত, সুতরাং মূলে যতটুকু রস, অনুবাদে তদপেক্ষা যে অনেক ন্যূনতা হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তন্নিমিত্ত আমরা আবশ্যকবোধে

মধ্যে মধ্যে মূলও উদ্ধৃত করিব। তবে যাঁহারা মূলের রসাস্বাদনে সক্ষম, তাঁহারা বিদ্যোদয়নামক সংস্কৃতপত্রিকা অবলোকন করিয়া ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারিবেন।

মঙ্গলাচরণ।

সিদ্ধি প্রদ অম্বিকারপুত্র (গণপতিকে) নমস্কার করি। প্রত্যক্ষ দেবতা গ্রহগণের অধীশ্বর (সূর্য্য দেব) কে নমস্কার করি। আশুতোষ বিশ্বেশ্বর (মহাদেব) কে নমস্কার করি। এবং দুর্গমে পতিতদিগের দুঃখ হারিণী হরপ্রীয়া (পার্ব্বতী) কেও নমস্কার করি।

চন্দ্র, সূর্য্য যাঁহার নেত্র, যিনি লোকের সৎ ও অসৎকর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ, যিনি স্বীয় নামের জপ ও স্মরণ প্রভৃতি কার্য্যের ফলদাতা, অর্থাৎ যাঁহার নাম জপ বা স্মরণ করিলে এবং যাঁহার রূপ ধ্যান করিলে, মনুষ্য ইহ এবং পরকালের অসীম মঙ্গল লাভরূপ ফল লাভ করে, যিনি বেদের প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি অপ্রতিম অর্থাৎ যাঁহার প্রতিমা নাই এবং যিনি (ভক্তের) বাঞ্ছিত অর্থ প্রদান করেন, সেই (জগতের) হরি এবং অধীশ্বর অব্যয় অর্থাৎ সনাতন রামচন্দ্রকে প্রণাম করি।

গ্রন্থারম্ভ।

"যে সময় এই ভারতবর্ষে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, গৃহীগণ শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র সমূহের দ্বারা অভীষ্ট দেবতা দিগের বন্দনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত, শ্রদ্ধালু এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া চলিত, সত্যপালনই যখন তাহাদের একমাত্র ব্রত ছিল এবং সত্যকেই পরমধন বলিয়া জানিত; বর্ণাশ্রমাচারের রক্ষা এবং বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, আর সকলে সকলকেই বিশ্বাস করিত, এইরূপ অন্যান্য গুণে অলঙ্কৃত ছিল, তখন প্রত্যেক গৃহ প্রত্যহই মহোৎসবে পরিপূর্ণ থাকিত। হায়, হায়, এক্ষণে ভারতবাসীদিগের সে সুবুদ্ধি আর নাই, দিন দিন নাস্তিক্য বুদ্ধিরই বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই সঙ্গে বেদোক্ত ক্রিয়া সকলের লোপ হইতেছে, কাজেই দেবগণ আমাদের উপর বিমুখ হইয়াছেন। ইহার ফল কি হইয়াছে? আমরা দুর্ভাগ্য, দুর্ভিক্ষ এবং নূতন নূতন দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদা ত্রাহি ত্রাহি রবে আর্ত্তনাদ করিতেছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে এইরূপ হাতে হাতে ফল পাইয়াও আমাদের মন আর সেই শান্তিপ্রদ বেদবিহিত দৈব বা পৈত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেনা।

কোন পণ্ডিত সেকেলে বৃদ্ধদিগের এইরূপ খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এসকলই শাস্ত্রে লিখিত আছে, দেখুন অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রথমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে "যখন ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইবে, তখন মনুষ্যগণ পুণ্যহীন হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা বলা হইয়াছে। "এই কলিযুগে মনুষ্যগণ অল্পায়ুঃ, কুপথগামী, মূঢ়বুদ্ধি, দুর্ভাগ্য এবং সর্ব্বদা নানাবিধ উপদ্রবে উপদ্রুত হইবে। পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহে তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এইরূপ অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, দুঃখ এই যে কলি প্রভাবে হতবুদ্ধিমনুষ্যগণ, বিশেষ তাঁহাদের শিক্ষাগুরু বা ম্লেচ্ছগণ এ সকল কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধেরা বলিলেন "কেবল যবন, খৃষ্টিয়ান, বা নাস্তিক বৌদ্ধ প্রভৃতি যদি ঐ সকল কথা উপহাস করিয়া উড়াইত তবে, বিশেষ খেদের কারণ ছিল না, কিন্তু যাঁহাদের পিতা পিতামহ আদি পূর্ব্ব পুরুষ অনন্তকাল হইতে, আবাহমান বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাহারা যে ঐ সকল কথায় উপহাস করে, ইহাই মর্ম্মভেদী দুঃখের কারণ। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিলেন, এক্ষণে যে সেই বর্ণাশ্রমাচারিদিগের বংশধরের মধ্যে কেহ নাস্তিক কেহ বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া, শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমাচারের কঠোর বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া, যথেষ্টাচারে ব্যাপৃত হইয়াছে, ইহাও কলিকালের প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ কলি ধর্ম্মে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে "শূদ্রেরা প্রণব উচ্চারণ করিবে, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবে। এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্ম বিধানমতে ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিবে।" কেবল তাহা নয়, "মদ্য গঙ্গাজলের সমান হইবে, যবন এবং ব্রাহ্মণে অবিকারচিত্তে এক আসনে এবং এক পাত্রে পান ভোজন করিতে থাকিবে। এইকথা বলিতে বলিতে পণ্ডিত জী একবার চারদিকে চক্ষু ফিরাইলেন। দেখিলেন তাঁহার চারিদিকে একটি প্রবল জনতা হইয়াছে। সেই জনতা দেখিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। "এই যে এদিকে দেখিতেছি কতকগুলি বর্ণাশ্রমচারী

ইহারা সেই অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য শক্তিমান্ দয়াল পরমেশ্বরের অবতারদিগের লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং মনন করিয়া আনন্দে পুলকিত হওত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে, ইহাদের স্বভাব অতি-পবিত্র হইলেও মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান দ্বারা সম্ভাবিত পাপের বিনাশ সাধন করে এবং ব্রহ্মকে নির্গুণ জানিয়াও সগুণ ভাবে তাঁহারা ধ্যান ও অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। ঐ যে দেখিতেছি কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ইহাঁরা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের মত ও তদুক্ত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিয়া, আপনাদের স্বকপোল কল্পিত মতকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে, ইহারা যথেষ্টাচরণে প্রায় নাস্তিকদিগের তুল্য। সাংসারিক সুখে বিশেষ অনুরক্ত, প্রাচীন আচার ব্যবহারের উপরবিরক্ত, আধুনিকজনকৃত যুক্তিপ্রবলগ্রন্থের পরম ভক্ত, ইহারা সময়োচিত বেশ বিন্যাশে বিশেষ পটু, অর্থাৎ কখন গেরূয়া বস্ত্র, কখন বা চাপকান চোগা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের মতে শয়ন, ভোজন, উপবেশন অন্তঃপুর বিহরণ প্রভৃতি কার্য্যে তৃপ্তি লাভের সময় ঈশ্বরকে ধন্য বাদ অর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ও দিকে যে কতকগুলি নাস্তিকও দেখিতেছি এই নাস্তিকেরা অতিশয় সাহসিক, কারণ ইহারা মরণানন্তর কিছুই নাই, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে পরলোকের ভয় শূন্য, কাযেই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে। ইহাদের মতের প্রথম প্রবর্ত্তক বৃহস্পতি বলিয়াছেন, মরণের পর স্বর্গ বা অপবর্গ (মোক্ষ) কিছুই নাই, সুতরাং আত্মার পরকালে কিছুই ভোগ করিতে হয় না। বর্ণাশ্রমচারিদিগের ক্রিয়াসকল কোন কাযেরই নয়, অগ্নিহোত্র তিন বেদ, ত্রিপুণ্ড এবং ভস্মলেপন প্রভৃতি কার্য্য কেবল বুদ্ধি এবং পুরুষকার শূন্য মনুষ্যদিগের জীবিকার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, শ্রাদ্ধে যদি মৃত জীবের তৃপ্তির সাধন হয়, তাহলে নির্ব্বাণ প্রদীপের শিখা ও তৈল দানে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যদি এই পৃথিবীতে দান করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হওয়া সম্ভব হয়, তবে অট্টালিকার উপরতলে শয়ান ব্যক্তির উদ্দেশে নীচের তল হইতে দান করিলে কেন তাহার তৃপ্তি হয় না। মরণের পর আত্মা যদি পরলোকে বাস করে, তবে এই চিরপরিচিত বন্ধু বান্ধবদিগের স্নেহবসে মধ্যে২ দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসেনা কেন?

" অন্যদিকে দেখিতেছি, নানা শাস্ত্র পারঙ্গত কতকগুলি পণ্ডিত ও

আছেন। অতএব একটা প্রকাণ্ড সভাই হইয়াছে বলিতে হইবে, অতএব এই স্থানে ধর্ম্মের আলোচনাই কর্ত্তব্য"।

জন্মান্তর।

একটা প্রবাদ আছে, "গাধা সব কর্‌তে পারে; ভাতের কাটী বৈতে নারে"। মনুষ্য গর্দ্দভও সব করিতে পারে—প্রবল রোগে যন্ত্রণা, রাজকৃত দণ্ডে লাঞ্ছনা, শত্রুকৃত দুর্দ্দশা—এসব সহ্য করিতে পারে। পারে না কেবল ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তা করিতে; চিন্তা করিতে পারিলেও সে সুখের অনুকূল কার্য্য করিতে পারে না। ভবিষ্যৎ চিন্তা ভবিষ্যৎ সুখের ও আশু দুঃখের কারণ। রাত্রিতে দধি উপস্থিত। খাই কি না খাই—যদি খাই, তবে আশু সুখ হয়; পরিণামে দুঃখ হয়। না খাই, তবে আশু দুঃখ হয়; কিন্তু ভবিষ্যতে সুখ হয়। অনেকে শ্যাম রাখি কি কুলরাখি—কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া কুলে থেকে শ্যামের মন যোগাব+দধিতে জল দিয়া ঘোল করিয়া খান। এইরূপ, জগতে অনেক লোক আছেন, পরকাল মানে না, পরকাল মানিতে হইলে, নিয়মিত স্থানে অস্খলিতভাবে থাকিতে হয়, ভবিষ্যৎ সুখের তরে অচির ভাবি-দুঃখের বেগ সহিতে হয়। যাহার ধারণা আছে সুরাপান করিলে ইহকালে অন্তঃকরণ তুষ্ট হয়, অর্থের ব্যয়; অনর্থের প্রশ্রয়। এবং পরকালে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সে কখন তাদৃশ অপকার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, এ ধারণা যাহার নাই সে সব করিতে পারে, আবার যে দুকুল রাখিতে চায়—সুরাপান করাও অন্যায় আশুসুখ-কর অমন গোলাপ নিমিঝিমি নেসাটুকু ত্যাগ করাও অন্যায়; সেকলে কৌশলে কার্য্যশেষ করে—শোধন করিয়া সুরা সেবন করে। প্রত্যুত যাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে, সে আশুসুখ প্রদ সুরা সেবন পরিহার করিয়া পরিণামের পথ পরিষ্কার রাখে।

আফিলের ভয় থাকা বড়ই দরকার। যে হাকিমের আফিলের ভয় নাই, তাহার নিকট সুবিচারের প্রার্থনা করা বৃথা। বোধ হয় সকলেই জানেন স্মলকজ্‌ কোর্টের মোকদ্দমার বড়ই গোলযোগ হয়। আফিল নাই,—

ইহাই গোলযোগের প্রধানতম কারণ। প্রায়শঃ সিবিলিয়ান্ (?) মহাপ্রভু-দিগের উপর-আওলার ভয় নাই; তাই আজকাল সিবিলিয়ান্ প্রচুর ভারত ভূমির ভাগ্যে ভয়ানক বিভৎসক্রিয়ার অভিনয় হইতেছে। যদি বিলাত আমাদের নিকট হইত, কথায় কথায় অবিচার হইলে সুবিচারের প্রার্থনা করা হইত, বিলাতবাসীরা যদি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন, তাহা হইলে আমরা আর পদে পদে এত বিড়ম্বিত হইতাম না;—মহাপ্রভুগণও আফিলের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতেন। তখন আইনানুসারে কাজ হইত। প্রস্তুত বিষয়ও ঠিক এইরূপ। আমরা যদি এইরূপ আফিলের (পরকালের) ভয় করি, তাহা হইলে আর পদে পদে এরূপ অপকার্য্য করিতে পারি না; তখন আমরাও আইন (শাস্ত্র) অনুসারে কাজ করি। স্মার্তভট্টাচার্য্য মহাশয় মলমাসতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

> "দৃষ্টাৎ সুখাদধিকং দুঃখমায়ত্যাং বিশ্বাসং
> বিভ্যতং পুরুষমাস্তিকং শক্নোতি বারয়িতুং রাগতঃ
> প্রবৃত্তে বলীয়ান্ শাস্ত্রপ্রতিষেধঃ" ॥

পাপকার্য্যজনিত দৃষ্টসুখ হইতে পরকালে অধিক দুঃখ হয়, ইহা যে জানে এবং তাহার যদি পরকালের ভয় থাকে, তবে সেই আস্তিক পুরুষকে শাস্ত্র ওরফে আইন বারণ করিতে সমর্থ হয়। নতুবা নয়।

ফল কথা, ভবিষ্যচ্চিন্তা করিতে হইলে পরকাল মানিতে হয়। আজ কাল ভবিষ্যচ্চিন্তাও নাই, পরকাল মানাও নাই। ইহই অন্তরের কথা; মুখে কেবল "পরকাল মানার প্রমাণ নাই" বলিয়া আপত্তি করা হয়। উনবিংশশতাব্দীতে গুপ্তচরিত (Private character) অনুসন্ধান করা নিতান্ত অন্যায়; সুতরাং অন্তরের কথা ত্যাগ করিয়া মুখের কথার প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত হইলাম। মুখের কথা পরকাল বা জন্মান্তর স্বীকার করার প্রমাণ নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার। আমাদের অতি অল্প জ্ঞানই প্রত্যক্ষের দ্বারা সাধিত হয়। অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমান ও আগমের উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের যাহা কিছু বিশ্বাস করিতে হয়, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ইহাদের অন্যতমের কোষ্ঠিতে পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্বাস,

সার্টিফিকেট পায়। সাধারণে এ পরীক্ষা নিয়ত দিয়া থাকে, সময়ে সময়ে সার্টিফিকেটও পায়; অথচ নিয়ত ভুল করে। এই প্রমাণত্রয়ের অন্যতম আগম ব্যতীত অন্য কেহ এ ভুল সংশোধন করিতে পারে না। আজ কাল আগমের প্রতি বিশ্বাস নাই, সুতরাং এ ভুল আর নির্ভুল হয় না—আমি সরলজ্ঞানে বলি, যদি এই বিশ্বাসের ভিত্তি পাকা করিতে চাও' প্রবল-ঝড়-ঝাঁউটায় ভাঙিতে দিতে ইচ্ছা না কর, তবে আমার কথা শুন—আগমের মসল্লার সহিত মিলাইয়া ভিত্তি গঠন কর, তবেই পাকা কাজ হইবে; নতুবা সংসারের তুফানে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহার নিরাকরণ হইবে না আগম না মান তো, চিরকালই এইরূপ প্রতিক্ষণে নূতন নূতন বিশ্বাসভিত্তি গাঁথিবে, আর আপনিই ভাঙিবে। চিরজীবনই গড়া-ভাঙায় দিন যাইবে, কবে তাহার সেই স্নিগ্ধ ছায়ায় সুখে শান্তিলাভ করিবে? যতক্ষণ তোমার কষা-অঙ্কটী পাটীগণিতের প্রশ্নোত্তরের সহিত না মিলিবে ততক্ষণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া পুনঃ পুনঃ কষিবে, কোথায় তোমার ভুল হইয়াছে, অনুসন্ধান করিবে। তোমার উত্তরের সহিত পাটীগণিতের উত্তর না মিলিলে পাটীগণিতের প্রশ্নোত্তর ভুল স্থির কর, তো. এ জীবনে আর অঙ্ক কষা শিখিতে পারিবে না। যখন তুমি কৃতবিদ্য হইয়া ঐরূপ পাটীগণিত প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে, তখন স্থির কর, অমুক পাটীগণিতের অমুক প্রশ্নোত্তর ভুল বা সবই ভুল। নতুবা বৃথা গোলযোগ করিয়া সময় মাটী করিওনা। অঙ্কের ন্যায় স্বকৃত বিশ্বাসও আগমের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। যতক্ষণ না মেলে, ততক্ষণ আপনার বিশ্বাসই ভুল স্থির করা উচিত। কেন উচিত তাহার কৈফিয়ৎ এখন মুলতুবি থাকিল। আমার যেরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ লিখিলাম।

এখন একবার অনুমান করিয়া দেখ। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" কথাটী বড়ই সরল, সাধারণে বড়ই বিশ্বাস করিয়া থাকে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" পর্ব্বতে বহ্নি আছে; কেন না ধূমাৎ—ধূমহেতু। তাহার উপরও যদি পুনঃ 'কেন বল, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি। ঐ দেখ মহানসের (রান্নাঘর) উপর দিয়া ধূম উত্থিত হইতেছে, উহার ভিতরে গিয়া দেখ, বহ্নি আছে। ঐ দেখ, এঞ্জিনের চোঙ্ দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে, নিকটে গিয়া দেখ, উহাতে বহ্নি আছে।

দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার জ্ঞান হইবে—'যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি', এই জ্ঞানের নাম ব্যাপ্তিজ্ঞান। যদি উচ্চপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বহ্নি, আছে—কি—না আছে, ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে নাওপার, তথাপি "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এজ্ঞান অভ্রান্ত স্থির করিতে হইবে; কেননা যথা ধূম, তথা বহ্নি-এব্যাপ্তিজ্ঞানের কুত্রাপি ভঙ্গ দৃষ্ট হয় নাই। যদি স্থানান্তরে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভঙ্গ হয়, তবে সে ব্যভিচারি জ্ঞানকে অনুমানের কারণ স্বীকার করা যাইবে না।

স্থূল কথা, যে, পর্ব্বত লইয়া বিচার, সে পর্ব্বতে অগ্নি, আছে কি না—আছে, তাহা দেখিবার তত আবশ্যক নাই। সর্ব্বত্রই যদি দেখি, ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে, তখন, সে পর্ব্বতে অগ্নি না থাকিলেও অগ্নিসত্তা স্বীকার করিতে হইবে। তবেই দেখ শেষ 'কেনর' উত্তর অন্যত্র মহানসাদিতে এই কথাটী স্মরণ থাকা দরকার।

যেখানে অনুমান, সেখানেই এইরূপ একটী ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং মহানসাদির ন্যায় দৃষ্টান্ত স্থল থাকা আবশ্যক; দৃষ্টান্ত ও ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত অনুমান হয় না। পরকাল বা জন্মান্তর স্বীকার করা যাইতে পারে কিনা একবার অনুমান করিয়া দেখি? প্রথমেই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করি।

জন্মান্তর যে আদৌ স্বীকার করা হয় না, এমন নয়, তবে কেহ আপন আপন সময়ে স্বীকার করে না। আমাদের স্বভাব, পরের সময় লম্বাচৌড়া ব্যবস্থাপত্র লিখিতে বসি, আপনার সময়ে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা নমুনা দেখাইতেছি, 'মনের অগোচর পাপ নাই', মনে মনে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

সকলেই জানেন দুধ ক্রমে দধিরূপে পরিণত হয়। দধি হইতে মাখম উত্থিত হয়, মাখম গলাইয়া ঘৃত প্রস্তুত করা হয়। তবেই দেখ, এক দুগ্ধের কত জন্ম। দুগ্ধের পরপর তিন জন্ম দেখাইলাম। এখন পূর্ব্বজন্ম দেখাই—দুগ্ধ কখন স্বয়ম্ভূ নয়, অবশ্যই উহার পূর্ব্বাবস্থা আছে। গবাদির খাদ্যই উহার পূর্ব্বাবস্থা বা পূর্ব্বজন্ম। মনুষ্য কেবল পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ করে না; পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই প্রাক্তন জন্মের শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে। দেখ, দুগ্ধ পূর্ব্বজন্মের শুভ অনুবন্ধেই গব্যত্ব ও মাহিষত্ব গুণ প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বজন্মের অশুভকর্ম্ম-

বশেই রসুনত্ব প্রাপ্ত হয়। * এই গেল অচেতন পদার্থের কথা, এখন উদ্ভিদের কথা বলি।

ঐ যে ফলভরাবনত আম্রবৃক্ষ দেখা যাইতেছে, উহার জন্মান্তরের কথা অবধান কর। বীজ বা আঁটি উহার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্ম। ফল উহার পুত্র কন্যা। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"। আত্মা পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। মনুষ্যের পাপপুণ্যের প্রকাশ যেমন পুত্রে হয়, বৃক্ষের সেইরূপ ফলে হইয়া থাকে। এখন কাজের কথা বলি,—আম্রবৃক্ষ কখন চিরস্থায়ী নয়, উহার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং উহার জন্মান্তর হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভূমি কোপাইয়া ঘাস মার, অথবা মৃত্তিকা দগ্ধ কর; কিছু দিন পরে দেখিবে, যে ঘাস, সেই ঘাস—ঘাসের জন্মান্তর হইয়াছে। উদ্ভিদও জন্মান্তরের শুভাশুভ ভোগ করে। এই কারণেই ফল মিষ্ট বা অম্ল হয়। আমের বীজে যে আমের গাছ হয়, প্রারব্ধই তাহার প্রতি কারণ। যাক, যখন অচেতন ও উদ্ভিদের জন্মান্তর যুক্তিসঙ্গত হইল, তাহারাও পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ ফলভোগ করে, ইহাও বিশ্বাসের বিষয় হইল, তথা মনুষ্যের জন্মান্তর যুক্তি যুক্ত হইবে না কেন? মনুষ্য আত্ম-কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিবে না কেন?

পাঠক, মনুষ্যের জন্মান্তর যুক্তির অধীন কিনা, একবার দৃষ্টান্তের প্রসাদে এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানবলে অনুমান করিয়া দেখি না কেন? মনুষ্যো জন্মান্তরবান্ রূপবত্ত্বাৎ। মনুষ্যের জন্মান্তর আছে; কেন না রূপবত্ত্বাৎ † রূপহেতু—যেমন ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে, সেইরূপ রূপ থাকিলেই জন্মান্তর থাকিতে হয়। ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া যদি "কেন" কৈফিয়ৎ চাও তবে তাহার কৈফিয়ৎ অন্যত্র—ঘৃত, দুগ্ধ, বৃক্ষাদিতে। যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"। এস্থলে শেষ 'কেনর' উত্তর মহানস প্রভৃতি দৃষ্টান্ত

---

* সকলেই জানিতে পারিবেন, রসুনে ঘাস খাইলে দুধে 'রসুনে গন্ধ" হয়।

† রূপবত্ত্ব—এই হেতু সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তৃগণের অনুমোদিত নয়। সংস্কৃত গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ শূন্য হেতু অনেক আছে, গৌড়ীয় ভাষায় তাহা বিশদ করা কঠিন। অগত্যা আশুবোধের পক্ষে সুগম হইবে, বিবেচনায় স্বকপোলকল্পিত হেতু নির্দ্দিষ্ট করিলাম। ইহার উপর যে সকল আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, এ যাত্রায় তাহার খণ্ডন করা ঘটিবে না। পাঠক নিজগুণে ধৈর্য্য ধরিবেন।

স্থানে পাইয়াছ; সেইরূপ 'রূপ থাকিলে জন্মান্তর থাকিতে হয়' কেন? ইহার উত্তর দুগ্ধ স্থলে এবং বৃক্ষাদিস্থলে পাইবে। দুগ্ধ, বৃক্ষ, ঘট, পট—সব বস্তুরই রূপ আছে, অথচ জন্মান্তর হইতেছে। এই সকল দেখিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে, রূপ থাকিলে জন্ম হয়, রূপ থাকিলে রূপের বিপর্য্যয় হয়। প্রত্যভিজ্ঞান-কারণ-শূন্য রূপান্তরকে, জন্মান্তর বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাপ্তিবলে মনুষ্যের জন্মান্তরের অনুমান যুক্তি বিগর্হিত নয়।

ইহার উপর এক প্রবল পূর্ব্বপক্ষ উত্থিত হইতে পারে। যেরূপ দুগ্ধের এবং বৃক্ষাদির জন্মান্তর স্বীকার করি, সেইরূপ মনুষ্যের জন্মান্তর স্বীকার করা যাইতে পারে। এত বড় মোটা গোটা শরীরটার যে পূর্ব্বাবস্থা কিছুই নাই এবং অবশেষে যে কিছুতেই বিলীন হইবে না, ইহা কখন মনে ধারণা হয় না। সুতরাং ওরূপ সরল জন্মান্তর স্বীকার করা গেল; কিন্তু মনুষ্য যে আর জন্মে মনুষ্য বা অন্য প্রাণী ছিল এবং পর জন্মে মনুষ্য বা অন্য প্রাণী হইবে, তাহা কখন সবীজ যুক্তি বলে স্বীকার করা যায় না।

একটু প্রণিধান করিলে সমস্ত ভ্রম দূরীকৃত হইবে। যে জাতির জন্মান্তর স্বীকার করিবে, সে পূর্ব্বেও যে জাতি, পরেও সেই জাতি—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অচেতন শতজন্মেও অচেতনরূপে জন্মিবে। চেতন চেতনরূপেই জন্মান্তর লাভ করিবে। ইহার দৃষ্টান্ত যে দিকে দেখিবে, সে দিকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইবে। আমি দিক্ প্রদর্শন করিতেছি। ঘৃত বর্ত্তমান জন্মেও অচেতন। পূর্ব্বাপর জন্মেও সেই অচেতন। বৃক্ষ বর্ত্তমান অবস্থায়ও উদ্ভিদজীবী, বীজাবস্থায়ও সেই উদ্ভিদ-জীবী।—ইহার কথা বিপর্য্যয় ঘটে না। মনুষ্যও সেইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—তিন অবস্থাতেই, মনুষ্য বা প্রাণী। মৃত্তিকার কখন সুবর্ণ-চুর হয় না, সুবর্ণেও কখন মৃণ্ময় কলস হয় না "কারণগুণাঃ কার্য্য-গুণমারভন্তে" কারণগুণ অক্ষতভাবে কার্য্যে সংক্রান্ত হয়।

বলিতে পার, উদ্ভিদ পূর্ব্বজন্ম-বীজাবস্থাতেও উদ্ভিদ থাকে। অর্থাৎ উদ্ভিদ্ উদ্ভিদ হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু যখন উদ্ভিদ পচিয়া খসিয়া মৃত্তিকায় বিলীন হয় অথবা চুল্লীর উদরে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হয়, তখন আর উদ্ভিদের পরজন্ম অচেতন পদার্থ ব্যতীত উদ্ভিদ বা অন্য প্রাণী স্বীকার করা উচিত হয় না। অত-

এব যদি উদ্ভিদ্ জন্মান্তরে (মৃত্যুর পর) মাটী হইতে পারে, তবে ভৌতিক পদার্থে মনুষ্যজন্ম কেন স্বীকার করা যাইতে পারে না? কেনইবা মনুষ্য মৃত্যুর পর ভৌতিক অংশে বিলীন হইতে পায় না?

বৈদিকমতে মনুষ্যবৎ বৃক্ষেরও জীবন আছে। যে বস্তু বলে বৃক্ষ জীবিত থাকে, যে বস্তুর অভাবে বৃক্ষ শুষ্ককাষ্ঠরূপে পরিণত হয়, সেই বস্তুই বৃক্ষের জীবন বা তাহাই নিরুপাধিক বৃক্ষ। মনুষ্যদেহের ন্যায় কাষ্ঠ বৃক্ষের উপাধি ভূত, ভৌতিক পদার্থমাত্র। মনুষ্যজীবন ও বৃক্ষজীবন এক—মনুষ্যই শুভাশুভ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ বৃক্ষাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক দেহ যেমন পঞ্চভূতে বিলীন হয়, মনুষ্যের লিঙ্গাত্মা (যে টুকু মনুষ্য) শুভাশুভকর্ম্মবশতঃ ভোগলোকে গমন করে, সেইরূপ বৃক্ষের বৃক্ষত্ব মৃত্যুর পর স্থানান্তরে প্রস্থান করে। ভৌতিক কাষ্ঠমাত্র মাটী হয়। যাহা মাটী নয়, তাহা কি কখন মাটী হইতে পারে? যে বস্তু যাহা নয়, সে বস্তু কখন তাহা হইতে পারে না, ইহা চির সিদ্ধান্ত।

জন্মান্তর প্রত্যক্ষও হয়, কিন্তু এ চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা নয়। গুরুজ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা যে চক্ষুরুন্মীলিত করেন, সেই চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা দেখিবার জিনিষ তাহা কি কখন কথায় ঠিক বোঝান যায়? যায় না বলিয়াই এত বিড়ম্বনা।

জন্মান্তর সম্বন্ধে আগম প্রমাণ সাধারণে অবগত আছেন, সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আগম বিশ্বাস্য কিনা প্রস্তাবান্তরে সমর্থন করা যাইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য কি?

সময় বুঝিয়া কত লোকেই কত কথা বলিয়া থাকে। প্রতিবাসীর দুঃখ দেখিলে কত লোকেই বিজ্ঞ সাজিয়া কত উপদেশ দিয়া থাকেন; কত উপায় উদ্ভাবন করিয়া কত পন্থা নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু যে দুঃখী, যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত সে কাহার কথা শুনিবে? কোন পথে যাইলে তাহার দুঃখাবসান হইবে? আমরা এখন দুঃখী, মানুষের যত খানি দুর্দ্দশা হইতে,

পারে, আমাদের তাহা সকলি হইয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে আমরাই ত এক হতভাগা। আমাদের দুর্গতি দেখিয়া, আমাদের দীন দশা দেখিয়া, আমাদের যতনা দেখিয়া কতলোকে কত মতে শান্তনা করিয়া থাকেন, কত সৎ পরামর্শ দিয়া থাকেন, দুঃখ নিবারণের জন্য কত প্রণালী দেখাইয়া থাকেন, জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য সামাজিক, ব্যবহারিক ও নৈতিক দোষ দেখাইয়া সে সকলের সংশোধন করিতে বলেন। এখন আমরা করি কি? বিজেতা ইংরেজ যিনি ছলে, বলে, কৌশলে ভারতের অস্থি মজ্জা খাইয়া ফেলিতেছেন, দুবেলা যে দুগ্রাস অন্ন খাইব তাহারও উপায় রাখিতেছেন না, তিনিও নিজ ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া, নিজ সমাজের পারিপাট্য বুঝাইয়া আমাদের তদনুকরণে প্রবৃত্তি লওয়াইতেছেন, আশৈশব শিক্ষা দ্বারায়, অর্থের ও পদের প্রলোভন দেখাইয়া জাতিচ্যুত ও ধর্ম্মচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আবার সমাজের মধ্যে যাঁহারা আছেন, যাঁহারা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা কেহবা সংস্কারক হইয়া স্ত্রি পরিবারকে বাহির করিতে বলিতেছেন, নিরাকারের উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেছেন; সব একাকার করিয়া দিতেও বলিয়া থাকেন। রাজনীতিজ্ঞ ও কত উৎসাহ দিয়া, বিলাতী যোদ্ধাদের গুণগাণ করিয়া আমাদের "ভলণ্টিয়ার" হইতে বলিতেছেন। ধর্ম্মপ্রচারকগণও পূর্ব্বতন ঋষিগণের আদর্শ দেখাইয়া, তাঁহাদের ভক্তিমাখা উপদেশ শুনাইয়া ও তাঁহাদের দেবোপম চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদের সে কালের মতন হইতে বলিতেছেন। এ বিষম সংকটে আমাদের কর্ত্তব্য কি? যাহাদের দুমুঠা ভাতের সংস্থান নাই, লজ্জানিবারণের জন্য যাহাদের বস্ত্র পাওয়া কঠিন, বিশ্বব্রহ্মা'ণ্ড দুঃখের কথা বলিতে যাহাদের একটি ও আত্মীয় বন্ধু নাই, চিরকাল দারিদ্র্য দুঃখ পীড়নে যাহাদের বুদ্ধিভ্রংস হইয়াছে; এখন তাহারা কাহার পরামর্শ শুনিবে কোন পথে যাইবে? বাস্তবিক রোগ নিবারণের জন্য আমাদের যে, যে টোটকা ঔষধ সেবন করিতে বলিয়াছে এতদিন ত আমরা তাহাই করিয়াছি; কৈ কোন উপকারত হয় নাই? কি জানি যদি দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়া পড়ে, তাই একটু বিবেচনাকরিয়া দেখা উচিৎ আমাদের এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?

ভারতের অন্য খণ্ডের কথা বলিব না; আমাদের ক্ষুদ্র বাঙ্গালা দেশের ভীরু নিবাসীগণ কবে হইতে সামাজিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, কি

কারণেই বা হইলেন এবং কি উপায় করিলে হয়ত এ ব্যাধির উপসম হইতে পারে, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। অনেক দিন হইতেই বাঙ্গালী পরপদানত, মুসলমান শকাব্দার গোড়া হইতেই আমাদের রাজা। বিদেশী এতদিন হইতে প্রভু, আমাদের মতন বিজীত যে বিজেতার দুই একটা ব্যবহার গ্রহণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পাঁচশতবর্ষ মুষলমান রাজার পদতলে থাকিয়াও যে আমরা পুরা মুষলমান হইয়া যাই নাই, ইহা একটি, জাতীয় রহস্য। বরং সে সময়ে অমরা হিন্দু ছিলাম, জাতি, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার অটুট ছিল, এখন তাহাও নাই। তখন যে সকল মহামহোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, যে সকল ভক্তসাধক ও মহাত্মা বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন এখন তেমন লোক কৈ? এই অবস্থান্তরের প্রকৃত কারণ বুঝিতে হইলে ইংরেজ ও মুষলমানকে পাসাপাসী দাঁড় করাইয়া দেখিতে হইবে। ইংরাজের রাজনীতি ও মুষলমানের শাসন প্রণালীর আলোচনা করিতে হইবে।

মুষলমানবীর বক্তিয়ার খিলজী যখন প্রথম বাঙ্গালা আক্রমণ করে তখন মুষলমানেরা অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল। মহম্মদের তীব্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুষলমানেরা তখন ধর্ম্ম প্রচার, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি ও সুখ শান্তির জন্য দেশ আক্রমন করিত। তাহারা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি কোন নীতিই বুঝিত না; ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা তাহাদের তত ছিল না। দস্যুর ন্যায় দেশে দেশে আপতিত হইয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিতে তৎপর ছিল। তখন আবার ভারতবর্ষ সভ্যতার উচ্চসোপানে আরূঢ় ছিল, পৃথিবীর সকল জাতিকেই বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিতেন; হিন্দুর কাছে, মুষলমান জঙ্গ ও বর্ব্বর। কিন্তু দস্যুবিজেতা, জ্ঞানী বিজীত; তাই। বিজীতের কাছে আচার, ব্যবহার, সঙ্গীত, বিদ্যা, অশন, ভূষণ, রাজনীতি, অর্থ নীতি আদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিজেতা বিজীতের মন্ত্রশিষ্য হইলেন। হিন্দুর কাছে থাকিয়া মুষলমান সভ্য হইল, মানুষ হইল, সুতরাং মুষলমানকে খানিকটা হিন্দুয়ানীযুক্ত হইতে হইল। অতএব হিন্দুরও সমাজবন্ধন ও জাতি বন্ধন অক্ষুন্ন রহিল। মুষলমান হিন্দুকে জাতিচ্যুত (denationalize) করিতে পারিলেন না। এতদ্ব্যতীত হিন্দুর যে দৃঢ় স্থিতিশীলতা আছে যে স্বজাতিপ্রেম

আছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও ধর্ম্মের যে প্রকার সুন্দর ও সুদৃঢ় বাঁধুনি আছে, তাহাতে শীঘ্র ভ্রষ্ট করা সুকঠিণ। তাহার পর মুসলমান এই দেশকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, এদেশী রীতি নীতি অনুযায়ী রাজ্যশাসন করিতে প্রয়াস পাইত, তাহারা দেশের রাজা ছিল। সুতরাং মন্ত্রণার জন্য হিন্দুর উপর তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত; বিজীতের কাছে শিক্ষিত হইয়া বিজীতকে পূর্ণ বিশ্বাস করিতে জানিত। হিন্দু ও নিজেরটি বজায় রাখিয়া রাজ সেবায় তৎপর থাকিতেন। আমাদের জগৎসেঠ, আমাদের মোহনলাল, আমাদের সিতাব রায় রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন। তোডর মল্ল, মানসিংহ, যশোবন্ত সিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মুসলমানের এত বিশ্বাস, এত আস্থা, এত প্রীতি ছিল বলিয়াই হিন্দু এখনও কিছু কিছু হিন্দু আছে।

অপরদিকে দেখুন বণিকের জাতী ইংরাজ ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ব্যবসা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয়ের চক্ষে এখনও দোকানদার;—এখনও অনেকে বলে "কোম্পানী কা রাজ"। ব্যবসাদারের মত তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। কপাল গুণে তিনি আজ এ মহাপ্রদেশের একছত্রী সার্ব্বভৌম সম্রাট। তাঁহার ঘর আছে, বাড়ী আছে, বিদ্যা আছে, জ্ঞান আছে, আপনার বলিবার, ভাল বাসিবার সামগ্রী আছে; সভ্যসমাজের মধ্যে তিনি একজন। ভারতবর্ষ তাঁহার গৃহ নহে ভারতবাসীকে তিনি কখনও আপনার বলিয়া যত্ন করেন নাই। তিনি বুঝেন ভারতবর্ষ তাঁহার বাসস্থান নহে, ইহা একটি অধীন প্রদেশ (province); এখান হইতে যত পারেন, মুটে করিয়া, গাড়ী করিয়া, জাহাজ করিয়া অর্থ লইয়া যাইবেন; এবং তুষারাবৃত উষর ক্ষুদ্র দ্বীপকে স্বর্গোপম করিয়া তুলিবেন। তাহার কুটীল রাজনীতির মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করা দুঃসাধ। তিনি জানেন যে বিদেশে অজ্ঞাত কুলশীল জাতিকে চিরকাল অধীনে রাখিতে হইলে তাহাদের জাতিচ্যুত (denationalize) করা আবশ্যক, তাহাদের সমাজ বন্ধন ও ধর্ম্মবন্ধন শিথিল করিয়া ফেলা উচিত, তাহাদিগকে আগুহারা করা উচিত। তাই মোহময়ী শিক্ষার গুণে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি সন্দিগ্ধ ও ক্রুর, তাই পদে২ হিন্দু লাঞ্ছিত ও বিব্রত হইতেছে। তিনি বিদেশী উন্নত ও ক্ষমতা শালী, তাই আমাদের আহার ব্যবহার রীতি নীতি

কে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পাঁচশত বৎসর কেবল পরপদদলিত থাকায় আমাদের স্বতন্ত্রতা হীন হইয়া পড়িয়াছে; অনেকদিন কেবল বসিয়া থাকায় হাঁটু ধরিয়া গিয়াছে; আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। সুতরাং আমাদের অষ্টেপৃষ্ঠে রোগ চাপিয়া ধরিয়াছে। অবস্থাত এই।

রোগের কারণ ও অবস্থা বুঝাগেল; এখন যাহাতে ইহার মধ্যে দুই একটি উৎকট লক্ষণ উপশমিত হয় তাহার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা অবশ্যক। প্রথম লক্ষণ জাতীয়তার অভাব। নিজের বলিয়া আর হিন্দু সমাজ হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দু শাস্ত্রাদিতে টান নাই। নচেৎ উহাদের অন্যে গালি দিলে গায় লাগিত, হৃদয়ে ব্যথা বোধ হইত। বরং আমরা মায়াবীর মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুর আচার ব্যবহার, অশন বসনাদি—যে সকল জাতীয়তার লক্ষণ এবং যাহা না হইলে জাতীয়তা থাকেনা, যাহা আছে বলিয়া হিন্দু-হিন্দু বলিয়া জগতে প্রখ্যাত, সেই সকল সহজে ত্যাগ করিতেছি। এত বোকা হইয়াছি যে পুত্র পৌত্রাদিকে পুরা সাহেব করিবার জন্য, স্ত্রিকে বিলাতে পাঠাইতেছি, নিজে আধা ইংরাজি আধা বাঙ্গালা নাম গ্রহণ করিতেছি। যতদিন পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রতা না হয়, স্বাধীন না হওয়া যায়, ততদিন সমাজ সংস্কার করা অকর্ত্তব্য। কারণ সংস্কার করিতে গেলেই সমাজ বন্ধন একটু শিথীল হইয়া পড়িবে; বিদেশী রাজা এই অবসরে বিজীতকে জাতিচ্যুত ও ভ্রষ্ট করিতে সহজে পারিবেন। ঘটিয়াছে ও তাই; ব্রাহ্মসমাজের নব্যযুবক সংস্কারক মহাশয়েরা হটাৎ সমাজের মাথায় পদাঘাত করিয়া বিদেশী আচার, বিদেশী ব্যবহার অবলম্বন করিলেন; ক্ষত বিক্ষত পুরাতন সমাজের যেন অঙ্গ খসিয়া পড়িল, একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল, সমাজে যে সমবেত শক্তিপ্রভাবে আমরা বিজেতার বিজাতীকরণ (denationalising process) প্রণালীর বাধা দিতে পারিতাম, তাহা ছড়াইয়া পড়িল; বাঙ্গালী গৃহশূন্য, ধর্ম্মশূন্য, ব্যবহার শূন্য হইয়া অপর ভারতীয়ের চক্ষে ঘৃণিত অপদার্থ প্রতিপন্ন হইলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ রাজারামমোহন রায় একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই আদি সমাজ সামজিক প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করে নাই। আজ স্ত্রি পরিবারকে রেল গাড়ীতে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে কত কষ্ট ভোগকরিতে, কত সাহেব, বাবুর কুটিল কটাক্ষ সহ্য করিতে হয়, কত তীব্র হৃদয়ভেদী অপমান সহিতে হয়, আহাত সকলেরই জানা আছে। ইংরাজ বিদেশী, আমার স্ত্রি পরিবারের

সম্মান কি বুঝিবে, তাহার কটাক্ষ সহ্য করিলাম না হয়; কিন্তু নিজের ঘরের ছেলে, আত্মীয় স্বজনের কি দৃষ্টি পবিত্র হইয়াছে? বাবুরাইত নন্দ দুলালী ব্যাপার করিতেই অধিক উৎসাহী। তাই হিন্দুর আদরের জিনিষ ভালবাসার সামগ্রী, সুখে, দুঃখে একমাত্র সহায় গৃহলক্ষ্মী দেবীকে ঘরের ভিতরে—প্রাণের ভিতরে লুকাইয়া রাখা হয়। যাহার হৃদয় আছে, যাহার ভালবাসা আছে, যে তেজস্বী সে কখনই এ অবস্থায় অবরোধ প্রথা উঠাইবে না। বরং ক্ষত্রিয়ের মতন শক নির্ব্বাহ করিয়া মাতা ভগ্নি, স্ত্রি কন্যাদিকে হুতাসন মুখে প্রক্ষিপ্ত করা যায়, কিন্তু লম্পটের, বিদেশীয় মদোম্মত্ত বিজেতার লালসামাখা কুটিল কটাক্ষবাণ সহ্য হয় না। নব্য-শিক্ষিতযুবা ব্রাহ্ম একথা বুঝিয়াও, নিজে ভুগিয়াও, বুঝিলেন না, ছেলে মানুষের মতন তাড়াতাড়ী হুড়াহুড়ী করিয়া সমাজ অঙ্গে এমন অস্ত্রাঘাত করিলেন, যে বুঝিবা জাতীয় মৃত্যু বৈ ইহার আরোগ্যের অপর উপায় নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করাতে ও সংস্কারক মহাশয়রা বাঙ্গালী সমাজের সমূহ ক্ষতি করিয়াছেন। সমাজে একটা শৃংখলা ছিল। গরীবের দুই মুটা চাউল দশ দিন ধরিয়া খাইতে পারিতাম; কারণ যাহার যাহা নির্দ্ধারিত কার্য্য ছিল সে তাহাই করিত, অল্পবিস্তর যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিত তাহাতেই সুখী ও সন্তুষ্ট থাকিত। আমাদের আমিত্ব বজায় রাখিয়া বিজেতার পদ লেহন করা চলিত। তুমি বিলাতী সাম্য স্বাধীনতা আনিয়া সে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা ছিন্ন করিলে, সকলের হৃদয় একটা অদম্য আশা, আসিয়া জুড়িয়া বসিল; ছলে, কৌশলে, সকল প্রাকারেই একজন অপরকে চাপিয়া রাখিয়া নিজ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লইতে লাগিল,—যেখানে, একদিন একতা, শান্তি, সমবেদনা বিরাজ করিত, আজ সেই সমাজেই তোমার বুদ্ধিদোষে, তোমার শিক্ষার দোষে শূদ্র ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করিতে লাগিল, নীচ জাতি উচ্চের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমাদের সমাজ পোত এখন ঘুর্ণিজলে পড়িয়াছে, ঐ অদূরে কত মায়াবিণী অপ্সরা সকল অঙ্গভঙ্গি করিয়া আমাদের সেই দিকে লইয়া যাইতে চায়; দেখিও সাবধান! বালকের মতন বালির ঘর গড়িবার, ভাঙ্গিবার উড়াইবার কি এখন সময়? দরিদ্রের সেই পুরাণ সামগ্রী জোড়া তাড়া দিয়া যাহাতে আরও দিনকতক টিকিয়া যায় তাহা করিতে হইবে। এ রোগের ঔষধ নাই, সময়ের স্রোতে ছাড়িয়া দেও, যদি কপালগুণে শুভদিন

আইসে তবে ব্যারাম আরোগ্য হইবেই, কত চিকিৎসক তোমার সহায় হইবেন। এখন যাহাতে রোগীর প্রাণবায়ু উড়িয়া না যায় তাহারাই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আর একটা কথা; দরিদ্রের এতটা উদারতা ভাল নহে। যে যাহা বলিবে তাহাই করিব, যে যাহা ভিক্ষা চাহিবে, তাহাই তাহাকে, দিব, সর্ব্বস্বহীনের এরূপ কল্পতরু হওয়া বড় বিষম কথা। আর আমাদের আছেই বা কি? এক জাতীয়তা। যদি কিছু নিজের বলিয়া অহঙ্কার করিবার থাকে ত সে হিন্দুর আচার ব্যবহার, ধর্ম্মাশাস্ত্র ও রীতি নীতি। যাঁহায়া "উদারতা ২ করিয়া বলিয়া বেড়ান, আমরা তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি যে উদারতা দেখাইব কোথায়? হ্যাট কোট পরিলে যদি উদারতা হয় তবে সে উদারতা যেন বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া যায়। ধর্ম্ম মতের উপর আমরা কিছু বলিব না, যাহার যেমন বুদ্ধি সে তেমনিই করুক. শৈব হউক; বৈষ্ণব হউক, নিরাকারবাদী হউক তাহাতে তত দোষ নাই; কিন্তু যাহাতে সমাজের বন্ধন দৃঢ় থাকে, যাহাতে আমরা এমন শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি যদ্দ্বারা বিদেশী ব্যবহার সমাজে প্রবেশ না করিতে পারে, এক হইয়ামিলিয়া মিশিয়া যাহাতে থাকিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্লেচ্ছাচার যেন না প্রচলিত হয়, যাহা সমাজ প্রকৃতির বিরুদ্ধ, যাহা করিলে জাতীয় মৃত্যু (national death) হইবার সম্ভাবনা তাহা যেন না করিতে হয়। বুনিয়াদী ঘরের ছেলে বুনিয়াদী ব্যবহার ছাড়িব না।

৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ৩য় খণ্ড।

"মা"।

"কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।"

তুমি কে মা? এই বিষয়বাসনাপূর্ণ জ্বালাময় সংসারের একমাত্র দুঃখাপহারিণী মা, তুমি কে? মা, যখন নৈরাশ্যের অন্তস্তলে পড়িয়া থাকি তখন ঐ বদনভরা, প্রাণ জুড়ান মা নামে কেন শান্তি পাই? ও মধুমাখা নামের মাঝে কি শক্তি নিহিত করিয়াছ, যাহা ভাবিলে, যাহা ধ্যান করিলে যাহা দেখিলে, যাহা উচ্চারণ করিলে এত আশ্বাস পাই, প্রাণ যেন কতই সাহসভরে ফুলিয়া উঠে? কি মা? মনোমোহিনীর কোন্ সুধাভাণ্ড হইতে এ অমৃতরাশি জগতে ছড়াইয়া দিয়াছ? লোকে বলে গর্ভধারিণী নাড়ী ছেঁড়া ধনের উপর মায়া মাখাইয়া রাখিয়াছেন তাই 'মা' বলিলে সুখ পাই। ও-সব কথা বুঝি না, অত যুক্তি জানি না, মা তুমি, বালকের সকল যাতনা ঘুচাও কি না—আমার সকল আবদার রাখ কি না—জানি না। তবে রাখ না রাখ, তোমার কাছে সব বলিলে আমি পরিতৃপ্ত হই, তোমার কোলের ভিতর মাথা লুকাইয়া কাঁদিলে আমার দুঃখের লাঘব হয়। আমি ক্ষুদ্র জীব, আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা জড়াইয়া আমি কত টুকুই বা হইব, কেবল নামের গুণে এমুনি ছোট ২ আর

কতগুলির দুঃখাপনোদন কর। তোমার নিজ গুণে কিছু হয় কি না, তাহা ও জানিনা, তবে মা নামের গুণে হয় বটে; এমন নাম কোথা হইতে আনিলে মা? জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ আদি সকল চরাচরই মা নামে সুধা পায়, মা'র কথা শুনিলে আনন্দে গলিয়া পড়ে, মাকে না দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হয়। সর্ব্বানন্দ প্রদায়িনী সর্ব্বদুর্গতি নাশিনি, অভয়ে, বরদে মা তুমি কে?

সংসারের নানাবিধ ভাবনায় ও যাতনায় সংপিষ্ট হইলে, দুরাশার মোহমরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া ভগ্নচিত্ত হইলে মানুষ তখন একবার নিজ জনয়িত্রীর পাশে যাইতে চায়। এবং তাহাই চায় যাহা পাইলে ভাঙ্গা চুরা সব জোড়া লাগিয়া যায়, নৈরাশ্য প্রাতঃকালীন কুয়াষার ন্যায় কোথায় মিলাইয়া যায়। মা'র মাঝে কি আছে তাহা জানিনা, মা আমায় কি দিয়া থাকেন তাহারও কখন হিসাব লই নাই, তবে বুঝি মার কাছে সকল সামগ্রীই প্রার্থনা করিলে পাওয়া যায়, ভাবুক তাই ভাবরসে মত্ত হইয়া ভাবময়ী কে কত ভাবনা জানাইয়া থাকেন; অল্প বিস্তর, ছোট বড় বাহিরের ভিতরের সকল কথা গুলি বলিয়া থাকেন। কারণ, প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, মা, মা হইয়াও ভক্তের সকল টুকু কাড়িয়া লইবেন, তাহার (মা বৈ) নিজের বলিবার আর কিছু রাখিবেন না, যখন সে সর্ব্বসান্ত হইবে তখনই পাষাণী তাহাকে কোলে লইবে ও সকল দুঃখবিমোচন করিয়া আদর করিবে। তাই ভক্ত এক সময়ে বলিয়াছেন "আমায় ফিকীরে ফকীর বানায়ে ব'সে আছ রাজকুমারি?"

সাধক তুলসীদাস বলিয়াছেন,—"যহাঁ রাম তহাঁ ন কাম, যহাঁ কাম তহাঁ ন রাম।" যেখানে রাম সেখানে কামনা নাই, যেখানে কামনা আছে সেখানে রাম নাই। ভক্তের ভাবের বশে যখন ভগবান ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হইয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, তখন বিষয়বাসনা তথায় স্থান পায় না; হরিচন্দনের রসসৌরভে বিষ্ঠার পূতিগন্ধ দূরে যায়। ভগবৎ-প্রেম-সমাধিলাভ হইলে, মনের নাশ হয়; সাধক মাময় হইয়া ভাবমগ্ন থাকেন; সুতরাং যেখানে সে সেখানে কামনা থাকিবে কেন? মনুষ্য তাঁহাকে নানা কারণে ডাকিয়া থাকে। ভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যেঃ—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।

হে অর্জ্জুন পুণ্যবীজ থাকিলে, কেবল এই চতুর্ব্বিধ লোকই আমাকে (ঈশ্বর) ভজন করিয়া থাকেন। ১ম তস্কর, দস্যু, ব্যাঘ্র ও পীড়াদি দ্বারায় অভিভূত ব্যক্তি, ২য় ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ৩য় ধনকামী, ৪র্থ আত্মতত্ত্ববিৎ। ত্রিসংসারে যখন আর কাহারও কাছে আশ্বাস পাইল না, বিপদে পড়িয়া তখনই ভগবানের চরণে লুণ্ঠিত হয়, দারিদ্র্যদুঃখপীড়িতও যার কাছে গিয়া অর্থ যাচ্ঞা করে। এখন কথা এই নিজের সবটুকু না দিলে, ভালবাসা আকর্ষণ করা যায় না। ভগবৎপ্রেমে আকুলি বিকুলি করিয়া না ভাসিয়া গেলে তাঁহার সাক্ষাৎকার দুর্লভ। কারণ দুঃখী না হইলে ত তুমি তাঁহার কথা স্মরণ করিবে না, তাঁহাকে ডাকিবে না। সংসারের সামান্য কোন বিষয় প্রাপ্তির জন্য কত চেষ্টা করিতে হয়, কত মন প্রাণ ঢালিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়, অন্যের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে হইলে, তাহাতেও যেন ঢলিয়া পড়িতে হয়। যিনি কারণের কারণ অনাদিপুরুষ তাঁহাকে আমার ভাবের মত প্রেমময় ছবি করিয়া হৃদয়-বিহারী করিতে হইলে নিশিদিনই যে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, তাঁহার জন্য কাঁদিতে হইবে। আবার কত বিভীষিকা চক্ষের সম্মুখে আসিয়া ভয় দেখাইবে, কত মোহিনী মোহজাল বিস্তার করিয়া বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিবে। যখন অন্য বাসনার লেশ মাত্র থাকিবে না, তখন আব-দারের জোরে মা আমাকে কোলে লইবেন। আমি আর্ত্ত হই অর্থ-কামী হই, ধনং দেহি, পুত্রং দেহি বলিয়া যদি তাঁহাকে ডাকি, তবে আমার পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে, মা আমার সকল সাধ মিটাইবেন। মা'র কাছে যাইতে হইলে নগ্নদেহে দুইবাহু তুলিয়া মা' মা করিয়া যাইতে হইবে; মা'র প্রেমময় দৃষ্টিতে আমার অন্তর ও বাহির কঠিন অভেদ্য হইয়া পড়িবে, উহাতে সংসারের অগ্নি প্রবেশ করিতে পারিবে না। দুর্য্যোধন অহঙ্কারী মদোন্মত্ত ছিল তাই "মা" বলিয়া জ্ঞান ছিল না, গান্ধারীর কাছে নগ্ন দেহে যাইতে পারে নাই। তাই ভীমের গদাঘাতে" তাহার উরু ভগ্ন হইল।

"কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখন নয়"। আমরা কুপুত্র, নচেৎ মা'র'কাছে' সঙ্কোচ হয় কেন, সকল ভুলিয়া মা'কে মা বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না কেন? আমার গায়ে ধুলা থাকুক, কাদা থাকুক, মা'র' জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া মা বলিয়া ডাকিলে, তিনি সকল

কলুষরাশি বিধৌত করিয়া, কোলে তুলিয়া লয়েন। ভয় কি ভাই আমাদের? করুণাময়ীর উপর এত বিশ্বাস এত ভক্তি এত আস্থা যাহার নাই সে যেন প্রসূত হইয়াই মাতৃহীন হইয়াছে। অন্নপূর্ণা আমাদের সকল আশা পূর্ণ কবিবেন।

মা! তুমি শ্মশানবাসিনী, উলঙ্গিনী, মুক্তকেশী হইয়া কি কর? তুমি ভবভোগ উপরে দাঁড়াইয়া লোলরসনায়, করালবদনা! কি লেহন করিতেছ? উন্মাদিনি তুমি কে? এমন ভীমারূপে তুমি ভয়দেখাও কেন মা? তোমার পদনখে কতকোটী চন্দ্র তারা ডুবিয়া রহিয়াছে, অনন্ত নীলাম্বরে অসীম কেশগুচ্ছসকল এলাইয়া মিশাইয়া দিয়াছ মা তুমি কি ধ্বংস করিতে গিয়া আবার কাহাকে বরাভয় প্রদান করিতেছ; মহাকাল তোমার চরণতলে পতিত থাকিয়া শক্তি শূন্য হইয়া কেন নীরবে রহিয়াছেন; আবার তুমি তোমার বামচরণ তাঁহার বক্ষস্থলে রাখিয়া, দক্ষিণপদ জানুর উপরে রাখিয়া, কপালমালিনি এত খলখল হাঁসিতেছ কেন? মা আশ্রিত কিছু বুঝি না, তুমি কাহাকে ভয় দেখাও, কাহাকে বা অভয় দানকর তাহাত জানি না। তবে তোমার ভৈরব তাণ্ডবে, তোমার বিবসনা সংহারিনী বেশে সমস্ত সৃষ্টি কৌশল যেন স্তব্ধ, কুঞ্চিত ও বিলয়পর। আদ্যা শক্তি, ত্রিভুবন বিকাশিনি, মা তোমার প্রলয়ঙ্করী সাজ সম্বরণ কর। মা তুমি মা হইয়া এমন কেন?

সাধক প্রাণমন মিশাইয়া অনাদি কারণে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করেন, কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া মহাকালে মিশিয়া যাইতে চাহেন। গুণময়ী অনন্ত সৃষ্টি-প্রকৃতির ভিতর এমন কত শক্তি কত স্থানে নিহিত আছে, যদ্দারা মনুষ্যেরকাঙ্ক্ষিত সকল বিষয় প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়। "মা" সেই অন্তর্নিহিত শক্তি নিচয়ের অভ্যন্তরপ্রবাহিণী আদ্যা শক্তি। যিনি সাধক তিনি বুঝেন "মা" বলিলে অধ্যাত্মজগতে কি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। "মা" সিদ্ধ শব্দ, ভাব থাকুক, অথবা নাই থাকুক, উহার উচ্চারণে সকল তন্ত্রী বিকম্পিত এবং ছিন্নও হয়। মা বর্ণাত্মিকা, বর্ণমালার কণ্ঠমালা করিয়া স্বাধিষ্ঠানের মহাশ্মশানে চৈতন্য আধার করিয়া কত নৃত্যই করিতেছেন। শ্যামা জীবন প্রহেলিকা বুঝেন তাই সর্ব্বারূঢ়া।

কোন কবি বলিয়াছেন এবং স্বতন্ত্র একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মা দশমহাবিদ্যা রূপে সভ্যতার উচ্চ সোপান পর্য্যন্ত মানুষের সামাজিক

দশাবস্থা বুঝাইয়াছেন। কবিকল্পনায় সব হইতে পারে, ভাবুকের ভাবাবেশে মা আমার সর্ব্বরূপিণী। কিন্তু জানা উচিত দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি সকল সাধ্যা, আরাধ্যা, গোপ্যা, দীপ্তিময়ী, শক্তি স্বরূপিনী। যিনি সাধক তিনি জানেন, ভাবের বশে অনেক কথা মিলান যায়, কিন্তু সাধনার তীব্র তেজ প্রভাবে আত্মশক্তি কত রূপে বিকশিত হয়, প্রবৃত্তির কত শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া সর্ব্ব বিদ্যাস্বরূপিনী, সর্ব্বানন্দদায়িনী, সর্ব্বহৃদ্‌বিহারিনী দশ দিক আলো করিয়া জুড়িয়া বসেন? মা আমার কল্পনা নহেন, মা আমার বাহিরের শক্তি নহেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক ধৃত সর্ব্বাধার সিংহাসনের উপর, সদাশিবের নাভি কমলের উপর বসিয়া রাজ রাজেশ্বরী মা আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিভূতি মাখিয়া সর্ব্বেশ্বরী হইয়াছেন। তুমি কল্পনা জাল বিস্তার করিয়া কবিত্বের মাধুরী ছটা মিশাইয়া পাশ্চাত্য সমাজ নীতির দশাবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা করিলে। শ্মশানবাসিনী সর্ব্বসংহারিণী কালীকে হামসাহের সমাজের কাড়াকাড়ি মারামারীর অবস্থাতে বুঝাইলে; ভৈরবী রূপে সভ্যতার উচ্চসীমা দেখাইলে, কমলারূপে তোমার খেয়ালের সর্ব্বোচ্চসোপাণের সমাজে দাঁড় করাইলে। ধন্য তোমার কল্পনা, ধন্য তোমার সাহস। যদি সাধন-জগতেয় আগম নিগমের কথা বুঝিতে, যদি বুঝিতে আত্ম শক্তির প্রভাবে আদ্যাশক্তি কত জীবন্ত রূপে সাধকের প্রাণ জুড়াইয়া, সাধ মিটাইয়া দেন, যদি আমার মা'র ছেলে হইয়া, মা'র কোলে বসিয়া, মা'র আদর খাইতে জানিতে, তাহা হইলে তোমার পাশ্চাত্য শিক্ষা সংতপ্ত মস্তিষ্ক হইতে এমন অমানুষী কল্পনা রাশি উদ্ভূত হইত না। মা আমার কি তাহা জানি না তবে তিনি আদ্যা শক্তি শিবপ্রসূতি। এই অসীম ভৈরবী চক্রের আবর্ত্তনবেগে কিছুইত দেখা যায় না, তবে দেখিলে দেখিবে সর্ব্বযোনিবিহারিণী শতদল কমলবৎ ফুটিয়া রহিয়াছেন। সাধক রাম প্রসাদ অনন্তশক্তিময়ী আদ্যাশক্তিতে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বকে ডুবাইয়া দিবার জন্যই যেন মাকে খাইতে চাহিয়াছিলেন, কেননা তিনি গণ্ডে জন্মিয়াছেন। তোমায় খাইলে, পাগলি, আমি যাই কোথায়? বলত উম্মাদিনি, আমি তোমায় খাইব, না তুমি আমায় খাইবে। মা আবার জিজ্ঞাসা করি তুমি কে?

উপনিষৎ।

অনেকেই আমাদের প্রচারিত উপনিষদের কিরূপ অনুবাদ হইতেছে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে ঈশোপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রকটন করিলাম।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥ ১॥

এই জগতে যে কিছুমাত্র বস্তু আছে, সেই সমুদয় বস্তুই অন্তরে ও বাহিরে ঈশ্বর দ্বারা অনুবিদ্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতীয় বস্তু-মাত্রেই শক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন, ইহা স্থির জানিবে। "আমি করিতেছি" ইত্যাদি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহা ভোগ করিবে। কাহারও দ্রব্যের প্রতি লোভ করিবে না॥ ১॥

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২॥

যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ আত্মবোধ না জন্মে, সে পর্য্যন্ত মনুষ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অবশ্যই করিবে এবং তদ্দ্বারা দীর্ঘজীবী হইবে, উক্ত শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম ছাড়িয়া এমন কিছু প্রকার নাই, যে, যাহা করিলে অশুভ কর্ম্ম-ফলে লিপ্ত হইতে হয় না॥ ২॥

অসূর্য্যা নাম তে লোকা-অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥ ৩॥

যাহারা ইহ জন্মে আত্মজ্ঞান ও তৎকারণ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম লাভ না করিয়া মৃত হয়, তাহারা অজ্ঞান রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অসূর্য্য নামক লোকে গমন করে. অর্থাৎ তাহারা অজ্ঞানী কীটাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে ৩॥

অনেজদেকম্পনসোজবীয়োনৈনদ্দেবা-আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি॥৪॥

সেই পরমাত্মা নিস্পন্দ, ও সর্ব্বদা একরূপ (অবস্থান্তর বিহীন) হইয়াও মন হইতে দ্রুতগামী; অতএব মনাদি ইন্দ্রিয়গণের অগ্রগামী। তাঁহাতে

ইন্দ্রিয়গণত ধরিতে পারে না। প্রত্যুত ধাবিত ইন্দ্রিয়গণকে তিনি অতিক্রম করিয়া যান। সেই একমাত্র আত্মার সত্তামাত্র আছে বলিয়াই বায়ু নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে পারিতেছে॥ ৪॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫॥

তিনি স্পন্দিত হন, আবার স্বরূপতঃ তিনি স্পন্দিত হন না, যাহার পর দূর নাই, তিনি তত দূরে আছেন, যাহার পর নিকট নাই, তিনি সেই নিকটে হাতের উপরে আছেন, তিনি সকলের অন্তরে আছেন, এবং তিনি সকলের বাহিরেও আছেন॥ ৫॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানস্ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬॥

যে মুমুক্ষু পবিত্র ও অপবিত্র সকল বস্তুকে আত্মবৎ অনুভব করেন এবং আপনাকে সেই পবিত্র ও অপবিত্র নিখিল বস্তুতে দেখেন, তাঁহার আর কোন বস্তুতেই ঘৃণা হয় না॥ ৬॥

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভুতান্যাত্মৈবাভুদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক-একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭॥

এক আত্মাই এই দৃশ্য বস্তুরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন" এইরূপ জ্ঞান যখন একত্বরূপে নিশ্চিৎ হয়, তখন তাহার মোহইবা কি? শোকইবা কি?—শোক ও মোহত অজ্ঞানেরই কার্য্য॥ ৭॥

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮॥

সেই আত্মা আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, দীপ্তিমান্, তাঁহার বুদ্ধ্যাদির সমষ্টি লিঙ্গ শরীর নাই, তিনি অক্ষত, তাঁহার স্নায়ুজাল জড়িত স্থূল শরীর ও নাই, তিনি নির্ম্মল, তাঁহাকে ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি কর্ম্মে স্পর্শ করে না, তিনি নিরন্তর সকলই দেখিতেছেন ও জানিতেছেন ও তিনি মনের নিয়ন্তা ঈশ্বর, তিনি অখিলের উপরিস্থিত, তিনি দৃশ্য জগৎরূপে স্বয়ংই উৎপন্ন

হইয়াছেন, তিনি সমুচিতরূপে প্রজাগণের নিমিত্ত আবশ্যকীয় পদার্থ উৎপাদন করিয়াছেন॥ ৮॥

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততোভুয়-ইব তে তমো-য-উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥

যাহারা চিত্তকে অজ্ঞানের দিকে অগ্রসর না করিয়া, চিরদিন কেবল যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপই মুখ্য কর্ত্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করে, তাহারা আপেক্ষিক অজ্ঞানাবৃত পিতৃলোকে গমন করে, আর যাহারা কেবল ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনায় রত থাকে তাহারা, পিতৃলোকাপেক্ষায়ও হিংসাদি দোষে দূষিত তমাচ্ছন্ন দেবলোকে গমন করে॥ ৯॥

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০॥

দেবতা জ্ঞানে দেবলোক প্রাপ্তি ও কর্ম্ম জ্ঞানে পিতৃলোকপ্রাপ্তি এরূপ বিভিন্ন কারণের বিভিন্ন ফল লাভ হয়, এই কথা সেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেষ্টা অচার্য্যগণের নিকট আমরা শুনিয়াছি॥ ১০॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ১১॥

দেবতা জ্ঞান ও যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপ এতদুভয়ই এক পুরুষেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এরূপ যাহারা বিবেচনা করিয়া দুইয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান ফলে স্বভাবিক কর্ম্ম ও স্বভাবিক জ্ঞান অতিক্রম করিয়া দেবতা জ্ঞান দ্বারা দেবত্ব লাভ করে॥ ১১॥

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো-ভুয়-ইব তে তমো-য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২॥

যাহারা মলিন সত্ত্ব প্রধানা সকাম কর্ম্ম প্রবর্ত্তিকা প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা তদনুরূপ অজ্ঞানাবৃত হয়, আর যাহারা সেই প্রকৃতিকে ছাড়িয়া কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদিতে অনুরক্ত হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত সমধিক অজ্ঞানাচ্ছন্ন স্থানে প্রবেশ করে॥ ১২॥

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

সর্ব্ব কর্ম্মের কারণরূপা ঐশী শক্তির উপাসনায় পুনর্জ্জন্মের কারণীভূত প্রকৃতিতে লয়, ও কর্ম্মব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনায় তাহাদের অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, এই দ্বিবিধ উপাসনা দ্বিবিধ ফল আমরা সেই ধীমান্ আচার্য্যাদের মুখে শুনিয়াছি ॥ ১৩ ॥

সম্ভূতঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুন্তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

ঐশী শক্তির আশ্রয় ও কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির আশ্রয় করা এক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য ইহা যাহারা মনে করে, তাহারা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনায় অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য, অজ্ঞান ও অধর্ম্মাদিকে অতিক্রম করিয়া ঐশী শক্তির উপাসনা প্রভাবে বিদেহ কৈবল্য সম প্রকৃতিতে অমৃত সুখ ভোগ করে ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

হে সূর্য্য? তোমার মণ্ডল যাহার তেজে তেজস্বী সেই সত্যময় পুরুষের দ্বার তোমার জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, অতএব তাঁহার দর্শনার্থ ও সত্য ধর্ম্মলাভার্থ সেই আবরণ অপসৃত কর ॥ ১৫ ॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন সমূহ।
তেজোযত্তে রূপঙ্কল্যাণতমন্তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ
পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

হে প্রজাপতিতনয়! তুমি জগতের পোষণ কর বিধায় পূষা, তুমি একক গমন কর বিধায় এক গতি, তুমি সকলকে সংযত কর বিধায় যম, তুমি রশ্মি প্রাণ ও রসের গ্রহণ কর বিধায় সূর্য্য! তোমাতে সমগ্র রশ্মি সংবরণ কর ও তেজ একত্রিত কর, আমি তোমার প্রসাদাৎ সেই কল্যাণময় রূপ দর্শন করি, তোমার সম্বন্ধে যিনি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তভূত পুরুষ, তিনিই অন্তর্জ্জগতে আমি ॥ ১৬ ॥

বায়ুরনিলমমৃত-মর্থেদন্তম্মাস্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতংস্মর ॥ ১৭ ॥

মরণান্তে আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া, বায়ুতে মিলিত হউক, এই শরীর অনলে অর্পিত হইয়া ভস্ম হউক। হে মন! এতদিন যে যে কর্ম্ম আমি করিয়াছি তাহাই স্মরণ কর, তাহাই স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনোভুয়িষ্ঠান্তে নম-উক্তিম্বিধেম ॥ ১৮ ॥

হে অগ্নে! কর্ম্ম ফলভোগার্থে আমাদিগকে আলোকদান সৎপথে লইয়া যাও, হে দেব! আমাদের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মই তুমি দেখিয়াছ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ কেবল নমস্কার করিতেছি. তুমি আমাদের মলিন পাপকে নষ্ট কর ॥ ১৮ ॥

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর কুলাইয়াছে সেইরূপ আমরা অনুবাদ করিয়াছি বিচারের ভার পাঠকের উপর।

দূরবন্ধুর্গতোঽহম্ * ।

কালিদাসের যক্ষ, রামগিরির আশ্রমে প্রিয়া বিরহে কাতর হইয়া, গতিশীল মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিলেন দূরবন্ধুর্গতোঽহম্। তুমি আমি কতবার এই সৌধশঙ্কুল মহানগরীতে দাঁড়াইয়া বলিয়া থাকি " দূরবন্ধুর্গতোঽহম্ "। আবার গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ বিরহে কাতরা হইয়া দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হয়ত কতবার বলিয়াছেন "দূরবন্ধুর্গতোয়ম্"। মানুষের হৃদয়ে যেন এইরূপ একটা ভাব সর্ব্বদাই জাগরুক রহিয়াছে। যেন কোথাও বন্ধু আছে, যেন অনেক দূরে কে আমায় আনিয়াছে, যেন এই সমস্ত মনুষ্য, এই সমস্ত প্রাণী, কেহ আমার নয়, কেহ আমায় বন্ধু

* 'দূর বন্ধুর্গ তোহং' অহং শব্দের বিশেষ, করিয়া প্রযোগ করা হইয়াছে মেঘ দূতে এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বৈয়াকরণ মহাশয়গন ক্ষমা করিবেন।

বলেনা, যেন কখন সেথায় ফিরিতে পারিব না, তাই মনের আক্ষেপে বলিয়া উঠি "দূরবন্ধুর্গতোঽহম্"। সেখানে গিয়া সে বন্ধুকে বুঝি দেখিতে পাইব না মনের সাধে তাহায় কখন সাজাইতে পাইব না। এখানে যাহাদের সহিত প্রমোদ মদিরা পানে উন্মত্ত হই, যাহাদের নিগ্রহে সেই দূরবন্ধুর কথা বিস্মৃত হই, যাহাদিগকে বন্ধু ভাবিয়া অকপটে প্রাণ খুলিয়া কথা কই, যেন সেই বাক্যালাপকালে এক একবার অন্তর ভেদ করিয়া কথা উঠে "দূরবন্ধুর্গতোঽহম্"। তখন কি এক দৃশ্য মানসচক্ষে যেন ভাসিয়া উঠে, আমি সেই পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিতে পারি না। কার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া উঠি।

একদিন নিকটে ছিলাম, একদিন তাহার মূরলি ধ্বনি শুনিয়াছি প্রাণ ভরিয়া প্রাণের সখা বলিয়া ডাকিয়াছি, বাল্যকালে, অনন্ত জলধিতীরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার অনন্তাকীর্ণ, অনন্ত বিক্ষিপ্ত অনন্ত পরিব্যাপ্ত মধুর সংগীত কতবার হৃদয়ে শব্দিত হইতে শুনিয়াছি এখন যেনকে আমায় লোভ দেখাইয়া, কে আমার প্রতারণা করিয়া, কে আমায় প্রমোদ মদিরা পান করাইয়া, মায়া মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া, কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে, আমি সে মনমুগ্ধকারী বংশিধ্বনি আর শুনিতে পাইনা, সে গীত আর কর্ণে প্রবেশ করে না, সে অনন্তাকীর্ণ অনন্তপরিব্যাপ্ত ধ্বনি যেন পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় না, আর যেন সেই মুরলিধ্বনির মধুর নিনাদে হৃদয় মন অন্তরাত্মা আমূল কম্পিত হইয়া উঠে না, যেন আর কি আসিয়া হৃদয় কে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, যেন কাহারও কোন কৃত্রিম গৃহে আমি আবদ্ধ, যেন কৃত্রিম রূপ রস গন্ধ, স্পর্শ শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু আমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না।

কিন্তু যে ধ্বনি হৃদয়ে হৃদয়ে মাখা, যাহার বাক্য প্রাণে প্রাণে জড়িত, যাহার স্নেহ যাহার ভালবাসা অভাব্য, অবর্ণনীয় যাহার অনুভূতি সুখের উপরে ও কি যেন একটু সম্ভোগ করাইয়া দেয়, এত কৃত্রিমতার মধ্যে থাকিয়াও, সেই শব্দ যেন অন্তর ভেদ করিয়া, যেন সেই অনোরনীয়ান্ প্রদেশ হইতে স্থূলকর্ণে শব্দিত হয়, তখন বলিয়া উঠি "দূরবন্ধুর্গতোঽহম্"। কোথায় সেই বন্ধু, কোথায় সেই অনন্ত প্রেম, কোথায় সেই আনন্দ এখানকার সমস্তই যেন আমার চক্ষে বিদ্ধ হইতেছে, আমার কর্ণে বিকটধ্বনি করিতেছে, আমার হৃদয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে,

হায় কোথায় সেই বন্ধু, কে আমায় এত বন্ধন করিয়া তাহার কাছে যাইতে দিতেছে না, হায়! কেন আজি দূরবন্ধুর্গতোঽহম্ হইলাম। এখানে যাহাদের সঙ্গে আমি আলাপ করিতেছি, তাহারা ত আমার পরিচিত নহে, ইহাদের ত আমি কখন দেখি নাই, ইহারা আমায় কেন এরূপ করিতেছে? ইহাতে ইহাদের কি স্বার্থ আছে, ইহাদের কৃত্রিম প্রণয়ে যে আমি ব্যথিত, ইহাদের কপট সৌজন্যে যে আমি ভীত, এখানে আমার সে বন্ধুত নাই। তেমন হাসি কাহারও মুখেত দেখিতে পাই না, তেমন সারল্য পূর্ণ দৃষ্টিত কাহারও নাই, তেমন সুমিষ্ট বাক্যত কাহারও পাইনা তেমন আদর করিয়াত কেহ ডাকিতে জানে না, তেমন করিয়াত কেহ কাছে বসেনা, তেমন রূপত কাহারও নাই; ইহাদের আকার ইঙ্গিতে আমার ভয় হইয়াছে, ইহাদের হাব ভাবে আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, ইহাদের কি যেন কু অভিসন্ধি আছে, ইহারা যেন আমার কিছু করিবার জন্য এমন করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের কি এক ঘোর স্বার্থ আছে, এখানে আমার সে বন্ধু নাই, আমি এখানে থাকিব না, হায়! আজি দূরবন্ধুর্গতোঽহম্।

হায় ইহাদের কি কুহক। দূরশ্রুত সরল পক্ষীর সারল্য সংগীতে যখন আমার মন চঞ্চল হয়, নূতন মেঘের ধ্বনি শুনিয়া যখন আমি নিস্তব্ধ হই, শ্যাম সন্ধ্যা সময়ে, সুনীল আকাশ পটে অগন্য তারারাজির উদয়াস্ত দেখিয়া যখন আমি গম্ভীর হই, মেঘমালার সহিত তড়িত লতার ক্রীড়া দেখিয়া যখন আমি ব্যাকুল হই, তখন ইহারা আমার সে ভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করে; ইহারা কি কপটী। তখন ইহারা যেন ভীত হইয়া, নানারূপ গান বাদ্য রহস্য করিয়া আমায় ভুলাইতে চায়। আমি কতবার এইরূপে ভুলিয়া, সেই বন্ধুকে ভুলিয়া যাই। কিন্তু আমার সেই বন্ধুর প্রণয়? হায় আর কি তাহা পাইব? সে আমায় চিন্তা করে সে আমার কথা ভাবিয়া থাকে, আমি মনে মনে অনুভব করি সে আমায় ডাকিতেছে, হায় সে কত ভাল। আমি তাহার সব ভুলিয়া যখন এই অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকি, তখন সময়ে সময়ে হঠাৎ যেন সেই দূরবন্ধুর দৃশ্য বিদ্যুতের মত দেখা দিতে দিতে আমার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যায়, সে যখন আমায় ডাকে, কোটি কোটি যোজন অন্তরে থাকিয়াও আমি মনে মনে তাহার সুমিষ্ট, সোহাগপূর্ণ

বাদ্য যেন সুস্পষ্ট শুনিতে পাই। হায় এখানকার লোকে আমার কি অকৃতজ্ঞ করিয়াছে। আমি এখানে থাকিবনা। আজি দূরবন্ধুর্গত আমি তাহার কাছে যাইব।

কিন্তু সে যে অতি দূর দেশ। আমি একাকী কিরূপে যাইব? আমার সঙ্গে কি কেহ যাইবে না? এখানে অনেকে যে আমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, অনেকে যে আমায় বলিয়া থাকে, তাহারা আমায় বড় ভালবাসে। কৈ কেহত যাইতে চায় না। আমি একাকী যাত্রা করিব।

কত নদী, কত পর্ব্বত, কত দেশ, কত উপদেশ পশ্চাৎ করিয়া আসিলাম কিন্তু কোথায় সে? সে যে আমার ডাকিয়াছিল, সে যে আমায় স্মরণ করিয়াছিল—আমি অকৃতজ্ঞ, আমি প্রতারিত—আমি এখানে নরকপ্রায় স্থানে থাকি—কিন্তু তথাপি তাহার জন্য প্রাণ অস্থির হইত, মন চঞ্চল হইত, সে যে তখন আমায় ডাকিয়া ছিল, তবে সে কোথায় তাহার দ্বারে এত প্রহরী কেন? দ্বারী ত দ্বার ছাড়ে না? কেহ যে আমায় দেখিতে দেয় না? তাহার নাম করিলাম, তাহার পরিচয় দিলাম, কৈ তথাপিত দেখিতে দেয় না। আমার পরিচয় দিলাম—ইহারা যে আমার চেনেনা—তাহার নাম করিলেও যে আমায় ইহারা তাড়াইয়া দেয়। সে যে আমায় কত ভাল বাসে, ইহারা কি তাহা জানেনা? এত মিনতি করিতেছি, এত কাতরোক্তি করিতেছি, হায়! ইহারাত কর্ণপাত ও করে না। হায় এখানে কেন আসিলাম। হায় এখানেও বন্ধু দূরগত।

সাধু দর্শন।

মন্মনাভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে (নবম অধ্যায়ে) আত্ম স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা মন্মনা—ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া অবস্থিতি কর, মদ্ভক্ত হও, বিষয়ানুরাগ সকল গুটাইয়া লইয়া

আমাতেই সেই সর্ব্বানুরাগ নিবেশিত কর, মদ্‌যাজী হও অর্থাৎ আমার পূজা পরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া সমাহিত হইতে হইতেই আমাকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কারণ,—ভগবানই বলিতেছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধভাবসমন্বিতাম্॥
মচ্চিত্তামদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

পণ্ডিতগণ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-চৈতন্য-মাত্র স্বরূপ আমিই, যে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতেই যে এই ব্রহ্মাণ্ড সকল রক্ষিত, পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট হইতেছে, এইরূপ জানিয়া পরমার্থ তত্ত্বে অভিনিবেশ পূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করেন। তাঁহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গত প্রাণ হইয়া পরস্পরে আমারই, তত্ত্বালাপ করিয়া এবং পরস্পরকে বুঝা-ইয়া দিয়া অধিকতর আনন্দিত এবং আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপে ভগবদ্ভক্তগণ যোগযুক্ত হইয়া নিষ্কাম ভক্তি সহকারে ভগ-বানের আরাধনা করিতে করিতে অবশেষে যখন বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাঁহারা—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত কখনই বিফল মনোরথ হন না। তাহাই ভগবান্ আশ্বাস বাক্যে বলিয়াছেন, "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি"। অনুরাগী ভক্তের উপর দয়াময় হরির অমৃত মাখা হস্ত সর্ব্বদা প্রসারিত। তাহাই ভক্ত সমস্ত সহ্য করিতে পারে, কিন্তু হরি-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। হরি-প্রেম-মদোন্মত্ত ভক্তগণ সর্ব্বদাই অনন্য চিত্ত হইয়া, সংসারারণ্যে বিচরণ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"স উভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব যদত্র কিঞ্চিৎ করোতি অনন্যাগতস্তেন ভবতি"। তিনি একদাই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ উভয়ে সমভাবে বিচরণ করিতেছেন। সর্ব্বদাই যেন অন্তরে অন্তরে কোন নিগূঢ় তত্ত্বে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, অথচ বহির্দ্দিকেও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলিতেছে। তিনি বাহিরে সমস্তই কার্য্যই করেন বটে, কিন্তু কোন

কার্য্যের সহিতই তাঁহার আসক্তির লেশমাত্রও নাই। সুতরাং ভক্তের অবস্থা অলৌকিক। সেই জন্যই আমাদের ন্যায় সাধারণ মনুষ্য লৌকিক দৃষ্টিতে ভক্তসাধু চিনিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই ভক্ত সহ-বাসের যে অনুপম ফল তাহাতে সর্ব্বদাই বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহার উপর ভণ্ডের দৌরাত্ম্যে আমাদের আরও "দিশা হারা" করিয়াছে।

এই বিশ্ব রাজ্যের, দুইটি স্তর আছে। একটি স্তর সাধারণ মনুষ্য-গণের, অপরটি ভগবদ্ভক্তগণের। প্রথম স্তরটি একবারে অতিক্রম না করিলে দ্বিতীয় স্তরের সংবাদ পাওয়া একবারেই অসম্ভব। অথচ আমরা প্রথম স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া সাধারণ মনুষ্যের অগম্য দ্বিতীয় স্তরের সংবাদ লইতে ব্যস্ত হই। সেই জন্যই আশা চরিতার্থ হয় না। স্থান মাহাত্ম্যে স্তরদ্বয়ের ন্যূনাধিক্যতা জন্মে। প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান সমূহে দ্বিতীয় স্তরেরই অধিক বিকাশ। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য ভক্ত রাজ্যের বহুদূরে থাকিয়া দুর্ল্ভ্য আশা মিটাইতে চাহে, কাজেই সর্ব্বদা বিফল প্রযত্ন হয়।

মা আনন্দময়ীর আনন্দকানন কাশীধামের প্রতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচন করিলে, আমাদের সিদ্ধান্তিত বিষয়ের সত্যতা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সাধারণ দৃষ্টিতে কাশী অতি নরকসদৃশ স্থান। এমন ভীষণ পাপ নাই যাহা কাশী ক্ষেত্রে অবাধে সংসাধিত না হয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের কুলাঙ্গার, নরাধম, পাপের অবতারদিগেরই আশ্রয় স্থান,—পুণ্যভূমি কাশীধাম। সুতরাং স্থূলদর্শী অনুসন্ধিৎসুর নিকট কাশী সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। কিন্তু ইহা ছাড়া বারাণশীক্ষেত্রের আর একটি স্তর আছে। সেটি আমাদের কথিত, দ্বিতীয় স্তর,—ভগদ্ভক্তের রাজ্য। দেবতার বাঞ্ছনীয় আনন্দকানন তথায় সাধারণ মনুষ্যের প্রবেশা-ধিকার নাই। সেখানে ব্রহ্মময়ীর নিত্যলীলা। ইন্দ্রের পারিজাতপুষ্পে যত না শোভা, যত না সৌরভ, আনন্দকাননে একএকটি পুষ্পে তাহার সহস্র গুণ শোভা ও সৌরভ চারিদিকে বিকীরণ করিতেছে। আমরা অন্ধ হইয়া তথায় গমন করি, সুতরাং প্রকৃত দৃশ্য যাহা তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তীর্থ ভ্রমণও আমাদের ফলদায়ক হয় না। পারলৌকিক কোন উন্নতিই হয় না। লাভের মধ্যে পথশ্রমে ও অর্থব্যয়ে কৃশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি। একটি সাধুদর্শনও ভাগ্যে ঘটে না। মায়ের ভক্তরাজ্যের একটি ভক্তেরও দর্শন পাইলে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ

জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সমস্তই তাঁহারই অতুল রূপ সাগরে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আর বিষ-পরিপূর্ণ বিষয় বাসানায় উহারা ফিরিতে চায় না। ক্ষুদ্র মানবের কি সাধ্য যে, সে ভাব ব্যক্ত করে। তাঁহাদের সহবাসে, তাঁহাদের মধুর উপদেশ শ্রবণে, তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব লীলা দর্শনে, প্রাণ মন আকুল হইয়া পড়ে। সে সহবাস-আনন্দ যে একবার উপভোগ করিয়াছে, সে আর উহা ভুলিতে পারিবে না। সে ভক্তরাজ্যের শোভা দেখিয়া প্রাণে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছি তাঁহাদের অদ্ভুত লীলা দেখিযা সময়ে ২ যেরূপ বিস্মিত হইয়াছি, অপূর্ব্ব উপদেশ রাশি শ্রবণে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছি, তাহাই কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকগণকে আমার ভাগ্যের সঙ্গী করিব। অদ্য আমরা সেই আনন্দ-কাননের একটি অপূর্ব্ব সৌরভযুক্ত পুষ্প উত্তোলন করিয়া পাঠক সমীপে ধরিলাম। ইনি মৃত মহাত্মা।

রমানন্দ স্বামী।*

* প্রতিমূর্ত্তিটি তত সুন্দর হয় নাই। চিত্রকরের দোষে সে প্রশান্ত ভাবপূর্ণ আকৃতির অনেক অংশ ফুটে নাই। তথাপি সাধুদর্শনেচ্ছুগণের কৌতুক চরিতার্থের জন্য এটি এস্থানে সন্নিবেশিত হইল। বেঃ সং

মা, আজ তাঁহার সাধের উদ্যানের ফুলটি ছিঁড়িয়া গলায় পড়িয়াছেন। তাহাই আনন্দকাননে যেন কি একটা অভাব বোধ হইতেছে। শোভারও অনেক হানি হইয়াছে। কত অনুরাগী মহাত্মা অপূর্ব্ব সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সে ফুলের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসিতেন আর আনন্দে বিভোর হইয়া সংসারের সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। কিন্তু যে "রক্ষক সেই ভক্ষক" হইয়া আপন সুখের তরে উহা নষ্ট করিল। পাষাণের মেয়ের পাষাণ হৃদয়ে একটু মায়াও হইল না।

ক্রমশঃ।

আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান।

মৃগকোষে কস্তুরিকা জন্মাইলে, সেই সুগন্ধিকোষ মধ্যে মধ্যে গন্ধকনা বহির্গত করিয়া মৃগবরের চিত্ত বিহ্বল করিয়া তুলে। মৃগও তৎগন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেই মনোহর গন্ধের আকর কে? কোথা হইতে এই সুখকর গন্ধ আসিয়া আমার চিত্তবিমোহিত করিয়াছে, সদাই সেই অন্বেষণে প্রবৃত্ত। তাহার শয়নে স্বপনে গমনে ভোজনে সদাই সেই চিন্তা—গন্ধের আকর কে? কিন্তু হায়! মূঢ় মৃগ জানে না, যে সেই সুখপ্রদ গন্ধের আকর সে স্বয়ংই। তদ্রূপ দুঃখ-সমূহ-সঙ্কুল-জগতে জীব আসিয়া একমাত্র সুখের অন্বেষণে সদাই প্রবৃত্ত। আমার দুঃখোৎপত্তি না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখোৎপত্তি হউক ইহা প্রাণীমাত্রেরই একান্ত বাসনা। কিন্তু কিসে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, মূঢ় জীব জানেনা। এজন্য সদাই সুখ সুখ বলিয়া এত ব্যস্ত; কি করিলে কোথায় যাইলে সুখ পাওয়া যায় সেই চিন্তানলই তাহার হৃদয়ারণ্যকে সদাই দগ্ধ করিতেছে। জগতে এক মাত্র বাঞ্ছনীয় সুখ। সুখের আশয়েই মনুষ্য কত অসাধ্য সাধন করিতেছে, সুখাশয়েই বিগর্হিত কার্য্য করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। আজ যদি কেহ বলে অতল জলধিতলে মগ্ন হইলে অশেষ সুখ পাওয়া যায়, মনুষ্য নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাই করিতে বাধ্য। সুখের জন্য জীবগণ মায়া জালে জড়িত হইয়া আত্মহারা হইতেছে। এজন্য শাস্ত্রকারগণ সুখকেই জগতের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা যে কোনই

কার্য্য কর না কেন, তাহার পরিণামে সুখ বা দুঃখ জন্মাইবে,—সুখ দুঃখ ভিন্ন জগতের কার্য্য মাত্রের আর কোন পরিণাম ফল নাই। কিন্তু তন্মধ্যে সুখই একান্ত বাঞ্ছনীয়। এজন্য মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, "যমুদ্দিশ্য প্রবর্ত্ততে তৎপ্রয়োজনম্" যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলে। যেহেতু আমাদের ক্ষুধা বোধ হইলে পাকাদি করিতে প্রবৃত্তি হই, অতএব ক্ষুধা নিবৃত্তি উদ্দেশ্য করিয়া পাক করিয়া থাকি, এজন্য পাকাদির প্রয়োজন ক্ষুধা নিবৃত্তি, এইরূপ ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজন সুখ। অতএব সকল কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য সুখ, সুখই কার্য্যের চরম প্রয়োজন। হায়! জীব নিরন্তর যে সুখের জন্য লালায়িত তাহা পাইতেছে না। যদিচ আপাততঃ শিশুর অনুপম মুখসৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে হর্ষোদয় হয় বটে, কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী। যুবতীর কেশকলাপ দেখিলে সুখ হয়, কিন্তু সে জীবের প্রার্থিত বস্তু নহে। নানা প্রকার সুস্বাদু বস্তু খাইলে পরে ভক্ষণজন্য তৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই যে ক্ষুধা সেই ক্ষুধা। ধনাদি লাভ হইলে কিছুক্ষণ সুখী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অমনি আশা কুহকিনী আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে, তখনই মনুষ্য বিপুলধন চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন তাহার সে অর্থে আর মন উঠে না, সমধিক অর্থের দাস হইয়া পড়ে। মনে করুন্ এক জনের কিছুই সঙ্গতি নাই, সে মনে করে হায় ঈশ্বর যদি আমাকে পাঁচ টাকা দিতেন, তাহা হইলে আমি বড়ই সুখী হইতাম। কিন্তু কাল ক্রমে যদি তাহার সেই পাঁচটী টাকা সংগ্রহ হয়, তবে পরদিনেই আবার তাহার বোধ হইবে, হায়! যদি দশ টাকা পাইতাম, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত, এইরূপ দশ টাকা কোন প্রকারে সংগ্রহ হইলে, অমনি কুড়ি টাকার আকাঙ্ক্ষা হইয়া পড়ে। এইরূপ আশা কুহকিনী তাহাকে কোটী কোটী টাকার ভিখারী করিয়া তুলে, কিছুতেই মানবহৃদয় শান্তি লাভ করিতে পারে না, কিছুতেই আশার নিবৃত্তি হয় না, নিজছায়ার ন্যায় আশাও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, আপনি যতই অগ্রসর হইয়া তাহার সীমা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু ততই সে বর্দ্ধিত হইয়া আপনার অগ্রে অগ্রে যাইবে। আপনাকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার অন্ত নাই, আপনি তাহার সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। এজন্যই বলিয়াছেন।

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশ শতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতি শ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি ব্র্হ্মাস্পদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরি র্হরপদং আশাবধিং কোগতঃ?।

যাহার যেরূপ অর্থ তাহাব তদনুরূপ দুঃখ। যাহার কিছু নাই তাহার পাঁচ টাকার দুঃখ। যাহার অর্থ আছে তাহার কোটী কোটী টাকার দুঃখ। সে কোটী টাকার ভিখারী। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেষ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজা স্তীতি সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ।

তাহাই বলি মনুষ্য যে অপূর্ব্ব পরম সুখ লিপ্সু, তাহা কি সামান্য পুত্র কলত্রাদি হইতে পারে?, নির্গন্ধ কিংশুক হইতে কি সুগন্ধ পাওয়া যায়? না তিক্তনিম্ব বৃক্ষে সুমধুর আম্রফল পাওয়া যায়?। তদ্রূপ বিনশ্বর অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক বস্তু হইতে পরম সুখ প্রাপ্তির কি সম্ভব?। যদিচ তরঙ্গ-সঙ্কুলিত-সমুদ্র-পতিত ব্যক্তি যেরূপ মধ্যে মধ্যে মুখোত্তলন জন্য ক্ষণিক সুখ প্রাপ্ত হয়, তৎপরক্ষণেই আবার তরঙ্গান্তর আসিয়া যেরূপ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহার ন্যায় দুঃখ-তরঙ্গ সমাশ্রিত সংসাব সমুদ্রে ভাসমান জীবের মধ্যে মধ্যে যে সুখোদয় হয়, তাহা, উহা একটী দুঃখতরঙ্গ আসিয়া অপরটী আসিবার মধ্যবর্ত্তী অবকাশ মাত্র। প্রকৃত তাহা সুখ নহে, তাহাকে সুখাভাস কহে। এজন্য বিবেকী মহাত্মাগণ তাদৃশ ক্ষণস্থায়ী বিনশ্বর দুঃখ বিমিশ্রিত সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া গণনা করেন না। প্রত্যুতঃ যেরূপ বহুকণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে যদি কোন সুমনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তবে বিবেকী ব্যক্তি কণ্টক বিদ্ধভয়ে কখনই সেই পুষ্প গ্রহণে ইচ্ছুক হয়েন না, বরং তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্যাগ করেন। তদ্রূপ দুঃখসম্বিদ্ধ সাংসারিক সুখকে দুঃখ প্রাপ্তি ভয়ে যোগিগণ হেয় জ্ঞানে ত্যাগ করেন। বাস্তবিক জীব যে সুখের অভিলাষী, জীব স্বয়ংই সে সুখের আকর। আজ আমরা পরম প্রেমের আধার হইয়া, পরম জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ হইয়া সামান্য সুখের জন্য ইতর জড়বস্তুর নিকট ভিখারী হইয়াছি। ঘরের খরচ না রাখিয়া দেশ দেশান্তরের খরচ লইতেছি। আমরা জানি না যে আমি কে? বা

তাহোর স্বরূপ? ঊর্ণনাভি যেরূপ স্বীয় কোষ হইতে তন্তু বিস্তার করতঃ তাহাতে জড়িত হইয়া তন্মধ্যে বাস করে, তাহার ন্যায় জীব স্বীয়কর্ম্ম সূত্রে গ্রথিত মায়াজালে জড়িত হইয়া, * অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞান-ময়, আনন্দময়রূপ পঞ্চকোষমধ্যে আত্ম বিস্মৃতি পূর্ব্বক বিনশ্বর স্ত্রী পুত্র কলত্রাদিতে অনুরক্ত হইয়া সদাই আমি আমার বলিয়া মুগ্ধ হওত বাস করিতেছে। কিন্তু যৎকালে আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই বিনশ্বর অনিত্য দেহে আত্মভাব ত্যাগ হয়, তখন নির্ম্মল শরৎ-শশীর ন্যায় অজ্ঞানাদি আবরণ রহিত হইয়া স্বপ্রকাশমান হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তখন আর বৃথা স্ত্রী পুত্রাদিতে অনুরক্ত হইয়া আমি আমার বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। তখন সংসারিক সুখ দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এজন্য শ্রুতি বলিতেছেন, "অতএবাব-সন্তং ন স্পৃশতঃ প্রিয়াপ্রিয়ে" অর্থাৎ অশরীরি আত্মাকে সুখদুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না সেই অবস্থা মুক্তাবস্থা। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হইলে আত্মার আর মুক্ত হইবার উপায় নাই!

অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে হইলে প্রথমে আত্মা কি পদার্থ তাহা জানা আবশ্যক। এবিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার নির্ণয় করি-

---

* অন্নময়াদি পঞ্চ কোষের স্বরূপ নির্ণিত হইতেছে। যথা "স্যাৎ পঞ্চীকৃত ভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোহন্ন সংজ্ঞকঃ। লিঙ্গেতু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥ পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্নময় কোষ বলে, উক্ত কোষ অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হয়। সাত্ত্বিকৈ র্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ। তৈরেবসাকং বিজ্ঞানময়ো ধী নিশ্চয়াত্মিকা॥ কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ। তত্তৎ কোষৈস্ত তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ লিঙ্গ শরীরের মধ্যগত পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমন্বিত পঞ্চপ্রাণকে প্রাণময় কোষ বলে। এবং আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সত্ত্বগুণের কার্য্যস্বরূপ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমন্বিত সংশয়াত্মক মনকে মনোময় বলিয়া থাকে। যাহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ হয় এবং উক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ, অর্থাৎ যিনি কর্ত্তা স্বরূপে জ্ঞানের শক্তি বিকাশ করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ শরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যমান আছে, সেই অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ প্রীতি আমোদ প্রভৃতি কতিপয় বৃত্তি তাহাদের সহিত বর্ত্তমান যে, মলিন সত্ত্ব-গুণ তাহাকে আনন্দময় কোষ কহে, এইরূপে আত্মা যখন যে কোষে অভিমানী হয়েন [illegible] আত্মা সেই কোষ বলিয়া ব্যবহৃত হয়েন।

য়াছেন। প্রথমে প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী স্থূলদর্শী চার্ব্বাক, হস্ত পদ প্রভৃতি অবয়ব বিশিষ্ট প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ এই স্থূল শরীরকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই প্রমাণ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাই। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ হয় না তাহা নাই, আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না সুতরাং আত্মা নাই। যথা—

নস্বর্গো নাপবর্গো নৈবাত্মা পার লৌকিকঃ।
নৈববর্ণাশ্রেমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফল দায়িকাঃ॥

প্রত্যক্ষ সুখ ভিন্ন অন্য কোন স্বর্গ নামক স্থান বা পদার্থ নাই। অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি নাই। এবং পারালৌকিক আত্মা নাই, অর্থাৎ পরজন্ম নাই। বর্ণাশ্রমাদির ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতির ক্রিয়া যাগ যজ্ঞাদি ফলদায়ক নহে। তোমার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই করিবে। সুখই পুরুষার্থ দুঃখই নরক। অকিঞ্চিৎকর দুঃখভয়ে আহার বিহারাদি জন্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সুখকে ত্যাগ করিবে না। দুঃখভয়ে সুখকে ত্যাগ করা মূর্খের কার্য্য।

যথা—ত্যাজ্যং সুখংবিষয়সঙ্গম জন্মপুংসাম্
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খ বিচার-নৈষা।
ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্;
কোনাম ভো! স্তুষকনোপহিতান্ হিতার্থী॥

অর্থাৎ দুঃখসংশ্লিষ্ট সাংসারিক সুখকে দুঃখ প্রাপ্তি ভয়ে ত্যাগ করা মূর্খের কার্য্য। তুষকণ্টক বিদ্ধভয়ে ধান্যকে কোন্ মূর্খ ত্যাগ করে?

যেরূপ অঙ্গুর ফল প্রভৃতি বস্তু সহযোগে মদ্যে মাদকতা জন্মে, অথচ সেই সকল বস্তু যদি পৃথক্ ভাবে খাওয়া যায়, তাহাতে যেমন মাদকতা শক্তি জন্মেনা, অথচ পরস্পরের সংযোগ বিশেষে জন্মায়, কিন্তু কিছু দিবস থাকিলে কোন অংশ বিশেষের অন্যথা হইলে যেরূপ মাদকতা শক্তি থাকে না। তাহার ন্যায়" ক্ষিত্যপ্ তেজঃ মরুৎ " এই চারি ভূত সহযোগে শরীরে শক্তিবিশেষ জন্মায়, তখনই মনুষ্যাদি জীবিত থাকে। উক্ত ভূত পদার্থের কোন একটীর অন্যথা হইলে সেই শক্তির হ্রাস হয়। সেই অবস্থার নাম মৃত্যু। সুখ দুঃখাদির আশ্রয় শরীর। শরীর ভিন্ন অতিরিক্ত আত্মাতে মুক্তি প্রমাণ নাই। এবং শরীরনাশই মুক্তি।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদীরা, যদি মনুষ্য মৃত হইলে তাহার দেহ তখন থাকে এবং দেহই জ্ঞানদির আশ্রয় হয়, তবে মৃত শরীরেতেও জ্ঞান জন্মাইতে পারে, এইরূপ চার্ব্বাক মতোপরি দোষারোপ করিয়া ইন্দ্রিয় গণকে জ্ঞানাদির আশ্রয় ও আত্মা বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, তৎপ্রত্যক্ষ জন্য জ্ঞানাশ্রয় তদিন্দ্রিয়ই হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ই আত্মা।

হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ ইন্দ্রিয়াত্মবাদির উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন যে, যদি চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানাশ্রয় হয়, তবে পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির চক্ষুঃ থাকায় সে নানা প্রকার বস্তু দেখিল, কিন্তু কালক্রমে ঐ ব্যক্তির চক্ষুঃ বিনষ্ট হয় তবে উহার পূর্ব্বদৃষ্ট কোন পদার্থের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্য সংস্কারাশ্রয় চক্ষুরিন্দ্রিয়ই হইবে, কিন্তু চক্ষু-রিন্দ্রিয় তখন নাথাকায় তাহার স্মরণ হয় কি করিয়া? যদি এইরূপ আশঙ্কা করা যায় যে এক ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ জন্য সংস্কারাশ্রয় অন্য ইন্দ্রিয় হয়। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয় না থাকিলেও অন্য ইন্দ্রিয় সংস্কারাশ্রয়ী হইয়াছে, সুতরাং তাহার স্মরণ হইতে পারে। বাস্তবিক বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা সহজে দূরীভূত হইতে পারে। কারণ এক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জন্য জ্ঞানাশ্রয় যদি অন্য ইন্দ্রিয়ও হয়, তাহা হইলে রাম দেখিলে শ্যামের স্মরণ হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বলা যায় না এজন্য কেহ মনঃ পদার্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কারণ মনের ভোগ কর্তৃত্ব আছে। এবং মন বন্ধ ও মোক্ষের কারণ, অতএব মনই আত্মা। অতঃপর নৈয়ায়িকগণ বহুবিধযুক্তি দ্বারা মনের আত্মত্বখণ্ডন করিয়াছেন। কারণ মন যদি সুখদুঃখাশ্রয় হইত, তাহা হইলে আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ জ্ঞানও সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। যেহেতু মনঃ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, কারণ এক কালে দুই বা তিন ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ হইতেছে না, অতএব মন কে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ না বলিলে এককালে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ হইতে পারিত। অর্থাৎ আমরা যখন চক্ষুঃদ্বারা কোন রূপাদি দর্শন করিতে থাকি, তখন কর্ণ দ্বারা কোন শব্দাদি শুনিতে পাই না। যদি মন স্বীকার না করিয়া প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়গণকেই কারণ বলা যায় তবে ইন্দ্রিয়গণ সকল সময়েই আছে, সুতরাং সর্ব্বদাই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা এক সময়ে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যখন সর্ব্বদাই এককালে

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে না, তখন অবশ্য এইরূপ কোন কারণ কল্পনা করিতে হইবে, যাহার দ্বারা সর্ব্বদাই সকল ইন্দ্রিয় জন্য একদা প্রত্যক্ষ না জন্মায়। অতএব অতি সূক্ষ্মতম মন পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য ভগবান্ গৌতম বলিয়াছেন "যুগপজ্‌জ্ঞানানুপপত্তি র্মনসো লিঙ্গম্" অর্থাৎ এককালে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, যাহার দ্বারায় সেই সূক্ষ্মতমদ্রব্যপদার্থ মন, মন। অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু মন অতিসূক্ষ্ম বিধায় এককালে উভয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, এজন্য এককালে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত মন যখন চক্ষুরিন্দ্রিয় সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু মন সূক্ষ্ম বিধায় কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না? সুতরাং আমরা কোন বস্তু দেখিবার সময় কোন শব্দাদি শুনিতে পাই না। যদিচ আমাদের এরূপ হইয়া থাকে যে, এক সময়ে কোন বস্তু দেখিতেছি ও কোন গীত শ্রবণ করিতেছি, বা জিহ্বার দ্বারা কোন রসাস্বাদন করিতেছি। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এক সময়ে উক্ত প্রত্যক্ষ সকল জন্মাইতেছে না। অর্থাৎ যেরূপ কতকগুলি পত্র একত্রিত করিয়া শূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে বোধ হয় এককালেই সমস্ত পত্রগুলি বিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু উহা প্রথম পত্রখানি বিদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় পত্রখানি তৎপর সময়ে বিদ্ধ হইয়াছে ও তৃতীয় পত্রখানি তৎপরক্ষণে বিদ্ধ হইলেও যেরূপ আমরা একখানি পত্র বিদ্ধ হইয়া তৎপরখানি বিদ্ধ হইবার অভ্যন্তরবর্ত্তী সময় টুকু আমরা অনুভব করিতে পারি না, তাহার ন্যায় একটী প্রত্যক্ষ হইয়া অপরটী প্রত্যক্ষ হইবার মধ্যবর্ত্তী সময় অতি অল্পবিধায় আমরা অনুভব করিতে পারি না। অতএব মন যে সূক্ষ্মপদার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মন যদি সুখ দুঃখ বা জ্ঞানাদির আশ্রয় হয়, তবে জ্ঞান বা সুখাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ আশ্রয়ী প্রত্যক্ষের প্রতি আশ্রয়ের মহত্ত্ব কারণ। যাহার আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, সে বস্তুরও প্রত্যক্ষ্য হয় না, যেমন আমরা পরমাণু দেখিতে পাই না এজন্য তাহার রূপের ও প্রত্যক্ষ হয়না। অতএব মনকে আত্মা বলা যায় না। অতএব ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা জ্ঞান সুখ দুঃখাশ্রয় দেহ ইন্দ্রিয় ও মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার

করিতে হইবে। যেরূপ রথগতির দ্বারা সারথী অনুমেয়, তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়গণের ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি দ্বারা আত্মা অনুমেয়। যথা—

প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ং রথগত্যেব সারথী।

এবং কঠোপ নিষদেও আত্মাকে রথী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু,
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়াহু বিষয়াস্তেষু গোচরান্, ॥
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু মনীষিণঃ ॥

উক্ত মতে আত্মা স্বাভাবিক চেতনা পদার্থ নহে; অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে আত্মাতে সুখ দুঃখ জ্ঞান প্রভৃতি জন্মাইয়া থাকে। আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন ও শরীর আত্মা হইতে পৃথক ও অনিত্য এইরূপ তত্ত্ব জ্ঞান হইলে মিথ্যা জ্ঞান দূরীভূত হয়, তজ্জন্য বাসনা বিশেষ জন্মে না সুতরাং তজ্জন্য পুনঃপুনঃ শরীর পরিগ্রহ, হয় না। সুতরাং শরীর নাথাকিলে অশরীর আত্মাকে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। দুঃখের অত্যন্ত বিনাশই মুক্তি। "তদন্ত বিমোক্ষো হ পবর্গঃ" গৌতম সূত্র। দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হইলে আত্মা মুক্ত হইলেন, পুনর্ব্বার আত্মার শরীর পরিগ্রহ করিয়া সংসারিক দুঃখে দুঃখিত হইত হয় না। মুক্ত আত্মাতে কোন সুখাদি জন্মায় না। "আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্' ইত্যাদি শ্রুতিতে যাহা আনন্দ পদ প্রয়োগ আছে, উহা দুঃখাভাব বোধক। কারণ যে ব্যক্তির কোন প্রকার দুঃখ নাই তাহাকেও লোকে সুখী বলিয়া থাকে, দুঃখাভাবেও সুখ শব্দ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং শ্রুতির সহিত কোন বিরোধ নাই। এই মতের উপর অনেকেই আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, যদি মুক্তাবস্থায় আত্মার কোন সুখাদি দুঃখাদি থাকিল না, তবে আত্মা মোক্ষ সময়ে পাষাণ সদৃশ জড়, পদার্থ হইলেন। অতএব বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া কে এতদৃশ মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছাকরে? এবং কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহম্। নচবৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥ অর্থাৎ রম্যবৃন্দাবনে শৃগাল হইয়া বাস করিব, কিন্তু কদাপি বৈশেষিকদিগের মুক্তি প্রার্থনা করিব না। যাহা হউক মোক্ষ সময়ে আত্মাতে কোন সুখাদি জন্মাইতে পারে কিনা এবিষয়ে সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ।
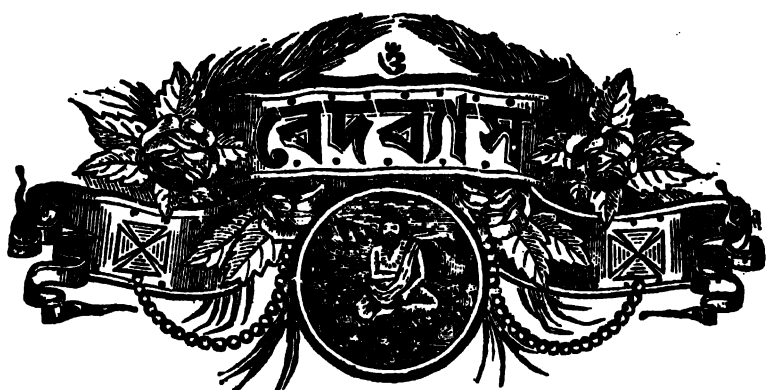
৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ৪র্থ খণ্ড।

অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অদৃষ্টের স্বরূপ, লক্ষণ, বিভাগ, এবং কোন্ জাতীয় অদৃষ্টের দ্বারা কোন্ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় ইত্যাদি বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন তাহার নিয়ম ও প্রণালী বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে জাতিজনক অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী আলোচনা করা উচিত,—

জাতিজনক অদৃষ্টের দ্বারা জীবের মনুষ্যাদি জন্ম সম্পাদিত হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অতএব এইক্ষণ তাহা কিপ্রকারে হয় তদ্বিষয় বলিলেই হইবে।

প্রথমে একটি কথা ভাবিয়া দেখুন,—

এই পৃথিবীতে যত প্রকার প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দুই জাতীয় প্রাণীর এক প্রকার আকৃতি প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হয় না; দুই জাতীর কেন, এক জাতির মধ্যেও দুই প্রাণীর ঠিক ঠিক একপ্রকার আকৃতি প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক প্রাণীরই

ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ভিন্নভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই প্রভেদ ও পার্থক্য যে অতি সামান্য তাহাও নহে, ইহা অতীব বিপরীত, অতীব অদ্ভুত; এমন কি, ইহা দেখিলে, ইহারা সকলেই যে "একজন শিল্পীর" দ্বারা নির্ম্মিত তাহাও যেন বিবেচনায় আইসে না। যে শিল্পীর চারু কার্য্যের দ্বারা পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্য স্বরূপ" তাজ মহল "নির্ম্মিত হইয়াছে গারোব দিগের, "শূয়োর গুন্দির" ন্যায় কুটীর সমূহও সেই হস্তের রচিত ইহা যেমন বিশ্বাস করা যায় না, কিম্বা, মুর্শিদাবাদেয় "এক্কা" গাড়ী যেমন স্বর্গীয় বিমানের রচয়িতার রচিত বলিয়া মনে আসিতে পারে না, সেইরূপ, যিনি এই সর্ব্ব গুণাকর, সর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনুষ্য শরীরের রচয়িতা তাঁহার সেই সুচারু শিল্পহস্তের দ্বারাই এই মশক-মহীলতাদি-সর্ব্বগুণ-শূন্য-প্রাণি-গণের আকৃতিও রচিত হইয়াছে ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? এবং যিনি কাশ্মীরীয় তুরঙ্গমী, বা হিমালয়ের পশু রাজের রচয়িতা তিনিই সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন উষ্ট্র দেহের রচয়িতা, কিম্বা যিনি এই বিচিত্র রচনা ও বিচিত্র চিত্র শিক্ষার প্রথম উদাহরণ স্থল শিখণ্ডীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার সেই সমস্ত শক্তি সেই সমস্ত গুণ বিস্মৃত হইয়া এই জঘন্যকায় পেচকের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বুদ্ধিতে আইসে না।

আবার পক্ষান্তরে ইহাও মনে হইতে পারে যে, এই নিখিল প্রাণিগণ এক কারু হস্তের দ্বারাই নির্ম্মিত; এক হস্তের নির্ম্মিত বলিয়াই ইহারা এইরূপ অদ্ভুত পার্থক্য বিশিষ্ট হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রাণি-গণের এই-রূপ অত্যন্ত বিসদৃশ বিভিন্নরূপ রচনাবলি বিজ্ঞাবিজ্ঞ বহুবিধ রচয়িতার প্রমাণক নহে—কিন্তু এক রচয়িতারই অপরিসীম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদ। যাহার শক্তি কোন বিষয়ের অভ্যস্ত এবং পর্য্যাপ্ত থাকে তাহার ক্রিয়ার স্থানও পর্য্যাপ্ত এবং একস্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর তাহারা ক্রিয়াও কেবল ভাল কিম্বা কেবল মন্দ এইরূপ একজাতীয়ই হয়, কিন্তু যাঁহার শক্তি অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্তীকৃত নহে, যাঁহার শক্তি সনাতনী এবং অসীম অনন্ত, তাঁহার কার্য্যও অসীম অনন্তরূপ হইবে; অতএব এই অনন্তপ্রকার অনন্তসংসার সেই অনন্তশক্তিমানের একহস্তেই রচিত তাহাতে কোন সংশয় নাই।

কিন্ত তথাপি একটি কথা বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা

ভগবানের যে কোন কার্য্যের দিকে মনোনিবেশ করি তাহাতেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কুম্ভকার বা তন্তুবায়ের ন্যায় স্বহস্ত ব্যাপারের দ্বারা কোন বস্তুর নির্ম্মাণ করেন না, কিন্ত প্রত্যেক বস্তুর শক্তি এবং তাহার নিয়মাবলী মাত্রই তাঁহার স্বহস্তের কার্য্য, এবং সেই শক্তি আর নিয়মাবলীর দ্বারাই জগতে অনন্ত প্রকার ক্রিয়া হইয়া অনন্ত প্রকার বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য সাধিত হইতেছে।

অগ্নির দ্বারা তৃণরাশি দগ্ধ হওয়া কালে, তাঁহাকে স্বহস্তের দ্বারা দাহ করিতে দেখা যায় না. কিন্তু তৃণরাশির সংযোগ হইলে অগ্নিই তাহা ভস্মসাৎ করে। অতএব ইহাই বলিতে হইবে যে, অগ্নির দাহিকাশক্তি আর তৃণের দাহ্যশক্তি এবং অগ্নি তৃণের সংযোগে ঐ দাহ্যদাহিকা শক্তির ক্রিয়া হওয়ার নিয়মটি মাত্রই ভগবানের স্বহস্তের দ্বারা সমাপিত। দুগ্ধ গোমূত্রসংযোগে আমিক্ষা হইয়া যায়, গন্ধক পারদ সংযোগে কজ্জলীতে পরিণত হয়, এবং অম্ল, মিষ্ট ও তাপাদি সংযোগে মদ্যাদির উৎপত্তি হয়, ইহার কিছুই তাঁহাকে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায় না, কিন্তু, দুগ্ধ, গোমূত্র ও গন্ধকাদির তাদৃশ শক্তিই তাঁহার স্বহস্তে নির্ম্মিত বলিতে হইবে।

অতএব মনুষ্য পশ্বাদি প্রাণিগণের সৃষ্টি সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে, ইহাও তিনি ঘটাকার পটাকারের ন্যায় স্বহস্তসমালোড়নের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন না,—কিন্তু বিচিত্রশক্তির সমর্পণের দ্বারা। মনুষ্য পশ্বাদির মধ্যেও ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী নানা প্রকার শক্তি এবং নিয়মাদি নিহিত আছে, তদ্দ্বারাই এই অপরিসঙ্খ্যেয় আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট অপরিসঙ্খ্যের প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ শক্তি এবং কোন্ নিয়মের দ্বারা এই অপরিসঙ্খ্যেয় মনুষ্যাদি জাতির ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহের সৃষ্টি হইয়াছে? কোন্ শক্তি ও কোন্ নিয়মের দ্বারা মনুষ্যের আকৃতি প্রকৃতি সঙ্গঠিত হইল, আর কোন্ শক্তি, কোন্ নিয়মের দ্বারাই বা গোমহিষাদি পশুদেহের নির্ম্মাণ হইয়াছে, এবং কোন্ নিয়মের দ্বারাই বা সরীসৃপাদির আকৃতি প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে? বলা বাহুল্য যে, এই বিষয়টি আলোচনা করিলেই আমাদের মন্তব্য বিষয় মীমাংসিত হইবে এবং ইহারই পর্য্যালোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রথমে শাস্ত্র কি বলেন তাহা দেখা যাউক, তৎপর যুক্তির অন্বেষণ করা যাইবে।

শাস্ত্র বলেন, যে যে শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্যাদি দেহের নির্ম্মাণ হইয়াছে সেই শক্তির নাম অদৃষ্ট এবং বাসনা। এতদুভয়বিধ শক্তির দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শরীরের রচনা হইয়াছে। যথা,—"সতি মূলে তদ্বি পাকো জাত্যায়ুভোগাঃ" (পাত) এবং ক্লেশকর্ম্ম বিপাকানুভব নির্ম্মিতাভিস্ত বাসনাভিশ্চিত্রীকৃত মিদং চিত্তং সর্ব্বতো মৎস্য জাল গ্রন্থিভিরিবাততং ইত্যেতা অনেক ভবপূর্ব্বিকা বাসনাঃ। যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবঃ তা বাসনাঃ তাশ্চানাদি কালীনা ইতি"। (পাঃ-দঃ ভাঃ) ইহার ভাবার্থ এই যে, "অবিদ্যাদি মুল বীজ থাকিলে অদৃষ্টের দ্বারা জীবের জন্ম, আয়ু এবং সুখ দুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে" এবং বাসনা নামক শক্তিও ইহার সঙ্গি ভাবে অবস্থিতি করিয়া উক্ত কার্য্যের সহায়তা করে। একাদশবিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নানা প্রকার বিষয়ের ভোগ করিয়া যে সুখজনক বিষয়ের প্রতি অনুরাগ এবং দুঃখজনক বিষয়ে প্রতি বিদ্বেষাদি হয় তাহার বদ্ধ মুল সংস্কারকে "বাসনা" বলে এবং বাহ্যেন্দ্রিয় ক্রিয়া বামনের দ্বারা যে সকল বিষয়ের জ্ঞান বা অনুভব হয় তাহার সংস্কার অর্থাৎ স্মরণ সংস্কারও বাসনা নামে অভিহিত হয়। ইহকালে নানা প্রকার বিষয় ভোগ, এবং নানা প্রকার বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সংস্কার সমূহ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া জীবের হৃদয়ক্ষেত্রকে যেন চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং এক একটি সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া মৎস্য জালের গ্রন্থির ন্যায় হৃদয়কে নিবদ্ধ এবং বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই বাসনা নামক সংস্কার রাশি অনাদিকাল হইতে জীবের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া বারম্বার জন্ম, আয়ু, এবং সুখ, দুঃখ ভোগের সহায়তা করে। এই সমস্ত শাস্ত্রেই এই প্রকার লিখিত আছে, অতএব অদৃষ্ট আর বাসনার দ্বারাই আমাদের শরীর সঙ্গঠিত হয় ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

এখন এবিষয়টি বিশেষরূপে বিস্তার করা আবশ্যক, নতুবা পাঠকগণের তৃপ্তি হইবে না, পরন্তু ইহা বুঝিবার পূর্ব্বে আমাদের এই শরীরটী কি পদার্থ তদ্বিষয় কিছু জানা চাই। শরীরটির বিবরণ কিছুমাত্র না জানিলে তাহার উৎপত্তির প্রক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় না; অতএব তদ্বিষয় কিছু বলা যাইতেছে।

আমাদের এই শরীরটী কেবল কতকগুলি যন্ত্রের সমষ্টিমাত্র। আপাদতল মস্তক পর্য্যন্ত দেহের যে সকল অবয়ব আছে, তত্সমস্তই এক একটি

যন্ত্র, একটী সূত্র বিদ্ধ করিলে যতটুকু স্থান বিদ্ধ হয়, তাহাও কোন একটী যন্ত্র বা যন্ত্রের অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি মস্তিস্ক, কি চক্ষু; কি নাসিকা, কি রসনা, কি ফুস্ফুস, কি পাকস্থলী, কি মাংসপেশী, সকলই এক একটী যন্ত্র ও যন্ত্রাবয়বমাত্র। যেমন, বাহিরে কোন শক্তি, বা কোন বলকে কোন বস্তুতে সংক্রান্ত বা নিযুক্ত করার নিমিত্ত কোন রূপ যন্ত্রের নিতান্ত আবশ্যক হয়, কারণ, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তিকেই কোন বস্তুতে সন্নিবেশিত করা যায় না, সেইরূপ আমাদের সমন্তরস্থ আত্মাতেও যে সকল শক্তি বা বল আছে তাহা বাহ্য বা আন্তরিক কোন দ্রব্যেতে সংক্রমণ করার নিমিত্ত বিচিত্র যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত আত্মার কোন শক্তিই কোন বস্তুতে নিযুক্ত হইতে পারে না। আমাদের আত্মার দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, স্পর্শন শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি, রসগ্রহণ শক্তি, বাক্ শক্তি, গমন শক্তি ও কাম শক্তি প্রভৃতি শত শত প্রকার শক্তি আছে, উহার পরিচালনার নিমিত্ত যে শত শত প্রকার যন্ত্রও আছে; সেই যন্ত্রগুলিই আমাদের চক্ষু, কাণ, নাশিকা ইত্যাদি। চক্ষু যন্ত্র দ্বারা আত্মার দর্শন শক্তি পরিচালিত হয়, শ্রবণ যন্ত্রের দ্বারা আত্মার শ্রবণ শক্তি কৃতকার্য্য হয়, নাসিকা যন্ত্রের দ্বারা ঘ্রাণ শক্তি চরিতার্থ হয়, রসনা যন্ত্রের সাহায্যে রসনা শক্তি কৃতার্থ হয় এবং ত্বক্ যন্ত্রের সহায্যে স্পর্শন শক্তি বাহ্য বস্তুতে বিনিযুক্ত হয়। এইরূপ এক একটী যন্ত্রের সাহায্যে আত্মার এক এক শক্তি স্বকার্য্য নিস্পাদনে সমর্থ্য হইয়া থাকে। ঐ সকল যন্ত্রগুলি যথাক্রমে একটীর উপর আর একটী, তার উপর আর একটী সন্নিবেশিত হইয়াই এইরূপ অবস্থায় নিযুক্ত হইয়াছে, অধিক কি আমাদের এই দেহের যদি শরীর, তনু ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলি না থাকিত তবে ইহাকে আত্মারই শক্তি পরিচালনার যন্ত্র বলিয়াই ব্যবহার করা হইত, বাস্তবিক তাহাই ঠিক। কিন্তু অতগুলি কথা সর্ব্বদা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, এজন্য এক কথায় ব্যবহার করার নিমিত্তই শরীর, তনু, কায়, দেহ ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই শরীরের তত্ত্ব। এখন কোন্ শক্তির দ্বারা কি প্রকারে কোন্ যন্ত্র গঠিত হয় তাহা বলা যাইতেছে।

আমাদের আত্মা যখন এই দেহ পরিত্যাগ করে তখন ইহজন্মকৃত সমস্ত প্রকার ভাল মন্দ ক্রিয়াসমূহের সংস্কার বা অদৃষ্টরাশি সঞ্চিত

থাকে, এই দেহের বিদ্যমানতাবস্থায় আমাদের যে যে ক্রিয়ার সংস্কার আছে মৃত্যুর পরেও সেই সেই ক্রিয়ার সংস্কার গুলি সমস্তই থাকে; মৃত্যুর পরেও দর্শন শক্তির সংস্কার থাকে, স্পর্শন শক্তির সংস্কার থাকে, এবং শ্রবণ শক্তির সংস্কার, ঘ্রাণ শক্তির সংস্কার, বাক্ শক্তির সংস্কার, গমন শক্তির সংস্কার প্রভৃতি নিখিল সংস্কার রাশি সঞ্চিত থাকে, এই জাতীয় সংস্কারের নাম বাসনা।

এতৎব্যতীত পূর্ব্বকথিত অদৃষ্টনামক সংস্কার রাশিও বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ ভক্তির সংস্কার, বিবেকের সংস্কার, দয়ার সংস্কার, বৈরাগ্যের সংস্কার, ঔদাসীন্যের সংস্কার, শ্রদ্ধার সংস্কার, এবং ক্রোধের সংস্কার, কামের সংস্কার, হিংসার সংস্কার, নিষ্ঠুরতার সংস্কার, অসূয়তার সংস্কার প্রভৃতি সু কু সমস্ত প্রকার সংস্কারই বিদ্যমান থাকিবে। আমাদের সমস্ত দার্শনিকগণ একবাক্যে একথার প্রতিপাদন করিয়াছেন, সাঙ্খ্যবলেন, "সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং" এবং পাতঞ্জল বলেন, "তস্মাকুলেপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুন্যা-পুণকর্ম্মাসয় প্রচয়ো বিচিত্র প্রধানোপসর্জ্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়নাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন সরণং প্রসাধ্য সম্মূর্চ্ছিত একমেব ধর্ম্ম করোতি" সমস্ত দর্শনেই এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই বিষয়টি বিস্তার পূর্ব্বক জানা বোধ হয় সকলেরই অভিলষিত, কিন্তু তথাপি ইহা যখন প্রস্তাবান্তর তখন এখানে আর অধিক বিস্তার করা যায় না।

এই রূপ শুভাশুভ অদৃষ্ট সম্পন্ন যখন পিতার ঔরস হইতে মাতৃগর্ভে নিহিত হইয়া শুক্রশোণিতের সংযুক্তাবস্থায় থাকে তখন তাহার ঐ বাসনা নামক সংস্কার রাশি এবং অদৃষ্ট নামক সংস্কার রাশি পরিস্ফুরিত হয় এবং তদ্দ্বারাই তাহার শরীর সঙ্গঠিত হয়। ইহার প্রণালী বলা যাইতেছে।

আত্মা যখন শুক্রশোণিতের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তাহার সংস্কারাবস্থাপন্ন সমস্তগুলি শক্তিই পরিস্ফুরিত হয়, এবং ঐ শুক্রশোণিতের মধ্যেই আপনাপন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এদিকে ভৌতিক পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ঐ শুক্রশোণিতময় কললের সূক্ষ্ম ২ অংশ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া ক্ষীণ হইতে থাকে, এবং আত্মার পোষণ বৃদ্ধির দ্বারা আবার উহার পুষ্টি হইতে থাকে, এইরূপ যুগপৎ ক্ষয় ও পুষ্টির সামঞ্জস্যে ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আশ্রয়ের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার শক্তি গুলিও ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং শক্তির বিস্তৃতির সঙ্গে ক্রমে হস্তপদাদি একএকটি যন্ত্রের নির্ম্মাণ হইতে থাকে। দর্শন শক্তির পরিস্ফুরণ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নয়নদ্বয় সঙ্গঠিত হয়, শ্রবণ শক্তির পরিস্ফুরণ ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ণদ্বয় সঙ্গঠিত হয়, এইরূপ ঘ্রাণশক্তির বিস্তারের সঙ্গে নাসিকা, রসনা শক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রসনা, গ্রহণ শক্তির বিস্তারের সঙ্গে হস্ত, গমনশক্তির বিস্তারের সঙ্গে পদদ্বয়, বাক শক্তির বিস্তারের সঙ্গে বাক্য যন্ত্রবিনির্ম্মিত হয়। এইরূপ একএকটি ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি একএকটি যন্ত্র সঙ্গঠিত হয়। এই হইল বাসনা নামক শক্তির কার্য্য। এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম শক্তির কার্য্য বলা যাইতেছে।

ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের মস্তিষ্কেরই নির্ম্মাণ হইয়া থাকে; একএকটি ধর্ম্মও অধর্ম্ম শক্তির পরিস্ফুরণ, ক্রিয়া, প্রবৃত্তি ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের একএকটি অংশ পরিগঠিত হয়। আমাদের মস্তকটি দক্ষিণ ও বামাঙ্গ ভেদে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত হয়, তৎপর ইহার প্রত্যেক অংশ ৪৮ ভাগে বিভক্ত। মস্তকের দক্ষিণাঙ্গ ও ৪৮ অংশে পরিণত, বামাঙ্গ ও ৪৮ অংশে বিভক্ত। এই বিভাগ মস্তকের অস্থির দ্বারা নহে, ইহা মস্তিষ্কের দ্বারা। মস্তকের মধ্যবর্ত্তি মস্তিষ্কই প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত, তৎপর তাহার প্রত্যেক অংশ ৪৮ অংশে পরিণত। উহার প্রত্যেক অংশই একএকটি যন্ত্র, আত্মার শক্তি পরিচালনার একএকটি অবলম্বন। উহার একএকটির উপরে আত্মার একএকটি ধর্ম্মাধর্ম্ম শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। মস্তকের দুইদিকেই প্রত্যেক যন্ত্র একএকটি করিয়া আছে, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রত্যেক শক্তিই দক্ষিণ ও বামের দুই দুইটি যন্ত্রের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে, এবং সেই সকল শক্তির পরিস্ফুরণ, ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তকের দুই দুইটি যন্ত্রের গঠন হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারাবস্থাপন্ন ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ক্ষমা, দম, সত্য, অক্রোধ, শান্তি, শ্রদ্ধা, সরলতা, উদারতা শৌচ, ও আত্মজ্ঞানাদি শক্তির পরিস্ফুরণ বিস্তারও ক্রিয়ার প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের উপরিভাগস্থ যন্ত্রগুলির পরিপুষ্টি ও সঙ্গঠন হইয়া উর্দ্ধভাগটি নির্ম্মিত হয়, এবং ধৃতি শক্তি ও ধীশক্তী প্রভৃতির পরিস্ফুরণাদির সঙ্গে সঙ্গে ললাটের উপর ভাগস্থ যন্ত্র গুলি নির্ম্মিত হইয়া উপর ভাগটি

পরিপুষ্ট হয়। আর ক্রোধ, হিংসা, অসূয়া, ঈর্ষ্যা, লোভ, ও কাম প্রভৃতি অধর্ম্ম নামক সংস্কার সমূহের পরিস্ফুরণ ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের দুই পার্শস্থ যন্ত্রগুলি অর্থাৎ কর্ণের উপরিভাগস্থ যন্ত্রগুলি আর মস্তকের পশ্চাৎ ভাগস্থিত যন্ত্রগুলি পরিপুষ্ট ও সঙ্গঠিত হইয়া মস্তকের পশ্চাদ্ভাগটি আর উভয় পার্শ্ব বিনির্ম্মিত হয়; এইরূপে একটি মস্তক সঙ্গঠিত হয়। ইহাই জন্ম জনক অদৃষ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়া, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে ইহার আরও অনেক প্রকার ক্রিয়া আছে। পরম্পরা সম্বন্ধে চক্ষু কর্ণাদি সকল প্রকার যন্ত্রই এই অদৃষ্টের দ্বারা নির্ম্মিত হয়; যদিচ একএকটি ইন্দ্রিয়াদি শক্তিই শরীরের হস্তপদাদি সমস্ত অবয়ব সঙ্গঠন করিয়া থাকে ইহা সত্য এবং পূর্ব্বে ও তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অন্তরালে অদৃষ্টও নিহিত আছে অদৃষ্ট একটু আবৃত ভাবে থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদি শক্তির সহায়তা করে এবং সেই সহায়তানুসারেই ইন্দ্রিয়াদি শক্তি গুলি নিজ নিজের অবলম্বন স্বরূপ একএকটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করে; সুতরাং এহিসাবে অদৃষ্টের দ্বারাই সমস্ত শরীর সঙ্গঠিত হয় ইহা বলাযাইতে পারে। ইহা বিস্তার পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, কিন্তু একটু মনোনিবেশ করা আবশ্যক হইবে।

শুভাদৃষ্ট আর শুভাদৃষ্টের যে যথাক্রমে উর্দ্ধস্রোতস্বিনী আর অধঃ স্রোতস্বিনী এই দ্বিবিধগতি আছে তাহা "ধর্ম্মব্যাখ্যা" নামক পুস্তকে অতি বিস্তার পূর্ব্বক বলা হইয়াছে এবং শুভাদৃষ্ট বা ধর্ম্মের আধিক্য থাকিলে যে, অধঃস্রোতস্বিণীর গতি সম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদিশক্তি গুলি অতি অল্প বেগবতী এবং সঙ্কোচিত হয় ইহাও বিসদ মতেই কথিত হইয়াছে। এখন আর একটি মাত্র বিষয় বলিলেই আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিব। তাহা এই, আত্মার একএকটি শক্তির পরিস্ফুরণ ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যখন একএকটি যন্ত্রের নির্ম্মান হইয়া থাকে তখন ঐ শক্তিটির বল, ক্রিয়া এবং বিস্তারের অনুসারেই একএকটি যন্ত্রের পরিপুষ্টি হইবে তাহাতে সংশয় নাই; যেশক্তিটীর বল, ক্রিয়া এবং বিস্তৃতি খুব বেশী থাকে, সেই সেই শক্তিটীর পরিচালক যন্ত্রটিও অধিকতর পরিপুষ্ট ও বৰ্দ্ধিষ্ট হইবে, আর যে শক্তিটির বল, ক্রিয়া এবং বিস্তৃতি কম থাকিবে, সেই শক্তিটির পরিচালক যন্ত্রটি ও অল্পতর পরিপুষ্ট ও ক্ষীণভাবাপন্ন হইবে ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্তঃ। প্রত্যেক শরীরের পরীক্ষা করিলেও ইহার অখণ্ডত প্রমাণ

পাওয়া যায়। অতএব ভক্তি বিবেকাদি ঊর্দ্ধস্রোতস্বি গতিসম্পন্ন সংস্কারাবস্থা বিশিষ্ট ধর্ম্মশক্তিগুলি অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট আর ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া হিংসাদি অধঃস্রোতস্বি গতিসম্পন্ন সংস্কারাবস্থা বিশিষ্ট অধর্ম্ম শক্তি গুলির, অর্থাৎ দুরদৃষ্টের ন্যুনাধিক্যাদি অনুসারে ইন্দ্রিয়াদি শক্তির যন্ত্র গুলিরও কিছু কিছু ইতর বিশেষ হয়, সুতরাং সমস্ত শরীরটিই একটু রূপান্তরিত হয়।

উক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম শক্তি এবং ইন্দ্রিয়াদি শক্তি গুলি সকলের সমভাবে নাই, কাহারও শুভাদৃষ্ট খুব অধিক, কাহারও বা দুরদৃষ্টই অধিক, আবার কাহারও হয়ত শুভাদৃষ্ট আর দুরদৃষ্ট সমান সমান থাকে ইত্যাদি। এইরূপ অপরিসংখ্যেয় প্রকার ইতর বিশেষ আছে, সেই ইতর বিশেষ অনুসারে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণির এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট দেহ সঙ্গঠিত হয়। মনুষ্যের যে যে শক্তি আছে তাহা বানরের নাই সুতরাং সেইসকল শক্তির পরিচালক যন্ত্র গুলিও তাহাদের নাই এনিমিত্ত মনুষ্যের দেহ আর বানরের দেহ নিতান্ত বিভিন্ন; এবং বানরের যে যে শক্তি আছে তাহা গো-অশ্বাদির নাই, আবার গো-অশ্বাদির যে শক্তি আছে তাহা অন্যান্য পশ্বাদির নাই। এনিমিত্ত প্রত্যেক প্রাণির ভিন্ন ভিন্নরূপ দেহ এবং ভিন্ন ভিন্নরূপ আকৃতি প্রকৃতি। আবার এক এক জাতির মধ্যেও সকলের আভ্যন্তরিক শক্তি সর্ব্বতোভাবে সমান নহে, সুতরাং সকলের আকৃতি প্রকৃতিও সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। এইরূপে জন্মজনক অদৃষ্টের দ্বারা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই শুভাদৃষ্টও দুরদৃষ্টাদিই ভিন্ন ভিন্ন দেহোৎপত্তির কারণ। ইহা না থাকিলে আমাদিগের অসংখ্য প্রকার আকৃতি ভেদও হইত না এবং উৎপত্তিও হইত না। ইহাই জন্মজনক অদৃষ্টের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া পাণ্ডিত সেই চতুর্দ্দিকস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে মাননীয় মহোদয়গণ আপনারা সকলে ধর্ম্মের স্বরূপ কিরূপ জ্ঞাত আছেন অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, কারণ ধর্ম্মের আলোচনাতেই ঈশ্বরের প্রীতি হয়।

এই কথা শুনিয়া একজন সভাস্থ নাস্তিক বলিল ঈশ্বর আবার কে?

পণ্ডিত। যাহা হইতে এই জগতের জন্ম হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর।

নাস্তিক। হে সুপণ্ডিত! বলুন দেখি এই জগন্মণ্ডল অকস্মাৎ, (কোন কারণ ব্যতীত) অথবা কোন্ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি? যদি বলেন করুণাময় সর্ব্বজ্ঞ হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহলে এরূপ বিচিত্রতা হইল কেন? দেখুন, যে দুঃখ ভোগ করিয়া করিয়া আর একটুও দুঃখ পাইতে ইচ্ছা করে না কিন্তু প্রত্যহ তাহারই দুঃখ বাড়িতেছে। এবং মনুষ্য মাত্রই ভিন্ন রুচি এবং সেই রুচিভেদে তাহাদের সুখ ও দুঃখও ভিন্ন স্বরূপ।

পণ্ডিত। মনুষ্যদিগের যে নানাবিধ ভোগ দেখিতে পাও, সেই প্রত্যেক বৈচিত্র্যের প্রতি কারণ ভিন্ন ভিন্ন। এই চরাচর জগন্মণ্ডল হেতুরই অধীন, সেই হেতু অদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব, এই ধারাবাহিক সৃষ্টি স্থিতি বিনাশময় জগন্মণ্ডল আপনা আপনি উৎপন্ন হয় নাই। যদি উহা স্বয়ং উৎপন্ন হইত, তাহলে প্রতি মুহূর্ত্তেই এই জগৎ এবং ইহার ক্রম ভিন্ন ভিন্ন হইত। এই নিমিত্ত সেই ত্রিজগতের অধীশ্বর পরমেশ্বর অদৃষ্টকে আশ্রয় করিয়া এই জগতের সৃষ্টি আদি কার্য্য করিতেছেন। অদৃষ্ট কর্ম্মের ফল, তাহা একই রকম, এই নিমিত্ত একই নিয়মে পুনঃ পুনঃ এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে। তাই বলি এই জগৎ, কারণ ব্যতীত, আপনা আপনি উৎপন্ন হয় নাই। অদৃষ্ট এবং ঈশ্বর এই উভয়ই ইহার কারণ। যদি ইহার কোন নিয়ন্তা বা নিয়ম না থাকিত, স্বয়ংই উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সকল সময় সর্ব্বত্র সকল বস্তু উৎপন্ন হইত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহা হয় না, যেমন ভোজনের পর তৃপ্তি হয় তেমনি জগতের যাবতীয় কার্য্য নিয়ম বদ্ধ।

নাস্তিক। এই জগতের বৈচিত্র্যের প্রতি অনেক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে একটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই বিস্তৃত জগত কেবল পরমাণুর সমষ্টি স্বরূপ। প্রতি পরমাণুরই বিশেষ শক্তি আছে। অতএব বিশেষ বিশেষ পরমাণুর সংযোগ বা বিয়োগবশে জাগতিক কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহাতেই আমরা জগতের বৈচিত্র্য দেখিতে পাই।

পণ্ডিত। তবে কি অপানার মতে এই জগৎ অনীশ্বর? ইহার নিয়ন্তা কেহ নাই?

নাস্তিক। তাবইকি? যখন পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না, তখন আর ঈশ্বরের কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? এরূপ স্থলে ঈশ্বরের কল্পনা করিলে সিদ্ধ সাধন দোষ হয় মাত্র। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তির কদাচ তাহা স্বীকার করা উচিত নয়।

পণ্ডিত। পরমাণু সকল জন্য বা নিত্য? যদি জন্য হয়, তবে কে তাহাদের উৎপাদন করিয়াছে? যদি নিত্য হয়, তবে তাহাদের উপর কেহ কর্ত্তা আছে, বা তাহারা স্বতন্ত্র? যদি তাহাদের পরস্পর সংযোগ এবং বিয়োগ কার্য্যেয় নিয়োগ করিবার জন্য কেহ কর্ত্তা থাকে তবে সে কর্ত্তা কে? আর যদি তাহারা স্বতন্ত্র হয়, তবে তাহারা সচেতন বা অচেতন? যদি অচেতন হয়, তবে তাহাদের দ্বারা নিয়মিত কার্য্য হওয়া অসম্ভব। আর যদি তাহারা স্বতন্ত্র অথচ সচৈতন্য হয়, তবে প্রত্যেক পরমাণু সতন্ত্র এবং সচেতন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদের সমষ্টিভূত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ সচেতন এবং স্বতন্ত্র ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এবং এই যুক্তিতেই প্রত্যেক পরমাণুকে অচেতন এবং অস্বতন্ত্র স্বীকার করিলে সমুদয় জগতকেই অচেতন ও অস্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বস্তুগত্যা আমরা এ দুএর একটিও দেখিতে পাই না। আমরা এই জগতের মধ্যে কতকগুলি সচেতন এবং কতকগুলি অচেতন পদার্থ দেখিতে পাই আর কতকগুলি স্বতন্ত্র এবং কতকগুলি পরতন্ত্র দেখিতে পাই। দেখ মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ সচেতন এবং গমনাদি কার্য্যে স্বতন্ত্র, তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানে গমন করিতে পারে,

যেখানে ইচ্ছা সেইখানে বসিতে পারে, যাহা ইচ্ছা তাহাই ভোজন করে। আবার দেখ বৃক্ষ এবং পর্ব্বতাদি করিয়া কতকগুলি পদার্থ অচেতন এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে গমনাদি কোন কার্য্যই লক্ষিত হয় না। তাহারা চিরকালই একস্থানে অবস্থিতি করে এবং লোকে তাহাদের উপর উৎপীড়ন করিলে তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই লক্ষিত হয় না। এক্ষণে দেখ মনুষ্য এবং বৃক্ষাদি উভয়ই পরমাণু সমষ্টি হইতে উৎপন্ন, তবে উভয়ের মধ্যে এরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয় কেন? অমরা এ দুয়ের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যাদি যতকাল জীবিত থাকে ততকালই তাহাদের চৈতন্য এবং স্বাতন্ত্র লক্ষিত হয়। কিন্তু মরণের পর সেই দেহ অবিকল থাকে অথচ তাহাতে চৈতন্য বা ইচ্ছানুযায়ী কোনরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, উহা বৃক্ষাদির ন্যায় একবারে জড়ভাব প্রাপ্ত; ইহার কারণ কি? অতএব আর কিছু যুক্তি থাকে ত বলুন এবং আমার কথাগুলি বিচার করিয়া দেখুন। বলুন দেখি—কুম্ভকারের চেষ্টায় যেমন ঘট একটি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বতোভাবে দোষ শূন্য এবং যেখানে যাহা আবশ্যক সেইখানে সেই দিয়া নির্ম্মিত এই জগৎ কার্য্য কাহার চেষ্টায় উৎপন্ন হইয়াছে? এবং পক্ষী যেমন চরণ দ্বারা তৃণাদি শূন্যের উপর ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলকে বিনা আধারে আকাশের উপর কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে? এই বিশ্বের সকল বস্তুতেই যে একটি নিয়মের শাসন দেখিতেছি, কোন্ বলবান্ ব্যক্তি সে শাসনের প্রবর্ত্তক। এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যে কাল নিয়ম আছে তাহারই বা কারণ কি? এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে অবশ্যই একজন সর্ব্বজ্ঞ জগৎকর্ত্তার অস্তীত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আত্মা বিষয়ে ন্যায় ও চার্ব্বাক দর্শন প্রভৃতির মত প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য দর্শনের মত প্রকাশিত হইতেছে। বৌদ্ধ মতে আত্মা বিজ্ঞান স্বরূপ ও ক্ষণিক। উক্ত বিজ্ঞান স্বপ্রকাশ, তাহার

প্রকাশক অন্য কোন পদার্থ নাই। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ও জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে সমস্তই বিজ্ঞানের আকার বিশেষ। বাস্তবিক বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইলে পদার্থ মাত্রেই জ্ঞান বা অনুভূতি সমষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং উক্ত বিজ্ঞান স্বরূপ আত্মা ক্ষণিক পদার্থ। অধিক কি এই বিশ্বচরাচরের যাবদীয় পদার্থই ক্ষণিক। যাহা সৎ তাই ক্ষণিক। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শরীর ও ক্ষণিক, ইহার প্রতিক্ষণে ক্ষয় বা উপচয় হইতেছে, সুতরাং উক্ত শরীর প্রতিক্ষণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন বাল্যে যে শরীর ছিল, বৃদ্ধাবস্থায় বা যৌবনে সে শরীর থাকে না, পূর্ব্ব শরীর বিনষ্ট হইয়া শরীরান্তর জন্মাইয়াছে, তাহার ন্যায় বৎসর, মাস, দিন, দণ্ড ও ক্ষণভেদে শরীর পৃথক পৃথক। যদিচ আপাততঃ ইহা অসঙ্গত বোধ হয় যে আমার কল্য বা পূর্ব্বক্ষণে যে শরীর ছিল অদ্য বা এইক্ষণে সেই শরীরই আছে, তবে কি করিয়া পূর্ব্ব শরীর বিনষ্ট হইয়া শরীরান্তর জন্মাইয়াছে? কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই আশঙ্কা সহজেই দূর হইতে পারে। মনেকরুণ আমাদের বাল্য শরীর হইতে যৌবন শরীরের বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উক্ত শরীর একদাই বৃদ্ধি হইয়াছে, কি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে? অবশ্যই বলিতে হইবে প্রত্যেক বৎসরেই কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার দেখুন এক বৎসরে শরীরের যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বৎসরের কোন এক দিবসে হয় নাই, অবশ্যই প্রত্যেক দিবসই একটু করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছে। এইরূপ এক দিবসে যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা অবশ্যই দিবসের কোন এক ক্ষণে বৃদ্ধি হয় নাই, অবশ্যই প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে আমাদের শরীরের প্রতিক্ষণেই অপচয় বা উপচয় হইতেছে। এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে পূর্ব্বক্ষণে শরীরের যেরূপ পরিমাণ ছিল পরক্ষণে কিছু বৃদ্ধি হওয়াতে সেরূপ পরিমাণ নাই, অবশ্যই কোন অংশের অন্যথা হইয়াছে; অতএব এক্ষণে দেখা উচিত বস্তুর পরিমাণগত, ধর্ম্মগত বা কোন অংশ বিশেষের অন্যথা হইলে সেই বস্তুকে পূর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথক্ বলা যাইতে পারা যায় কিনা? অবশ্যই বলিতে হইবে বস্তুগত বা ধর্ম্মগত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিলে তাহাকে অন্যবস্তু বলা যাইতে পারা

যায়। বিবেচনা করুন কোন একটা লম্বা বস্তুকে আপনি দুই খণ্ড করিলেন, এক্ষণে উক্ত দুই খণ্ড পূর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথক্ কি না? অবশ্যই স্বীকার্য্য যে তাহা পূর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথক্; কারণ, পূর্ব্ব লম্বমান বস্তু হইতে অভিনব বস্তুর পরিমানের হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং পৃথক্। পুনর্ব্বার ঐ একখণ্ড বস্তুকে দুই খণ্ড করিলে নূতন খণ্ডিত বস্তু পূর্ব্ব খণ্ডিত বস্তু হইতে পৃথক্ তাহাতে সন্দেহ কি? আরও দেখুন, কোন একটি মৃৎপিণ্ডকে ক্রমে মৃত্তিকা দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিলাম। এস্থলে কল্য যে মৃৎপিণ্ডের যেরূপ পরিমাণ ছিল, তৎপর দিবস পুনর্ব্বার তাহাতে মৃত্তিকা দিলে কখনই তাহার সেরূপ পরিমাণ থাকিল না, অবশ্যই তাহার পরিমাণের বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে দেখুন, কল্য যে মৃৎপিণ্ড ছিল তৎপর দিবস কি সেই মৃৎপিণ্ডই থাকিল? অবশ্যই তাহার পরিমাণগত বৈলক্ষণ্য হওয়াতে বস্তুরও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং কল্য যে মৃৎপিণ্ড ছিল অদ্য তাহা নাই। তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে বস্তুর পরিমাণগত বা গুণ গত বা ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হইলে বস্তুও বিভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তখন অবশ্য স্বীকার করা উচিত যে প্রত্যেক ক্ষণভেদে শরীরের পরিমাণের বৈলক্ষণ্য হওয়াতে শরীরও প্রত্যেক ক্ষণভেদে বিভিন্ন হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ অন্যান্য পদার্থেরও প্রত্যেক ক্ষণভেদে কোন অংশের অপচয় বা উপচয় হওয়াতে পদার্থ মাত্রেই ক্ষণিক তাহাতে সন্দেহ কি? এক্ষণে দেখা আবশ্যক যদি পদার্থ মাত্রেই ক্ষণভেদে বিভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তবে কিছু দিবস পূর্ব্বে একটি বস্তু দেখা গিয়াছে, পরে সেই বস্তুটি পুনর্ব্বার দেখিলে তখন বোধ হইয়া থাকে ইহা সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু; কিন্তু ইহা হইতে পারে না, কারণ আমি পূর্ব্ব যে বস্তুটি দেখিয়াছিলাম বাস্তবিক এক্ষণে সেবস্তুটি নাই, বস্তুস্তর জন্মাইয়াছে; সুতরাং "ইহা সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু" এইরূপ ব্যবহার হয় কি করিয়া? বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই এই আশঙ্কা দূর হইতে পারে। কারণ তৎসজাতিয় বস্তুতেও সেই বস্তু বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন কোন রোগী পূর্ব্ব দিবস কোন ঔষধ সেবন করিয়াছে, পর দিবস পুনর্ব্বার চিকিৎসকের নিকট গিয়া বলিয়া থাকে মহাশয়! আমাকে কল্য যে ঔষধ দিয়াছিলেন অদ্যও সেই ঔষধ

দিউম। বাস্তবিক এই স্থলে পূর্ব্ব দিবস যে ঔষধ খাইয়াছে তৎপর দিবস বস্তুত সেই ঔষধ নাই, ইহা জানিলেও তৎসজাতীয় ঔষধ দাও এইরূপ তাৎপর্য্যে "সেই ঔষধ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সজাতীয় বস্তুতেও সেই বস্তু বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং "সেই এই পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু" এই রূপ জ্ঞান হইবার কোন বাধা থাকিল না। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি শরীর প্রতিক্ষণেই ভিন্ন ভিন্ন তবে বাল্যদৃষ্ট বস্তু যৌবনে স্মরণ হয় কি করিয়া? বাল্যকালে যে শরীর ছিল যৌবনে সেই শরীর নাই সুতরাং বাল্য কাল দর্শন জন্য সংস্কারাশ্রয় বাল্য শরীরই হইয়াছে, সুতরাং যৌবনে তাহা স্মরণ হইতে পারে না। এস্থলে বৌদ্ধ গণ বলিয়া থাকেন যেরূপ কোন সুগন্ধি দ্রব্য সন্নিহিত অন্যবস্তুতেও যেমন সুগন্ধ সংক্রান্ত হয়, তাহার ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞান জন্য সংস্কারা- শ্রয় উত্তরোত্তর বিজ্ঞান হইয়া থাকে সুতরাং স্মরণের কোন অনুপপত্তি থাকিল না। অতএব বিজ্ঞানই আত্মা।

শূন্যবাদ মতাবলম্বি বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে বিজ্ঞানকে আত্মা বলা যায় না, কারণ উক্ত বিজ্ঞান বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকাল স্থায়ী, যখন ঐ বিজ্ঞানের বিনাশ হয়, তৎকালে আর কোন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, একমাত্র শূন্যই অনুভূত হয়। এবং এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র শূন্যই ও অন্তেও তাহাই থাকিবে। পরিদৃশ্যমাণ জগতেরও একমাত্র শূন্যে ভ্রান্তি হইতেছে, অতএব শ্রুতিও আছে "শূন্য মেবাসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন" সুতরাং শূন্যই আত্মা।

অন্যান্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, শূন্যে কখনই এই জগৎ প্রপঞ্চের ভ্রম হইতে পারে না, কারণ যাহার কোনই আকার নাই তাহাতে ভ্রম হইতে পারে না। যাহাতে ভ্রম হইবে সে বস্তুর আকার থাকা আবশ্যক। রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি হইয়া থাকে, এস্থলে রজ্জুর আকার আছে, সুতরাং তাহাতে সর্পের ভ্রান্তি হয়। কিন্তু যদি রজ্জুর কোন আকার না থাকিত তাহাতে সর্পেরও ভ্রান্তি হইত না। শূন্যের কোন আকার নাই সুতরাং জগতের ভ্রম হইতে পারে না। অতএব শূন্যকে আত্মা স্বীকার করা অসঙ্গত।

মীমাংসক মতে আত্মা আকাশাদির ন্যায় সর্ব্বব্যাপক ও চৈতন্য, সুখ,

দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। এবং যে বিমল তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা দুঃখাদির নাশ হয় সেই অবস্থার নামই মুক্তি।

ক্রমশঃ—

গীতা-শাস্ত্র।

প্রসন্ন চেতসোহ্যাসুবুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতি"

ভগবদ্গীতা।

সৌভাগ্যবশতঃ আমার কোন আত্মজ্ঞান নিরতা পরমারাধ্যতমা মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার তুল্য জ্ঞানবতী স্ত্রী বা জ্ঞানবান্ পুরুষ আমি এপর্য্যন্ত দেখিনাই। তাঁহার পাদপদ্মের সুসমা ও অলৌকিক মুখ কান্তি দেখিলে তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ বোধ হয় না; অতসী পুষ্পবর্ণা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা শরৎপ্রপূজিতা সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী ভগবতী দুর্গা বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বজন্মের শুভাদৃষ্ঠ বলে হঠাৎ আমার প্রতি সেই দেবীর অনুকম্পা হয়। আমি তাঁহার পবিত্র সমীপে ভগবদ্গীতার আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করি। তাঁহার করুণাবলে আমি ভগবদ্গীতার ষড় দর্শন সম্মত ছয়টি অর্থ ও যোগি সম্প্রদায়ে প্রচলিত পবিত্র জ্ঞানগম্যতার একটি অতি গুহ্যতম অর্থ অবগত হই। অদ্য হইতে সেই ষড় দর্শন সম্মত ব্যাখ্যা ষট্‌ক এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিব। আপাততঃ সেই গুহ্যতম অর্থটি অপ্রকাশিত থাকিবে। যদি পুণ্য ফলে পুনরায় সেই দেবীর পাদপদ্মের দর্শন লাভ হয়, আর ঐ অর্থ প্রচারের জন্য তিনি অনুমতি করেন; তবে অবশ্যই সেই ব্যাখ্যা যাহাতে সাধারণে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিব। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন এই ষড় দর্শন সম্মত ব্যাখ্যা সঙ্ক্ষেপে লিখিত হইবে। আগামি মাসের পত্রিকায় (সময় সঙ্কীর্ণ না হইলে) সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় বিস্তীর্ণ-রূপে ব্যাখ্যা লিখিব এইরূপ ইচ্ছা রহিল। গীতার এই অর্থ প্রচার করিবার পূর্ব্বে সেই পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া স্ত্রী বিগ্রহধারিণী দেবীর পাদপদ্মে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গে ও "সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে” এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অসংখ্য প্রণাম করিলাম। হয়ত অনেকেই সেই দেবীর দর্শনের জন্য তাঁহার পরিচয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইবেন ও আমাকে উপর্য্যুপরি নানা প্রশ্নে ব্যস্ত করিবেন। কিন্তু সেইজন্য আমি সেবিষয়ে পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিতেছি, কেহ তাঁহার পরিচয় লাভের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না; কারণ তাঁহার অনুমতি ব্যতিরিক্ত আমি কোন কথাই বলিতে পারিব না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি আপনিই আপনার পরিচয় প্রদান করিবেন। কেহই যে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করেন্ নাই, এরূপ নহে; কেবল তাঁহার ইচ্ছা ছিল না বলিয়া কেহ চিনিতে পারেন্ নাই। আমি বিগত বর্ষে ৺ বারাণসী ক্ষেত্রে ৺অন্নপূর্ণার মন্দিরে যে কয়েক দিন গিয়াছি, প্রায়ই তাঁহাকে সেইস্থানে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহাতে আর অন্নপূর্ণাতে আমি কোন প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারিনাই। ভগবদ্গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়েরও কিয়দংশের ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥

সেইরূপ কৃপাদ্বারা আবিষ্ট অশ্রু পরিপূর্ণ—বিহ্বল চক্ষু বিষাদগ্রস্ত সেই অর্জ্জুনকে মধুসূদন (১) (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াছিলেন।

---

(১) মধু শব্দের অনেক অর্থ। মক্ষিকা-সঞ্চিত পেয় পদার্থ বিশেষ, পুষ্প রস, জল, দৈত্য বিশেষ ইত্যাদি। সূদ্ ধাতুর অর্থ ক্ষরণ, সঞ্চরণ, নিবাস, চ্ছেদ। মধু নামক দৈত্যের ছেদন করিয়াছেন বলিয়া ইঁহার নাম মধুসূদন। মধুদৈত্যের বিনাশ দ্বারা ভগবান্ পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য শত্রু সংহারী নারায়ণ শত্রু বিনাশে অর্জ্জুনকে প্রবৃত্ত করিতেছেন। ক্ষীরোদ-সলিলে ইঁহার নিবাস (শয়ন) বলিয়াও ইনি মধুসূদন। তাৎপর্য্য, সেই সময়ে ভগবান্ স্বনাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি করিয়াছেন; সুতরাং বেদ অপেক্ষাও ইঁহার উপদেশ অধিক গ্রাহ্য; এই জন্য ইনি “যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং” ইত্যাদি বলিয়া বেদ প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞান কাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং সে বিষয়ে শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার মুখপদ্ম হইতে নিয়ত মধু ক্ষরিত হইতেছে; এ জন্যেও ইনি মধুসূদন। তাৎপর্য্য, ভগবদ্গীতার সমস্ত বাক্যই মধুময়; ইতোঽধিক মিষ্টতা

শ্রীভগবানুবাচ।

শ্রীভগবান্ কহিয়াছিলেন।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতের ব্যাখ্যা।

"ভগবান্" শব্দের অর্থ নিত্যেচ্ছা, নিত্য-কৃতি (যত্ন), নিত্যজ্ঞান-শালী—পুরুষ। ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত জীবাত্মাতে নিত্য ইচ্ছা, নিত্যযত্ন ও নিত্যজ্ঞান নাই। ভগ শব্দের অর্থ ইচ্ছা (১) কৃতি ও জ্ঞান। (২) বৈয়াকরণের মতানুসারে "মতুপ্" (৩) "বতুপ্" প্রভৃতি প্রত্যয়ের অর্থ, যে পদের পরবর্ত্তী, সেই সেই প্রত্যয় করা যাইবে; তাহার (সেই পদার্থের) বহুত্ব, নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যসম্বন্ধ, বা আতিশয্য বুঝাইয়া সেই পদার্থের সম্বন্ধ বুঝাইবে। কোন স্থলে সামান্য সম্বন্ধও বুঝায়, ব্যাকরণের সঙ্কেত অনুসারে "নিত্যযোগ" (নিত্যসম্বন্ধ), ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেকাল পর্য্যন্ত একসম্বন্ধী পদার্থ অবস্থিত থাকিবে, অপর সম্বন্ধী পদার্থও সেই কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধি পদার্থে সম্বন্ধ থাকিবে। একের অভাবে অপর পদার্থ থাকিবে না। এস্থলে "ভগ" শব্দের সহিত "বতুপ্" প্রত্যয়ের যোগ করাতে "যে ঈশ্বরের সমান কাল পর্য্যন্ত "ভগ" শব্দ প্রতি পাদ্য

আর কোন পদার্থে নাই। ভগবান্ জল ও মধুতে মাধুর্য্যরূপে বা জলত্ব ও মধুরত্বরূপে সঞ্চরণ করেন বলিয়াও ইনি মধুসূদন। বিশ্বরূপ জগদীশ্বরের সকলই বিভূতি, সকলই ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বর ভিন্ন কোন পদার্থই নাই। জলের জলত্ব বোধকপ্রমাণ "রসোঽহমপ্সু" ইত্যাদি। "প্রাণস্য প্রাণ মুত, চক্ষুষঃ চক্ষুরত্র, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমুত, মনসো যে মনো বিদুঃ"। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, মনের মনঃ; সুতরাং তিনিই জলরূপে জলে সঞ্চরণ করেন।

(১) ভগঃ শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্য্যযত্নার্কর্ককীর্ত্তিষু। অমরকোষ।

(২) ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য, যশঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতি স্মৃতং।

(৩) ভূম, নিন্দা, প্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়ামমী-মত্বা দয়োমতাঃ। এই কারিকাটি কলাপব্যাকরণের বৃত্তিকার দুর্গসিংহের রচিত। মুগ্ধবোধের টীকায় এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদীতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। কলাপের মতে এই প্রত্যয় গুলির নাম "মন্ত" "বন্ত" ইত্যাদি, মুগ্ধবোধ মতে "মতু" "বতু" পাণিনি মতে "মতুপ্" "বতুপ্"।

ইচ্ছা, যত্ন ও জ্ঞানের অবস্থিতি বুঝাইতেছে। ঈশ্বর নিত্য; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা প্রভৃতিও নিত্য। "বতুপ্" প্রত্যয় দ্বারা ঈশ্বরের সহিত জ্ঞানাদির ভেদ বুঝাইতেছে. ভেদ না হইলে সম্বন্ধ হয় না; সুতরাং বৈদান্তিকেরা যে ঈশ্বরকে "জ্ঞানস্বরূপ" "আনন্দস্বরূপ" প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, তাহা এতদদ্বারা নিরাকৃত হইল। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ নহেন; প্রত্যুত তিনি জ্ঞানবান্ (জ্ঞানাশ্রয়) ও আনন্দবান্ (আনন্দাশ্রয়)। (৪) বেদে ঈশ্বরকে "সর্ব্বজ্ঞ" (৫) ও "সর্ব্ববিৎ" বলিয়াছেন। বেদের কোন স্থলে আবার ঈশ্বরের "আনন্দ" (৬) ও ঈশ্বরকে "আনন্দভুক্" (৭) বলা হইয়াছে। দুই একস্থলে "জ্ঞান" "আনন্দ" "ব্রহ্ম" এই তিনটি পদেতেই এক বিভক্তির (৮) নির্দ্দেশ আছে বলিয়া আপাততঃ জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ অর্থ হইতে পারে; কিন্তু সে স্থলেও "মতুপ্" "বতুপ্" প্রত্যয়ের ন্যায় "আনন্দ" আছে যাহার, "জ্ঞান" আছে যাহার এই অর্থে "অচ্" প্রত্যয় করা হইয়াছে। কারণ সেই শ্রুতিতে "আনন্দং" এইরূপ ক্লীবলিঙ্গের ন্যায় নির্দ্দেশ দেখা যায়; বাস্তবিক "আনন্দ" শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক (৯) এবং অজহ-ল্লিঙ্গ শব্দ। সুতরাং ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম শব্দের বিশেষণ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দেশ হইতে পারে না। ভগ শব্দের অপর অর্থ মাহাত্ম্য অর্থাৎ মহাত্মতা; মহাত্মতা অর্থাৎ পরমাত্মতা। "সুতরাং ভগবান্" শব্দে পরমাত্মতাবান্ অর্থাৎ পরমাত্মা বুঝাইতেছে। আত্মা দ্বিধা বিভক্ত; পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মা মনুষ্য প্রভৃতি চেতন

---

(৪) যদিও ন্যায়মতে ঈশ্বরের গুণের অধিকার ও সুখের উল্লেখ নাই তথাপি নানাস্থানের লিপি দেখিলে বুঝাযায় যে ঈশ্বরে নিত্য সুখ আছে। "প্রীতেঃ সুখস্ত রূপেণ বিষ্ণুপ্রীত্যাদৌ তদসম্ভবাৎ, জন্ত সুখাদেস্তত্র তাবৎ"। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী। অথবা শ্রুতিস্থ "আনন্দ" শব্দের দুঃখাভাবে লক্ষণাকরা হইয়াছে, "আনন্দোঽপি দুঃখাভাবে উপচর্য্যতে ভারাদ্যপগমে সুখী সংবৃত্তোঽহমিতিবৎ দুঃখাভাবেন সুখিত্ব প্রত্যয়াৎ"। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

(৫) "যঃসর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"।

(৬) "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"।

(৭) "আনন্দভুক্ চেতো মুখঃ প্রাজ্ঞঃ"।

(৮) "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"।

(৯) স্যাদানন্দথুরানন্দঃ শর্ম্মশাথ সুখানিচ। অমরকোষ।

পদার্থের আত্মা। পরমাত্মা এক, জীবাত্মা অনন্ত। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই নিরাকার। জীবাত্মার অদৃষ্ট (ধর্ম্মাধর্ম্ম) আছে বলিয়া সেই অদৃষ্টের ফল ভোগের জন্য জীবাত্মার শরীর পরিগ্রহ হয়। পরমাত্মার (ঈশ্বরের) অদৃষ্ট (পাপ পুণ্য) নাই; সুতরাং শরীর পরিগ্রহের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার সংসারিক-আত্মার ন্যায় শরীর পরিগ্রহের কারণ কি? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন যে, চতুর্দ্দিকে এই পরিদৃশ্যমান যে যে পদার্থ দেখিতেছ, এ সমস্তই আমাদিগের ভোগ্য; সুতরাং দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ডপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই আমাদিগের অদৃষ্ট জন্য। এই সকল পদার্থের সৃষ্টি না হইলে আমাদিগের উপভোগের সামগ্রী থাকিত না; উপভোগের সামগ্রী না থাকিলে অদৃষ্টের ফল ভোগও হইত না। সেইরূপ ঈশ্বরের অদৃষ্ট না থাকিলেও আমাদিগের অদৃষ্টানুসারেই ঈশ্বরের শরীর পরিগ্রহ হয়। ঈশ্বরের শরীর গ্রহণ না হইলে, কি করিয়া আমাদিগের এই ভোগ্য পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইত! আমাদিগের পাপ পুণ্যের তারতম্যানুসারে কে আমাদিগকে সুখ দুঃখের প্রদাতা হইতেন! পূর্ণজ্ঞানগর্ভ বেদের রচনা করিয়া কে আমাদিগকে (১) সদুপদেশ প্রদান করিতেন! সেই জন্য আমাদিগের ভোগ্য বিষয়ের ভোগ সাধক শরীরের সৃষ্টি করিবার জন্য আমাদিগের পাপ পুণ্য বিচারের জন্য, বেদের রচনার জন্য, নানা প্রকারে আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, পরম কারুণিক পরমেশ্বর শরীর গ্রহণ করিয়াছেন (২)। এ বিষয়ের আগম (শব্দ) রূপ প্রমাণন্তর ও আছে, এই ভগবদ্গীতাতেই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "আমি সাধু (পুণ্যবান্) দিগের পরিত্রাণের জন্য

---

(১) কার্য্যায়োজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ; শ্রুতেঃ। বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদব্যয়ঃ।

কুসুমাঞ্জলি।

(১) ছন্দাংসি জজ্ঞিরেতস্মাৎ। শ্রুতি।

(২) ঈশ্বরঃ কারুণিকঃ সর্গাদাবস্মদাদ্যদৃষ্টা কৃষ্টকাঠকাদিশরীরবিশেষমধিষ্ঠায় বাং বাং শাখামুক্তবান্; তস্মাঃ শাখারাস্তন্নাম্না ব্যপদেশঃ। কুসুমাঞ্জলি-হরিদাস।

দুষ্কৃত (পাপী) দিগের বিনাশের জন্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি"। (৩) ইহা দ্বারাও প্রমাণ হইয়াছে যে, ঈশ্বর আমাদিগের পাপ পুণ্যের ফল দানের জন্ত ও সদুপদেশ প্রদানের জন্ত শরীর পরিগ্রহ করেন। সাক্ষাৎ শ্রুতিতেও আছে (৪) ঈশ্বর মায়া (নিখিল আত্মার অদৃষ্ট) দ্বারা নানা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অপর-শ্রুতিতে আছে "আমি বহু মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করিব" (১)। আবার শ্রুতি বলিতেছেন, সেই পুরুষ পক্ষী হইয়া (পক্ষীর ন্তায়) শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন (২)। ফল বেদে নানা স্থানে ঈশ্বরের নানা মূর্ত্তির কথা লিখিত আছে; বাহুল্য ভয়ে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। নানা মূর্ত্তির উল্লেখ থাকিলেও প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন সংসারি-আত্মার ন্তায় ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন নহেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও অন্তান্ত শ্রুতিতে (৩) এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, ঈশ্বরের নানা সময়ে বা এক সময়ে নানা শরীর হইলেও ঈশ্বর এক, অভিন্ন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই বিভু (৪) অর্থাৎ সমস্ত মূর্ত্ত (মূর্ত্তি বিশিষ্ট) পদার্থের সহিত সংযুক্ত। এ অংশে জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কোন ইতর বিশেষ নাই। আমার আত্মার আমার শরীরের সহিত যেরূপ সংযোগ; অন্তশরীরের সহিত ও আমার আত্মার সেইরূপ সংযোগ আছে। অন্তদীয় শরীরের ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে আমার প্রত্যক্ষ না হইবার কারণ আমার আত্মার আমার শরীরের ও অন্ত শরীরের সহিত তুল্যরূপ সংযোগ

---

(৩) পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

(৪) ইন্দ্রো (ঈশ্বরঃ) মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।

(১) অহং বহুস্তাং প্রজায়েয়ং।

(২) পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরঃ পুরুষ অবিশৎ।

(৩) একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ যথাহ্যয়ং জ্যোতিরিবাত্মা বিবস্বানপোভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষবমজোহয়মাত্মা পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ ইত্যাদি। স একো বহুধা নিবিষ্টঃ একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ত্বমেকোহসি বহুতবং প্রবিষ্টং ইন্দ্রস্তাপ্রাণং শতধা চরন্তং একঃ সন্ বহুধা বিচচার।

(৪) স বা এষ মহানজ আত্মা। শ্রুতি।

সম্বন্ধ থাকিলেও আমার শরীরের সহিত আমার আত্মার আর একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইল, আমি সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অন্য শরীরে অন্যান্য আত্মার সেই সম্বন্ধ নাই বলিয়া বিষয়ের সহিত তৎ শরীরস্থ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। আমার শরীরে আমার অদৃষ্ট জন্য আমার বিষয় ভোগের সাধকতা আছে; অন্য শরীরে এই সম্বন্ধটি নাই। ঈশ্বরের অদৃষ্ট নাই সুতরাং ঈশ্বরীয় শরীরের সহিত ঈশ্বরের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। আমাদিগের অদৃষ্টানুসারেই ঈশ্বরের শরীর পরিগ্রহ হয়, গতিকেই ঈশ্বর প্রয়োজনানুসারে একসময় বহু শরীর গ্রহণ করিয়া বহুকার্য্য সাধন করিতে পারেন। ঈশ্বরের সকল শরীরেই তুল্য সম্বন্ধ।

পাতঞ্জল মতের ব্যাখ্যা।

ভগ শব্দের অর্থ জ্ঞান, (১) "বতুপ্" প্রত্যয়ের অর্থ অতিশায়ন, (আতিশয্য) (২)। যে পুরুষে (৩) নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ববীজ, অর্থাৎ অত্যন্ত জ্ঞান (৪) আছে; তিনিই ভগবান্। এই জীব জগতে একটু নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝাযায় যে, ক্রমে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানের তারতম্য উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে। এই মনুষ্য অপেক্ষা পশু পক্ষী,

---

(১) চিহ্নিত টীকাদেখ।

(২) অমুক পৃষ্টার৩ চিহ্নিত টীকা দেখ।

(৩) "তত্র নিরশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজং"। পাতঞ্জল সূত্র।

(৪) "সর্ব্বজ্ঞত্ব বৎবীজং জ্ঞাপকং নিরতিশয়ং জ্ঞানং তত্তত্রতস্মিন্ ভগবতি অস্তী-ত্যন্বমীয়তে। বৃত্তি।

আবার পশুপক্ষী অপেক্ষা কীট, পতঙ্গ, আবার কীট পতঙ্গ অপেক্ষা কীটাণুর জ্ঞানের অল্পতা ও অপকর্ষতা দেখা যায়; আবার নিম্নাভিমুখ ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধদিকে কেবল মনুষ্য সমাজের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ক্রমে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানের উৎকর্ষ। একেবারে পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি অপেক্ষা আর্য্যজাতির সহিত সংস্পৃষ্ট জাতির অধিক জ্ঞান, আবার সেই সংস্পৃষ্ট জাতি অপেক্ষা আর্য্য জাতির অধিক জ্ঞান। আবার জাতিগত জ্ঞানের ন্যায় ব্যক্তিগত জ্ঞানেরও তারতম্য আছে। আমার যে জ্ঞান আছে; তদপেক্ষা তোমার জ্ঞান অধিক। আমার যে, যে বিষয়ে ভ্রম ও প্রমাদ আছে, তোমার সে সে বিষয়ের ভ্রম ও প্রমাদ নাই। আমি যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; তুমি তদপেক্ষা অধিক অধ্যয়ন করিয়াছ। আমি যে যে দেশ দেখিয়াছি; তদপেক্ষা তুমি অধিক দেখিয়াছ। আমার যে যে মনুষ্যের সহিত পরিচয় আছে, তদপেক্ষা তোমার অধিক মনুষ্যের সহিত পরিচয় আছে। আমার যে ঔষধি বা অন্য তরু, লতা, পুষ্প, বা প্রাকৃতিক পদার্থ বা প্রাণী পরিচিত! তদপেক্ষা তোমার অধিক পরিচিত; সুতরাং আমা অপেক্ষা তোমার জ্ঞান অধিক। এইরূপ তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মনুষ্য ও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের মনুষ্য; তদপেক্ষা আবার অধিক জ্ঞানী? সে জ্ঞানী অপেক্ষা আবার অধিক জ্ঞানী এইরূপ উত্তরোত্তর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমাদিগের এক ব্যক্তিতেও ক্রমে জ্ঞানের উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা দেখা যায়, বাল্যকালে আমাদিগের যে জ্ঞান ছিল; তুলনা করিলে দেখা যায়, এক্ষণে তদপেক্ষা আমাদিগের উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে, এ জ্ঞান অপেক্ষা আবার বাল্যকালের জ্ঞান অপকৃষ্ট। এই সকল ভূয়ো দর্শনে আমরা জ্ঞানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে অবধারণ করিতেছি। যে যে পদার্থের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে; সেই সেই পদার্থের উৎকর্ষের সীমা ও অপকর্ষের সীমা আছে। কীটাণুতে বা ঔদ্‌ভিদে (১) জ্ঞানের অপকর্ষের সীমা দেখা যায়, তদ্‌পেক্ষা আর জ্ঞানের অপকর্ষ নাই; কারণ তৎপরেই জড় জগৎ। জড় জগতে আর জ্ঞানের কোন চিহ্ন দেখাযায় না; সেইরূপ জ্ঞানের উৎ

---

(১) আর্য্যশাস্ত্র মতে বৃক্ষাদির জ্ঞান আছে।

কর্ষের একটা শেষ সীমা আছে; সেই উৎকর্ষের শেষ সীমাবস্থিত নিরতিশয় জ্ঞানের সত্তা কোথায়? তাদৃশ জ্ঞানশালী পুরুষ কে? সেই জ্ঞান শালী পুরুষই আমাদিগের পরমারাধ্য পরমেশ্বর। ভগবদ্গীতায় গ্রন্থকার "ভগবান্" শব্দের উল্লেখ করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধির একটি পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বলবৎ প্রমাণ (অনুমান) প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগ শব্দের অন্যান্য অর্থ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য (কর্তৃত্ব) যশঃ শ্রী ও বৈরাগ্য এগুলি লইলেও সেই সেই পদার্থের আতিশয্য বুঝিতে হইবে।

ক্রমশঃ

কলিকাতাস্থ ধর্ম্মসভা।

আমরা একটি নূতন প্রস্তাব অবলম্বন করিতে সংকল্প করিয়াছি। কলিকাতায় অনেক গুলি ধর্ম্মসভা আছে। কিন্তু পরস্পর কাহারও সহিত কোনরূপ সহানুভূতি নাই, কার্য্যেরও কোন রূপ শৃঙ্খলা নাই। যাহাতে অত্রস্থ যাবতীয় ধর্ম্মসভা একযোগে কার্য্য করিতে সমর্থ্য হন, তাহারই আয়োজন হইতেছে। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে কোন এক শুভদিনে আমরা এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। বঙ্গের প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক উক্তদিবসে সমবেত হইতে সানন্দে স্বীকৃত হইয়াছেন। পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি মহোদয়গণের পরামর্শেই আমরা এই উদ্যোগে বৃতি হইলাম।

যাঁহারা পত্রের উত্তর প্রত্যাশায় সর্ব্বদা পত্র লেখেন তাঁহারা যেন রিপ্লাই—কার্ডে পত্র লেখেন। নচেৎ উত্তরের আশা করিবেন না। বে, সং।
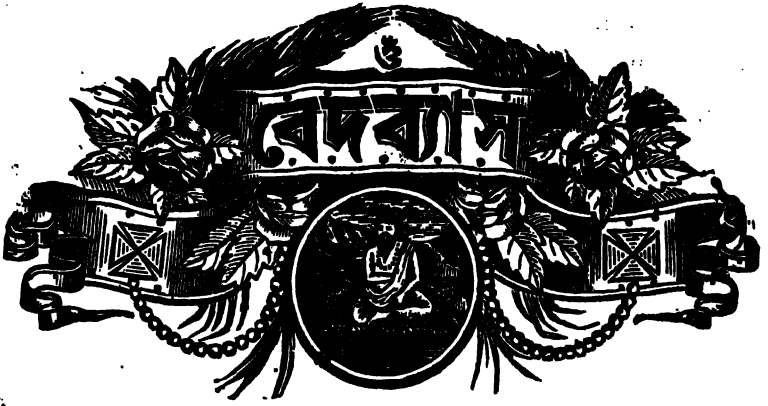
৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ৫ম খণ্ড।

মায়ামোহ।

এই উপাখ্যানটী বিষ্ণুপুরাণ হইতে সংকলিত হইল। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুপুরাণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজনীয়। পুরাণ গুলি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, ও মন্বন্তর এই কয়টী প্রধানতঃ পুরাণের আলোচ্য। কিরূপে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, দক্ষাদিপ্রজাপতিগণ এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিরূপে ঐ সৃষ্টির বিস্তার হইয়াছিল, কিরূপে ও কোন্ কোন্ বংশ দ্বারা ও কোন্ কোন্ মহাপুরুষ দ্বারা ঐ সৃষ্টির রক্ষা হইয়াছিল, হইতেছে ও হইবে, এবং কিরূপে কোন কল্পে ঐ সৃষ্টির বিনাশ হইবে, এতৎ সমস্তই পুরাণের বিষয়।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ॥"

পুরাণ অষ্টাদশ, যথা—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্ক-ণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, ও ব্রহ্মাণ্ড। এতন্মধ্যে ব্রাহ্মপুরাণ সর্ব্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল।

"আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।"

তৎপরে, পাদ্ম, তৎপরে বৈষ্ণব, ইত্যাদি যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত পুরাণ গুলি পরেপরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় স্থানীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে সকল পুরাণের প্রতিই লোকের আস্থা বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এবং এইরূপ যে হইবে তাহা পুরাণকারগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন।

যঃ কার্ত্তবীর্য্যো বুভুজে সমস্তান্,
দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্রঃ,
কথাপ্রসঙ্গে ত্বভিধীয়মানঃ,
স এব সঙ্কল্প বিকল্প হেতুঃ।

"যে কার্ত্তবীর্য্য অরাতিকুল বিনাশ করিয়া সদ্বীপা সাগরান্তা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে কেহ বলিবে যে তিনি ছিলেন, আবার কেহ বা তাঁহার সত্বা পর্য্যন্তও অস্বীকার করিবে।" সে যাহা হউক পুরাণের সময় নির্দ্ধারণ দ্বারা অন্ততঃ ইহা জানা যায়, যে বিষ্ণুপুরাণ নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ নহে। এই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থে ম্লেচ্ছ যবনাদির রাজত্বের বিষয় বর্ণিত আছে। এবং ইহাও লিখিত আছে যে কলিতে ম্লেচ্ছেরা আচার্য্য হইবেন—"ম্লেচ্ছাশ্চাচার্য্যাশ্চ"; যাহাকে যাহার মনে লাগিবে সেই তাহাকে বিবাহ করিবে—"অভিরুচিরেব দাম্পত্য সম্বন্ধ হেতুঃ"; মিথ্যা কথা বলিলেই আদালতে জয় হইবে—"অনৃতমেব ব্যবহারজয়হেতুঃ"; ভারতবর্ষের প্রজারা করভারে প্রপীড়িত হইয়া পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিবে "অতি লুব্ধকরভারাসহাঃ শৈলানা মন্তরা দ্রোণীঃ প্রজাঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি"। শ্রীধর স্বামী এই সমস্ত শ্লোকের টীকা করিয়াছেন। সুতরাং দুই একজন "ঈশ্বরানুগৃহীত" ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে সাহস করিবেন না। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণে যে কত শত রাজপুত্রের নাম বর্ণিত আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বংশচরিত বর্ণনাস্থলে কল্পনার বিন্দুমাত্র ও আভাস পাওয়া যায় না। "তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র গোভানু, গোভানুর পুত্র ত্রৈশাম্ব" এইরূপে ঘটকের কুলপঞ্জিকার ন্যায় যে কত নামই আছে তাহা বলা যায় না।' এ সবই কি কল্পনা? অথবা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, দ্রৌপদী ইহাঁরা যদি কেহবা বীরত্বের কেহ

বা নিষ্কামধর্ম্মের কল্পনা হন, তবে ত ইঁহারা কোন্ ছার? ফলতঃ বিশ্বাসীর নিকট বিষ্ণুপুরাণ প্রজাবত্তা, দূরদর্শিতা, ধর্ম্মভীরুতা, প্রভৃতির আকর স্বরূপ। কিন্তু অবিশ্বাসীর নিকট ইহা কবি কল্পনা ও উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র।

সে যাহা হউক, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়েই মায়ামোহের উপাখ্যান পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইবেন। এই ঘটনাটী ঐতিহাসিক অথবা কাল্পনিক তদ্বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। যিনি যে ভাবে কেন ইহার আলোচনা করুন না, তিনিই ইহা হইতে অশেষ কল্যাণকর হিতোপদেশ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। উপাখ্যানটী এই।—

একদা দেবাসুরে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ সংগ্রামে হ্রাদ, পুরোগম প্রভৃতি অসুরগণ দেবতাদিগকে সম্পূর্ণরূপ পরাজিত করিলেন। তখন দেবগণ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরতীরে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন, এবং নিম্ন লিখিতরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। "হে বিষ্ণো! তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র অধীশ্বর; কে তোমার স্তব করিতে পারে? তোমার মহিমার সীমা নাই। হে বিষ্ণো! তুমি ব্রহ্মারূপে তোমার নিজ নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়া জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবরূপে ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য রুদ্র প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি দৈত্যরূপে তিতিক্ষা দমপ্রভৃতি গুণ পরিবর্জ্জন করিয়া দম্ভ, অবিবেক প্রভৃতি গুণ অবলম্বন করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি যক্ষরূপে অজ্ঞান আশ্রয় করিয়া গীতবাদ্যাদিতে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি নিশাচররূপে ঘোর অসিতরূপ ধারণ করিয়া ক্রৌর্য্য ও মায়া দ্বারা আপনাকে কলঙ্কিত করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি ধর্ম্মরূপে ধার্ম্মিকদিগকে স্বর্গসুখ উপভোগ করাইতেছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি সিদ্ধরূপে অনায়াসে জল অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে গমন ও অবস্থান করিতে পার; তোমাকে নমস্কার। তুমি দ্বিজিহ্ব সর্পরূপে অতিতিক্ষা, ক্রূরতা, বিলাস প্রভৃতি আশ্রয় কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঋষিরূপে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ শান্ত, বুদ্ধ আকার ধারণ কর; তোমাকে নমস্কার। তুমি কালরূপে সমস্ত বিশ্বসংসার গ্রাস কর; তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্ররূপে সমস্ত সংসার গ্রাস করিয়া তাণ্ডবে প্রবৃত্ত হও, তোমাকে নমস্কার। তুমি নররূপে রজোগুণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তোমাকে নমস্কার।" এইরূপে স্তব সমাপ্ত হইলে বিষ্ণু দেবগণের সমীপে অবতীর্ণ

হইলেন। দেবগণ বিষ্ণু সমীপে নিজ প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"হে বিষ্ণো! দৈত্যগণ বর্ণধর্ম্মাশ্রিত, বেদ মার্গাবলম্বী, এবং তপস্যান্বিত। তাহাদিগকে আমরা বধ করিতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি ইহার কোনরূপ উপায় বিধান করুন।"

বিষ্ণু শুনিয়া বলিলেন—"দৈত্যেরা বধ্য বটে। আমি ইহার উপায় বিধান করিতেছি।"

কেন? নিরপেক্ষ ব্রহ্মের একি বিচার? তাঁহার নিকট দেব দৈত্য উভয়েই তুল্য। তিনি একের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্যের সর্ব্বনাশ করিবেন কেন? বিষ্ণু নিজেই তাহার উত্তর দিতেছে। বিষ্ণু বলিতেছেন "সৃষ্টি রক্ষার জন্য আমি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার দিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছি। যতদিন ইহারা একে অন্যের অধিকারের উপর হস্তার্পণ না করে, ততদিন ইহারা সকলেই আমার রক্ষণীয়। কিন্তু যে অন্যের বস্তু নিজে গ্রাস করে সে চিরকালই আমার বধ্য।"

"স্থিতৌ স্থিতস্য মে বধ্যা যাবন্তঃ পরিপন্থিনঃ"

বাণিজ্য বিস্তারই বল, ধর্ম্ম প্রচারই বল, জীবের সংগ্রামই বল, যে কারণেই হউক না কেন, অন্যের অধিকারে হস্তার্পণ করিলে নিজের অধিকার পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয়। রাজা প্রজার অধিকারে হস্তার্পণ করিলে রাজার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। এমন কি ঈশ্বর নিয়মে বাধ্য হইয়া সমুদ্রকেও নিজের অধিকারে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সূর্য্যও নিজ অধিকার হইতে কোনমাত্র বিচলিত হইতে পারেন না। দৈত্য বিষ্ণুর বধ্য; কেন না, দৈত্য নিজ অধিকার পাতালভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেবাধিকৃত স্বর্গভূমি অধিকার করিয়াছে। দেব ও দৈত্যে প্রভেদ এই যে দেব নিজ অধিকার লইয়াই সন্তুষ্ট। দৈত্য অন্যাধিকার আক্রমণে সততই ব্যস্ত। তবে দেখা যাইতেছে যে দৈত্য বধ্য বটে। কিন্তু দৈত্যবধের উপায়ের নিমিত্ত বিষ্ণু নিজ দেহ হইতে মায়ামোহ নামে একটী প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। দৈত্যগণ নর্ম্মদাতীরে তপস্যা করিতেছেন; এমন সময়ে মায়ামোহ তাহাদের সমীপে উপস্থিত। মায়ামোহ পরম ধার্ম্মিকের বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়াছেন। তিনি দিগম্বর, মুণ্ডিত মস্তক ও ময়ূর-পুচ্ছ-ধারী। ধার্ম্মিকের বেশ ধারণ না করিলে ধার্ম্মিককে প্রতারণা করা যায় না। মায়ামোহ দৈত্যগণকে মধুর বচন দ্বারা সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন।

"ভো দৈত্যপতয়ো ব্রত যদর্থং তপ্যতে তপঃ"

ওহে দৈত্যপতিগণ! তোমারা কিজন্য তপস্যা করিতেছ তাহা আমাকে বল? এই "কেন"ই সন্দেহ-বীজের অঙ্কুর স্বরূপ। বিশ্বাসীকে বিচলিত করিবার ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। সাংসারিক বিষয়েরও যেদিন মনে "কেন" উপস্থিত হয়, সে দিন হইতেই অল্পে অল্পে বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য সমুৎপন্ন হইতে থাকে। আমি যে এই পরিবার পতিপালনে যত্ন করিতেছি, ইহা "কেন" করি? "কেন" র উত্তর দেওয়া অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত নহে। যাঁহারা অল্পবুদ্ধি তাঁহাদের মনে "কেন" উপস্থিত হইলেই সর্ব্বনাশ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে "কেন" র উত্তর দেওয়া আরও কঠিন। উত্তর দিতে না পারিলেই প্রথমে সন্দেহ ও পরে অবিশ্বাস জন্মে। সক্রেটিস যে নিজে অধার্ম্মিক বা অসৎ ছিলেন তাহা নহে। তিনি যে কাহাকেও কুধর্ম্ম বা কুনীতি শিক্ষা দিতেন তাহাও নহে। তথাপি তাঁহার "কেন" র প্রভাবে যুবকেরা ধর্ম্ম ও নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিল। "দয়া কি" "উহা দয়া কেন" ইত্যাদি প্রশ্নে যুবকের মন বিচলিত হইল। এবং উঁহারা দয়া পরিত্যাগ করিল। "কেন" বলিলেই মনোমধ্যে এক কোলাহল উপস্থিত হয়। ঐ কোলাহল হইতে আত্মরক্ষা করা অতিশয় দুরূহ, একরূপ অসম্ভব।

প্রথমে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া পরে মায়ামোহ ভেদবুদ্ধি জন্মাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তোমরা যাহা যাহা বিশ্বাস কর, তাহার সমস্তই যে ধর্ম্ম, বা সমস্তই যে অধর্ম্ম তাহা নহে। তাহার মধ্যে এই এই টুকু ধর্ম্ম, এই এই টুকু অধর্ম্ম, এই এই টুকু কার্য্য, এই এই টুকু অকার্য্য।" এই ভেদ-বুদ্ধি অবিশ্বাসের প্রধান অবলম্বন। যে একটু অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কালে আদ্যোপান্ত সমস্তই অবিশ্বাস করিবে। সর্পবিষ শরীরের এক অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত অঙ্গে সঞ্চারিত হয়। যখন দৈত্যদের মধ্যে অবিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে সঞ্চারিত হইল, তখন নিন্দা আরম্ভ হইল।

"কেচিদ্বিনিন্দাং বেদানাং দেবানা মপরে দ্বিজ।
যজ্ঞকর্ম্ম কলাপস্তু তথান্যে চ দ্বিজন্মনাং॥"

কেহ বা বেদের, কেহ বা দেবের, কেহ বা যজ্ঞের, কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল। সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইল।

নিন্দার পরে পরিহাস। "হিংসা অর্থাৎ পাপ করিলে পুণ্য হয়!"

"আগুনে ঘি পোড়ালে ধর্ম্ম হয়!" "অনেক যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন; হ'য়ে খেলেন কি? না শমীকাষ্ঠ। এমন ইন্দ্র অপেক্ষা পশুরাও ভাল, কেননা তাহারা কোমল পত্রাদি খায়!" "যজ্ঞে যে পশু হনন করা যায় সে স্বর্গে যায়; তবে নিজের পিতাকে যজ্ঞে বধ কর না কেন? তিনিও স্বর্গে যাবেন!" "একজন অন্ন ভক্ষণ ক'রে যদি আর এক জনের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসী পুত্রের জন্য অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন কি? তুমি ঘরে বসে মজা করে খাও, তাতেই তোমার তৃপ্তি হবে!" "আপ্তবাক্য কিছু আকাশ হ'তে পড়ে না। যুক্তি পূর্ণ যে বাক্য তাহাই আপ্তবাক্য!" এইরূপ নানা কথা বলিতে বলিতে দৈত্যেরা স্বধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইল। পরিহাসের পর অন্যধর্ম্ম গ্রহণ। দৈত্যেরা মায়ামোহের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এবং ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন বা তর্ক উত্থাপিত করিল না। অতএব দেখা গেল যে স্বধর্ম্মত্যাগ ও অন্যধর্ম্মাবলম্বনের প্রণালী এইরূপ।

১ম। "কেন?" অথবা যুক্তি অন্বেষণ।

২য়। সংশয়।

৩য়। ভেদবুদ্ধি।

৪র্থ। নিন্দা।

৫ম। পরিহাস,

৬ষ্ঠ। অন্যধর্ম্মগ্রহণ।

যখন দৈত্যেরা অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তখন তাহারা দেবতাদের কর্ত্তৃক অনায়াসে পরাজিত হইল। স্বধর্ম্ম ত্যাগের অর্থ স্বজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা। অনৈক্য ইহার ফল। এবং অনৈক্যের ফল পরাজয়।

অদৃষ্টবাদ।

যে শয্যায় শয়ন করিয়া রজনি অতিবাহিত করিয়াছ, মাতৃ ক্রোড়ের ন্যায় যে শয্যার অঙ্কতলে এত কাল সুখে নিদ্রিত ছিলে, বলিতে পার এশয্যার উৎপত্তি কিসে? তুমি আজ প্রত্যূষে ইতস্ততঃ রাজ মার্গে পাদ-চার করিয়া যে সমীরণ-সেবা করিতেছ, যে প্রাভাতিক কুসুমোজ্জল-মাল্য-সৌগন্ধ্য-বাহি সমীরণ দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ ও পুলকিত

করিতেছ, বলিতে পার, এসমীরণের উৎপত্তি কিসে? যে সূর্য্যদেব সমস্ত জগতকে আলোকিত ও জাগরিত করিয়াছেন, যাঁহার অসদ্ভাবে স্তুচি ভেদ্য-গাঢ়-অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন ছিল, উচ্চ নচ কাহারই মর্য্যাদা ছিল না, যাঁহার উজ্জ্বলতর দীর্ঘ দীর্ঘ অসংখ্য কাঞ্চন শলাকার ন্যায় কিরণ জালে জাগতিক সকল পদার্থই উৎপন্ন, জীবিত, বর্দ্ধিত ও সুস্থির রহিয়াছে, বলিতে পার; এই সূর্য্যদেবের উৎপত্তি কিসে? বলিতে পার এই সর্ব্বংসহা বসুমতী যাহাতে তুমি মাতৃ জঠর হইতে নিপতিত হইয়াছ ও অদ্যাপি যাহার উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছ, ভবিষ্যতেও, (জীবিত কাল পর্য্যন্ত) যাহার বক্ষে তুমি অবস্থিত রহিবে সেই আধার শক্তি রূপিনী ধরণীর উৎপত্তি কিসে? অধিক কি তুমি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পশুজাতি হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া পরিচয় দিতেছ, তুমি যে পানীয় পান করিয়া, যে আহার্য্য আহার করিয়া স্বীয় জীবনী শক্তির বৃদ্ধি করিতেছ, বলিতে পার, এই পরিচ্ছদের এই পানীয়ের এই আহার্য্যের উৎপত্তি কিসে? বলিতে পার, দেহাভিমানী, তোমার এই তপ্তহেমাবদাত-সুন্দর সুগোল নাত্যুচ্চ, নাতি নীচ দেহ যষ্টির উৎপত্তি কিসে? যাহা আছে বলিয়া, তুমি দণ্ডায়মান, যাহা আছে বলিয়া, তুমি গমনশীল, যাহা আছে বলিয়া, তুমি পান ভোজনে ব্যাপৃত, যাহা আছে বলিয়া, তুমি সুখ শয্যায় শায়িত, অধিক কি যাহা আছে বলিয়া তুমি "তুমি" এই পদের অভিহিত; সেই তোমার দেহের উৎপত্তি কিসে? তুমি, হ'য়ত, হাসিয়া বলিবে তুমি জাননা, এই সমস্তই এক জাতীয়-পরমাণুসমষ্টি হইতে উৎপন্ন। তুমি যাহা আহার করিতেছ, যাহা পান করিতেছ, ও যে পরিচ্ছদ দ্বারা শারীরিক শোভা বর্দ্ধন ও শারীরিক উত্তাপের রক্ষা করিতেছ, ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, সেই আহার্য্য সেই পানীয় ও সেই পরিচ্ছদ হইতে তোমার শরীরের কিছুই পার্থক্য নাই। আহার্য্য, পানীয়, পরিচ্ছদ যে উপাদানে নির্ম্মিত, তোমার শরীরও সেই সেই উপাদানে প্রস্তুত। এই অসহনীয়-তেজ-পুঞ্জ-মধ্য-গগন-ক্রীড়ায়মান-মার্ত্তণ্ডের সহিত এই সুখ-সুশীতল-দক্ষিণ-বায়ুর কিছুই প্রভেদ নাই। এই বিশ্ব-দাহি-প্রজ্জ্বলিত-হুতাসনের সহিত এই সুখসেব্য-শ্রান্তি-নিবারণ-কারী সুস্নিগ্ধ-স্বচ্ছ-সলিলের কিছুই প্রভেদ নাই। বিশ্বাধিপতির এই বিশ্বরাজ্যে যাহা দেখিবে, সমস্তই পরমাণুর কার্য্য। এই যে দেখিতেছ, হিমালয়ের

শত-উৎস-নিঃসারিত-ভাব-পূর্ণ-সাগরাভিমুখ--গামিনী-চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণে--চাকচিক্য-শালি-অসংখ্য-বীচি-তরঙ্গ-দ্বারা অলঙ্কৃত-বর্ষাস্ফীত-নদী সহস্র ; ইহাও সেই পরমাণুর কার্য্য। এই যে আজ মুহুর্মুহুঃ প্রস্ফুটিত-অসংখ্য-উজ্জ্বল খদ্যোত-মালা মেদিনীর বিপুল বক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, এই যে অনন্ত আকাশের অনন্তবক্ষে হীরক পুঞ্জের ন্যায় অসংখ্য-নক্ষত্র আসীন রহিয়া তোমার নয়নের প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, এই সমস্ত, আর সেই মেদিনী মণ্ডল, আর এই কঠিনতর-উচ্চ-শৃঙ্গ-হিমাদ্রি-প্রভৃতি-পর্ব্বত-শ্রেণী এ সমস্তই সেই একমাত্র পরমাণুর কার্য্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যদি এক পরমাণু হইতে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে এত পার্থক্য কেন? জলই বা কেন তরল, কাষ্ঠ, প্রস্তর, লৌহই বা কেন কঠিন? স্ফটিকই বা কেন স্বচ্ছ, কাষ্ঠফলকই বা কেন অস্বচ্ছ? অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতিই বা কেন উত্তাপপ্রদ ও অন্ধকার নাশক? জল, বায়ু প্রভৃতিই বা কেন উত্তাপ নাশক ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন? তুমি হয়ত বলিবে, তুমি বিজ্ঞান জান না, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা বা বৈজ্ঞানিক প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান কর নাই, সেই জন্যেই এইরূপ অনভিজ্ঞের ন্যায় একটা অকিঞ্চিৎকর প্রশ্নের উত্থাপন করিলে। কঠিন পদার্থের যে পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তরল পদার্থও সেই পরমাণু হইতে হইয়াছে। ইহার কঠিনতার কারণ পরমাণুর গাঢ় সংযোগ, উহার তরলতার কারণ পরমাণুর শিথিল সংযোগ ; যতই যে পদার্থের, কাঠিন্যের উপলব্ধি হইবে, ততই সেই পদার্থে পরমাণুর গাঢ়তর গাঢ়তম, সংযোগের সত্তা বুঝিতে হইবে। যতই যে পদার্থের তরলতা উপলব্ধি হইবে, ততই সেই পদার্থে পরমাণুর শিথিলতর, শিথিলতম সংযোগের সত্তা বুঝিতে হইবে। জল অপেক্ষা পরমাণু পুঞ্জের শিথিল সংযোগে এই বায়ুর উৎপত্তি, বায়ু অপেক্ষা পরমাণু পুঞ্জের গাঢ় সংযোগেই জলের উৎপত্তি। আবার জল অপেক্ষা পরমাণু পুঞ্জের শিথিলতর সংযোগেই পৃথিবীর উৎপত্তি। সকল পদার্থই পূর্ব্বে বাষ্পাকারে পরিণত ছিল, পরে তরল, তৎপর কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে বায়ু তোমার, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে নানা উপাদেয় সৌগন্ধ্য আনয়ন করিয়া উপহার দিতেছে, কালে এই বায়ুই আবার তরল জলে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে যে জল তোমার পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছে, কালে সেই জলই আবার কঠিনাবরণ পৃথিবী ও কঠিনতর পর্ব্বত হইয়া পড়িবে। এক্ষণে তুমি নিদাঘ তাপে সন্তপ্ত হইয়া যে

সুশীতল পদার্থকে আলিঙ্গন করিতেছ, কালে সেই পদার্থই আবার বায়ু বিশেষের (অম্লযানের) সহিত দ্রবতর রাসায়নিক সংযোগে জলদগ্নিরূপে পরিণত হইবে। বিজ্ঞানের বলবৎ পরীক্ষা অবধারণ করিতেছে যে, বায়ু বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ,জল বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ,অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ বা পৃথিবী বলিয়া কোন পদার্থ বিশেষ, নাই। সকল পদার্থই একজাতীয় পরমাণুসমষ্টির বিশেষ বিশেষ সংযোগ দ্বারা বিশেষ বিশেষ আকারে অভিব্যক্ত। (১) এক্ষণে পুনরায় আপত্তি হইতেছে যে, পরমাণুপুঞ্জের বিশেষ বিশেষ সংযোগের প্রতি কারণ কি? আর স্বীকার করি, গাঢ়সংযোগে পৃথিবী, শিথিলসংযোগে জলের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু তুমি দুইটি মৃত্তিকার লোষ্ট্র তুলিয়া লও দেখিবে; উভয় লোষ্ট্রেতেই পরস্পর পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের কারণ কি? পৃথিবীর কারণীভূতঃপরমাণু-সংযোগ এ লোষ্ট্রেতে যাদৃশ ও লোষ্ট্রেতেও তাদৃশ; তবে এ টিতে আর ওটিতে প্রভেদ কেন? কেহ কেহ বলিবেন, পার্থক্য কৈ! আমি দুইটি তুল্যাবয়বও তুল্য পরিমাণের লোষ্ট্র বাচিয়া লইয়াছি, প্রভেদ হইবার সম্ভব নাই; যাহাঁরা এইরূপ বলিবেন, তাঁহারা একান্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন; বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, ঐ দুইটিতে অনেক প্রভেদ আছে। জানা আবশ্যক যে, এই দুইটিতে পরস্পর পরস্পরে পার্থক্য না থাকিলে কদাচ এই লোষ্ট্র দুইটি-দুইটি হইত না; প্রত্যুত এক হইয়া যাইত। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, একের অধিক হইলেই তাহাতে একের ভেদ থাকিবে। লোষ্ট্রদ্বয়ের পরস্পরের পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই লোষ্ট্রদ্বয়ের পার্থক্যের কারণ কি? এক জলাশয়ের জলের স্বাদে অন্য জলাশয়ের জলের স্বাদে তারতম্য-কেবল জলাশয়দ্বয়ের মৃত্তিকার তারতম্যে ঘটিতেছে; কিন্তু মৃত্তিকার তারতম্যের কারণ কি? এক জাতীয় দুইটি পদার্থ্য (ঘটি, বাটি, কলশি, যাহাই কেন বলনা) আনয়ন্ কর, দেখিবে, দুইটি পদার্থেই পার্থক্য রহিয়াছে। যদি বল, ইহা এক শিল্পি-কর্ত্তৃক-নির্ম্মিত, অন্যটি *অন্য শিল্পি-কর্ত্তৃক-গঠিত; এই-শিল্পি-দ্বয়ের পার্থক্য নিবন্ধন বস্তুদ্বয়েও পার্থক্য* জন্মিয়াছে। যদি এক শিল্পীই তুল্যাবয়ব দুইটি পদার্থের নির্ম্মাণ করিব

---

(১) সামান্য অঙ্গার আর বহুমূল্য হীরক খণ্ড ও যে একই উপাদানে নির্ম্মিত অন্ততঃ এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে মত দ্বৈধ নাই।

বলিয়া অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে বস্তুদ্বয় প্রস্তুত করে; সেই বস্তুদ্বয়ের পার্থক্যের কারণ কি? সেই বস্তুদ্বয় কদাপি তুল্যরূপ হয় না; ইহার প্রতি কারণ কি? দুই স্ত্রীতে এক পুরুষ কর্ত্তৃক বা এক স্ত্রীতে দুইপুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত-পুত্রদ্বয়ের কথা বলিতেছি না, এক স্ত্রীতে এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্রদ্বয়ের পরস্পর পার্থক্য কেন? সিদ্ধান্তবাদী হয়ত বলিবে, এক শিল্পীর নির্ম্মিত বস্তুদ্বয়ে কি সৌসাদৃশ্য নাই! নিপুণতা কেন, তুল্যরূপ প্রস্তুত করিব বলিয়া অভিনিবেশের প্রয়োজন নাই, এক শিল্পীর যদৃচ্ছা-বশতঃ নির্ম্মিত বস্তুদ্বয়ে কি তুল্যতা নাই? তাহা না হইলে আমরা কি করিয়া পরিচিত শিল্পীর বস্তু দেখিয়াই এ বস্তু অমুক শিল্পীর নির্ম্মিত ঠিক করিয়া বলিয়া দিই? এমন কি, শিল্পজাতের এই সৌসাদৃশ্যটুকু আছে বলিয়া আমরা কোনদেশীয় শিল্প তাহা পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে সমর্থ। এই সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া পুরুষের লিখিত বর্ণমালা ও স্ত্রী জাতির সুকোমল লেখনী-প্রসূত অক্ষর মালার উপলব্ধি করিতে পারি। যাহার কিঞ্চিন্মাত্র অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, সে ব্যক্তিও পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর বাছিয়া দিতে পারে। এই পরিশূন্য অবধিশূন্য সময় সাগরের অসংখ্য তরঙ্গশ্রেণীর ন্যায় মনুষ্য শ্রেণীর মধ্যে এরূপ দুইটি মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাদিগের একটি অক্ষরেরও তুল্যতা আছে; সুতরাং এই ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্ মনুষ্যের অবশ্য বিভিন্নতাশালি অক্ষর মালার পরিচয় করা দুঃসাধ্য বা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। অপরিচিত ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া তোমরা কি ইহারা উভয়ে সহোদর ভ্রাতা স্থির করিতে পার না? নিবিড় লোকারণ্যের মধ্য হইতে তোমরা কি অজ্ঞাত-পিতা পুত্রকে চিনিয়া লইতে পার না? এই ভ্রাতৃদ্বয়ও পিতা পুত্রের পরিচায়ক কি? বলিতেই হইবে, ইহার পরিচায়ক কেবল একমাত্র পরস্পরের পরস্পরে সৌসাদৃশ্য। কারণ ভেদে, কার্য্যে ভেদ, এটি একটি দার্শনিকদিগের স্থির সিদ্ধান্তিত মত। তবে ভ্রাতৃদ্বয়ে, পিতা-পুত্রে, এক শিল্পীর নির্ম্মিত শিল্পদ্বয়ে, এক লেখকের লিখিত এক জাতীয় অক্ষরদ্বয়ে কিঞ্চিৎই পার্থক্য আছে বটে, তাহা না হইলে রাম, শ্যাম ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এ রাম ও শ্যাম বলিয়া সাধারণে কি করিয়া ব্যবহার করে? পিতা, পুত্রের মধ্যে এ পিতা ও পুত্র বলিয়া সাধারণে কি করিয়া নিয়ত অবধারণ করে! এক শিল্পীর নির্ম্মিত সহস্র শিল্প-জাতের মধ্যে সহস্র ব্যক্তি এক একটি ক্রয় করিয়া প্রত্যেক প্রত্যেকের শিল্প কি করিয়া

বাচিয়া নয়? এ পার্থক্যেরও কারণান্তর আছে। সৌসাদৃশ্যের কারণ বিশেষের অভেদ এক লেখক, এক পিতা, একশিল্পী, পার্থক্যেরও কারণ সেইরূপ কারণান্তরের পার্থক্য। এক একটি কার্য্যোৎপত্তির প্রতি অনেকগুলি কারণের আবশ্যক হয়। তুমি যদি বস্ত্র প্রস্তুত করিতে দেখিয়া থাক; তাহা হইলে অবশ্যই জান যে, এক বস্ত্র প্রস্তুত করিতে তন্তুবায় যেমন কারণ, তেমনি আরও কারণ সামগ্রী আছে; সূত্র, বেমা, (মাকু) তন্ত্র, অন্নমণ্ড, দেশ-বিশেষ ও কাল-বিশেষ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন সহজেই বুঝিবে যে, এক তন্তুবায়ের বস্ত্রদ্বয়ের অন্যান্য কারণের পার্থক্য আছে বলিয়া তন্তুবায়ের পার্থক্য না থাকিলেও ঐ বস্ত্রদ্বয়ে পার্থক্য রহিয়াছে। এইজন্য দুই মাতার গর্ভে এক পিতা হইতে উৎপন্ন পুত্রদ্বয়ে একপিতা বলিয়া কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আবার দুই মাতা বলিয়া কিঞ্চিৎ অসৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এক পিতা এক মাতা হইলেও কালের শুক্রশোণিতের পার্থক্য আছে। যমক সন্তানেও মাতার উদরের যে অংশে এ সন্তান ছিল ও সন্তান সে অংশে ছিলনা; সুতরাং কালের পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকিলেও দেশ বিদেশের পার্থক্য রহিয়াছে। লেখকের লিখিত ককার দ্বয়ে নানা কারণের পার্থক্য না থাকিলেও কালের ও দেশের পার্থক্য আছে। পত্রের যে অংশেও যেকালে প্রথম ককার লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ককার সে অংশেও সেকালে লিখিত হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে কার্য্য বৈচিত্র্যের কারণ কারণ-বৈচিত্র্য, এই কারণ বৈচিত্র্য না থাকিলে কার্য্য বৈচিত্র্য হইত না। যত কার্য্য দেখিবে, সকল কার্য্যেই কিছু না কিছু কারণ বৈচিত্র্য আছে, সেই জন্যই কার্য্যমাত্রই এত বিচিত্রতাশালী। সেই জন্যই এই অনন্ত সময়ের উৎপন্ন অনন্তকোটি মনুষ্যের মধ্যে দুই মনুষ্যকেও তুল্যাবয়ব তুল্যরূপ দেখা যায় না। সেই জন্যই এই অনন্তকোটি মনুষ্যের অনন্তকণ্ঠ-নিঃসৃত-স্বরের ধ্বনি দুই মনুষ্যেরও তুল্য রূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই আমরা গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট থাকিয়াই বহিরাগত ব্যক্তির পরিচিত স্বর মাত্র শুনিয়া অমুক আসিয়াছে বলিয়া স্থির-নিশ্চয় করি। সিদ্ধান্তবাদী যতই কেন আড়ম্বরের সহিত এইরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা করুন না; ফল এরূপ সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষবাদ, আমাদিগের পূর্ব্বপক্ষ-গ্রন্থিআরও দৃঢ়তর হইয়া পড়িতেছে। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণ, কারণ-বৈচিত্র্য এই কারণ-বৈচিত্র্যের আবার কারণ কি? এই পরমাণু-পুঞ্জই বা একালে সংযোগ হইতেছে। অত

পরমাণু-পুঞ্জেরই বা কেন অপর-কালে সংযোগ হইবে বা হইয়াছে? এ পরমাণু-পুঞ্জেরই কেন এ প্রদেশে সংযোগ হইতেছে? অন্য পরমাণু পুঞ্জেরই বা কেন অন্য প্রদেশে সংযোগ হইতেছে? এ পরমাণু পুঞ্জেরই বা কেন শিথিল সংযোগ হইতেছে? অন্য পরমাণু পুঞ্জের বা গাঢ় সংযোগ হইতেছে? এই পরমাণু-পুঞ্জেরই বা কেন একালে এ প্রদেশে পরস্পর সংযোগ হইতেছে। এই অত্যুচ্চ-শৃঙ্গ হিমাদ্রি পর্ব্বতেই বা কেন এত অধিক পরমাণুর সংযোগ? আর অতি সূক্ষ্ম বট বীজেই বা কেন এত অল্প সখ্যক পরমাণুর সংযোগ?

কিন্তু সংযোগ যদি পরমাণুর স্বাভাবিক গুণ হয়; তবে নিয়ত কেন সংযোগ অবস্থিত থাকে না? সময় বিশেষেই বা কেন সংযোগ হয়? সময়-বিশেষেই বা কেন সংযোগের ধ্বংস হয়? তুমি গোতম শিষ্য নৈয়ায়িক তুমি বলিবে, সংযোগ জন্য পদার্থ, ধ্বংস জন্য পদার্থ; এ উভয়েরই কারণ ক্রিয়া। যখন পরমাণু পুঞ্জে ক্রিয়া (পরিসম্পন্ন) উৎপন্ন হয়; তৎপরবর্ত্তি-কালেই দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ক্রমে ত্রসরেণু, এই ক্রম ধারায় মহাভূতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, কেবল ক্রিয়া কল্পনা করিয়াই এ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত হয় না; কারণ ক্রিয়া আবার জন্য কিনা? যদি জন্য হয়, তবে কারণান্তরের আবশ্যক। কেবল পরমাণুকে ক্রিয়ার কারণ বলিলে চলিবে না। কেবল পরমাণু ক্রিয়ার কারণ হইলে সংযোগের সময়েও ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে; কারণ ক্রিয়ার কারণ পরমাণুর সে সময়েও অবস্থিত আছে। সংযোগ কালে ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে পৌর্ব্ব পার্য্য স্বীকারের জন্য নৈয়ায়িকদিগের মতে কতকগুলি ক্ষণ স্বীকার করিলেও আমরা কোন পদার্থেরই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম না। আমাদিগের প্রত্যক্ষ হইবার পুর্ব্বেই পদার্থের ধ্বংস হইয়া যাইত। কারণ সংযোগ উৎপন্ন হইলে ক্রিয়া ধ্বংস হয়, ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে সংযোগ ধ্বংস হয়। ফল কথা ক্রিয়া সংযোগের কারণ হইলেও সংযোগ ক্রিয়া সংযোগের নাশক। আবার ক্রিয়ার (গতির) অবস্থিতি পর্য্যন্ত সংযোগ হইতে পারে না, পদার্থ স্থির না হইলে কি করিয়া অপরের সহিত সংযুক্ত হইবে? সুতরাং ধরিতে গেলে ক্রিয়া ও সংযোগ উভয়েই বিরোধী পদার্থ। বিরোধি-পদার্থ দ্বয়ের কারণ তুল্য জাতীয় পদার্থ হইতে পারে না। পরমাণু যদি সংযোগের কারণ হয়, তবে ক্রিয়ার নয়, যদি ক্রিয়ার কারণ হয়, তবে

সংযোগের নয়। সংযোগেও ক্রিয়ার কারণ নাই বলিলে এ পদার্থ দ্বয়কে নিত্য বলিতে হয়। সংযোগ নিত্য হইলে কোন পদার্থের উৎপত্তি বা কোন পদার্থেরই বিনাশ হইত না; কারণ সেই সেই পদার্থের কারণীভূত পরমাণুর নিত্য সংযোগের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। সংযোগের উৎপত্তি বিনাশ না থাকিলে পদার্থেরও উৎপত্তি বিনাশ নাই; তাহা হইলে আর পরমাণুর কল্পনা বা তৎসংযোগের কল্পনার প্রয়োজন কি? সকল পদার্থই নিত্য, সকল পদার্থই তুল্য ভাবে চির দিন ছিল ও তুল্য ভাবে চির দিন থাকিবে। সকল পদার্থই নিত্য, এ বিষয় সহস্র যুক্তি সহস্র তর্ক থাকিলেও এ মতে কাহারই আস্থা হইবে না; ইহার বাধক বলবৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই কত পদার্থের উৎপত্তি ও কত পদার্থের ধ্বংস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আবার ক্রিয়া নিত্য হইলে কোন পদার্থেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ পরমাণুর সংযোগ না হইলে পদার্থের উৎপত্তি হয় না, সংযোগ হইলে ক্রিয়ার ধ্বংস হয়। ক্রিয়া নিত্য হইলে তাহার ধ্বংস হইতে পারে না; সুতরাং তন্নাশক সংযোগেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। সংযোগের অসদ্ভাবে স্থূল পদার্থেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য আমাদিগের মহর্ষি জৈমিনির শিষ্য মীমাংসকগণ ও আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রত্যেক পরমাণুর উপরে দুইটি শক্তি স্বীকার করেন, তন্মধ্যে একটি আকর্ষণ অপরটি বিপ্রকর্ষণ। পরমাণুদ্বয়ের যখন আকর্ষণ শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন উভয়েই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা সংযোগ উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে সংযুক্ত করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই সংযুক্ত পরমাণুদ্বয়ে বিপ্রকর্ষণ শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন আবার পরমাণুদ্বয়ে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, সেই ক্রিয়ার উভয়কে বিশ্লিষ্ট করিয়া সেই পদার্থটির ধ্বংস সাধন করে। শক্তিবাদিদিগের এই গৌরব-গ্রস্ত মতটি সিদ্ধান্তের কতদূর অনুকূল, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রই তাহা বুঝিতে পারেন। সংযোগ ও ক্রিয়াতে যে সকল আপত্তি ছিল, এই শক্তিদ্বয়েতেও সেই সকল আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। এই শক্তিদ্বয়ের উত্তেজনা ও সঙ্কোচের কারণ কি? কোন সময়েই ও কেনই এ শক্তি উত্তেজিত, অপর শক্তি সঙ্কুচিত, কোন সময়েই ও কেনইবা অপর শক্তি উত্তেজিত এশক্তি সঙ্কুচিত হইতেছে? শক্তিদ্বয়ের উৎপত্তি বিনাশ থাকিলে, আবার সেই শক্তিদ্বয়ের

উৎপত্তির কারণ কি? এক পরমাণু এই বিরোধিপদার্থদ্বয়ের কারণ হইতে পারে না। পরমাণুমাত্র আকর্ষণের কারণ হইলে সর্ব্বদাই আকর্ষণ থাকিত, কদাচ বিপ্রকর্ষণ আসিতে পারিত না, পরমাণুমাত্র বিপ্রকর্ষণের কারণ হইলে সর্ব্বদাই বিপ্রকর্ষণ থাকিত, কদাচ আকর্ষণ আসিতে পারিত না, কারণ সেই পদার্থদ্বয়ের কারণ পরমাণুর সর্ব্বদাই কর্ত্তা আছে। মহর্ষি কণাদ শিষ্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন, এক জাতীয় পরমাণু হইতে নানা জাতীয় দৃশ্য পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণু হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। মাষীয়-পরমাণু হইতে মাষ মুদ্গীয় পরমাণু হইতে মুদ্গোর উৎপত্তি হইয়াছে। সহস্র বর্ষেও মাষীয় পরমাণু হইতে মুদ্গ ও মুদ্গীয় পরমাণু হইতে মাষ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক বিচিত্র জাতীয় পরমাণুরও পরে এক একটি "বিশেষ" নামধেয় পদার্থ আছে; এই বিশেষ পদার্থ আছে বলিয়াই মাষ হইতে মুদ্গ ভিন্ন, মুদ্গ হইতে মাষ ভিন্ন। এই কারণগত বিশেষ পদার্থই দৃশ্যমান পদার্থগত পার্থক্যের উৎপাদক। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, শক্তিবাদীর কল্পনা অপেক্ষা এইরূপ কল্পনার কতকটা পূর্ব্বপক্ষ নিরাকৃত হইতেছে। ফল কথা এইরূপ কল্পনায় কেবল জাতিগত পার্থক্যই সংসাধিত হইতেছে, ব্যক্তিগত পার্থক্যের সাধক কে? যব হইতে মাষ ভিন্ন; ইহার ভেদ, কারণ বিশেষ হইতে পারে; কিন্তু দুইটি মাষ বা দুইটি যব পরস্পর তুল্য নয় কেন? এই ব্যক্তিগত বিভিন্নতার কারণ কি? আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ শক্তিই স্বীকার কর, আর বিশেষই স্বীকার কর, কেবল সেই সেই কল্পিত পদার্থ দ্বারা জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক পদার্থের পার্থক্যের জন্য, পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র কারণ শ্রেণী স্বীকারের প্রয়োজন। সেই কারণ কি? এই প্রশ্নের আর্য্যদার্শনিকগণ সকলে সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বহু গবেষণার ফল স্বরূপ একটি নির্ম্মল উত্তর করিয়াছেন। সেই উত্তরে আমরা জানিয়াছি, এই বৈচিত্র্যের, এই সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতির একমাত্র কারণ "অদৃষ্ট"। অহঙ্কার করিয়া অতি উচ্চ গৌরবের সহিত বলা যাইতে পারে যে, এই অদৃষ্ট স্বীকার ব্যতিরিক্ত এই সকল আপত্তির খণ্ডন করিতে কাহারও শক্তি নাই। যিনি অদৃষ্টের আশ্রয় ব্যতিরিক্ত সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন; তিনি এক আপত্তি শৃঙ্খল ছেদন করিতে যাইয়া অপর দুশ্ছেদ্য আপত্তি শৃঙ্খলায় বিজড়িত হইয়া পড়িবেন।

অদৃষ্ট কি ? যাহা দেখা যায় না, বা যাহা জানা যায় না, সেই অর্থে কি অদৃষ্ট শব্দের ব্যবহার হইয়াছে ? তবে আর এত তর্ক বিতর্ক করিয়া এত বিচার করিয়া এরূপ অজ্ঞাত কারণাবধারণের প্রয়োজন কি ছিল ? বলিলেই হইত "বৈচিত্র্যের কারণ আমি জানিনা" "জানিনা" বলাও যা, "অজ্ঞাত কারণ বা অদৃষ্ট কারণ বলাও তা, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে এত তর্ক বিতর্ক করিয়া "জানিনা" বলিলে সর্ব্বসাধারণেই বুঝিতে পারিত ও সেই সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির নিকটে উপহাসাস্পদ হইতে হইল। অদৃষ্ট বলাতে সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে নাই ; একটা অবুদ্ধ-শব্দাবরণে বিষয়টা আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। এইটি দার্শনিকদিগের চাতুর্য্য-সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ। যাঁহারা আর্য্যঋষিদিগের গ্রন্থের আলোচনা করেন নাই ; তাঁহারাই এইরূপ মনঃকল্পিত একটা অযথা আপত্তির অবতারণা করিতে পারেন। ফল মহর্ষিরা অজ্ঞাত অর্থে অদৃষ্ট শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা বলেন, আমরা এমন অনেক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতেছি ; যাহা পুরুষের (চেতনের) প্রযত্নে সম্পন্ন হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত সম্পন্ন হয় না। ক্ষেত্রও চিরদিন আছে, ধান্য বীজও চিরদিন আছে, কৈ ইহার আপনা আপনি সম্বন্ধ হয় ? মনুষ্য ভূয়ঃকর্ষণে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সম্পাদন করিল, ক্ষেত্রও ধান্য বীজের সম্বন্ধ সম্পাদন করিল, কালে এই উভয়ের সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হইল। অগ্নি, জল, লৌহ, পাথর কয়লা প্রভৃতি চিরদিনই আছে কৈ ? অনন্তকোটি দিন, মাস, বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, ইহাদিগের কি আপনা আপনি সম্বন্ধ হইয়া রেল গাড়ি চালিত হইয়াছে ? ইহাও পুরুষের গবেষণায় পুরুষের প্রযত্নের ও পুরুষ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত পরস্পর সংযোগের ফল। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যখন আমরা কতকগুলি বিষয় পুরুষের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে দেখিতেছি। তখন আর অবশিষ্ট বিষয়েরও (যে গুলির আমরা কোন কারণ প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই) কারণ পুরুষের প্রযত্ন ও চেষ্টা এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। যখন আমরা কোন কার্য্যে ইহ-জন্মে যত্ন বা চেষ্টা দেখিতে পাই না, তখনই আমরা অবধারণ করি যে পূর্ব্ব জন্মে পুরুষের এ বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টা ছিল। পূর্ব্বজন্মে আমরা যে পুণ্য বা পাপ করিয়াছি, তাহার ফলভোগের জন্য শরীরের প্রয়োজন। আত্মা নিরাকার, নিশ্চল, সুধু আত্মা উপভোগের দ্বার-স্বরূপ ইন্দ্রিয়

বিশিষ্ট শরীর ব্যতিরিক্ত কোন বিষয়েরই উপভোগ করিতে পারে না, সুতরাং পাপ-পুণ্য জন্য সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত শরীরের প্রয়োজন। সেই আমাদিগের পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতিই পরমাণু পুঞ্জে ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া পরস্পরকে সংযুক্ত করিয়াছে। তাহাতেই এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে। সুকৃতি দুষ্কৃতির পরিমাণ অনুসারে ভোগেরও একটা সীমা আছে। সেই সীমা (ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিন, বর্ষ) ফুরাইলে আত্মার সহিত শরীরের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধটিও ফুরাইয়া যায়। এরূপ চিকিৎসক জগতে নাই; সেই সীমা ফুরাইলে সেই চিকিৎসকের এক শেষ যত্নে মুহূর্ত্তকালের জন্য মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে। এ জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগের জন্য আবার পর জন্মে এইরূপ প্রক্রিয়ায় শরীর উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। এই যে, অভ্রভেদী উচ্চশৃঙ্গ বিশিষ্ট হিমালয় পর্ব্বত দেখিতেছি, ইহাও আমাদিগের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল। এই যে সুধাসিন্ধু জ্যোৎস্না জালে চন্দ্রমা পৃথিবীকে বিধৌত করিতেছে, ইহাও আমাদিগের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল। জল, বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি যাহা বল, সমস্তই আমাদিগের সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল। সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ আবর্জ্জনা স্বরূপ শরীর মধ্যগত অবিশুদ্ধ বায়ুপরিত্যাগ স্বচ্ছ-মনোহারি-জল পান অগ্নি পক্ব অন্নাদির ভোজন করিয়া আমাদিগের শরীর অবস্থিত আছে। এই সকল ও এতৎ সদৃশ অন্যান্য পদার্থের অবস্থিত না হইলে আমাদিগের শরীরের সত্তা থাকিত না; সুতরাং আমাদিগের সুকৃতি দুষ্কৃতি পরমাণু পুঞ্জে ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া এই সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহায় কৃতোপদেশ প্রশান্ত পবিত্র মূর্ত্তি প্রসন্নাত্মা যোগিগণ নিমীলিত চক্ষে ধ্যান ধারণা সমাধি-নিয়ত হইয়া নিবাত নিস্তব্ধ প্রদীপের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে এই মহাত্মাদিগের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতি দ্বারা হিমালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। হিমালয়ের দেশ বিশেষের সৃষ্টি না হইলে ভারতের হিতের জন্য ভারত প্রবাসী উচ্চপদ ইংলণ্ডীয় মহাত্মারা দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে স্বীকার করিতেন না, কারণ ভারতের নিরতিশয় উত্তাপে তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিবে আশঙ্কা হইত। সুতরাং তাহাদিগের বা আমাদিগের সুকৃতি বলে, সেই একান্ত পরহিত ব্রত মহাপুরুষদিগের ক্রীড়া কানন স্বরূপে হিমালয়ের দেশ বিশেষের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার বলিতে হইবে দরিদ্র ভারতবাসীর পূর্ব্ব জন্মের পাপ-

রাশির ফল হিমালয় পর্ব্বত। কারণ বস্ত্র হীন ভারতবর্ষ হিমাদ্রির প্রবল তুষার-সংপৃক্ত বায়ু দ্বারা নিয়ত জড়ীভূত ও আর্দ্র হইতেছে। আমরা দৃশ্যমান পদার্থ-বিশেষকে আপাততঃ কার্য্য বিশেষের কারণ বলিয়া অবধারণ করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝাযায় যে কেবল দৃশ্যমান পদার্থ কাহারও কারণ নহে। পিপাসার্ত্ত হইয়া আমরা যে জলের জন্য কাতর হই, ক্ষিপ্ত শৃগাল দংষ্ট্র ব্যক্তি সেই জলকে দেখিলে চীৎকার করিয়া উঠে। আমরা যে রূপবতী ভার্য্যাকে পাইয়াছি বলিয়া আপনাকে কত সুখী মনে করি, আবার সেইরূপবতী রমণীকে দেখিয়া তাহার সপত্নীর বিদ্বেষ উৎপাদন হয়। যখন এক রমণীর সৌন্দর্য্য ব্যক্তি বিশেষের সুখের কারণ ও ব্যক্তি বিশেষের দুঃখের কারণ হইতেছে; তখন বলিতে হইবে সৌন্দর্য্য, সুখও দুঃখ, কাহারই কারণ নয়। সুখ ও দুঃখের কারণ সেই সেই ব্যক্তির পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি। সেই সুকৃতি দুষ্কৃতি বলেই এই রমণীর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি দুষ্কৃতির নাম অদৃষ্ট। সেই পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট বলেই আমাদিগের ইহ-জন্মে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। আবার ইহ-জন্মে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেই শুভাশুভ কার্য্য দ্বারা পাপ পুণ্য উৎপন্ন হইয়া পর জন্মের আমাদিগের শরীর উৎপাদিত করে। সেই পর জন্মেরই নামান্তর পরকাল। আত্মা নির্দ্ধারণ এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। আত্মা যখন নিত্য, সেই নিত্য পদার্থ এতদিন কোথায় ছিল, ভবিষ্যতেই বা কোথায় যাইবে? আমরা আত্মা উৎপন্ন অথচ অবিনাশী বলি না।

"মৃত্যু।"

"ছুঁয়ো না রে শমন, আমার জাত গিয়েছে ;

* * * * *

আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী

আমায় সন্ন্যাসী করেছে।"

লোকে মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন? যে স্থানে কখনও যাই নাই, যে দেশের সংবাদ কাহারও নিকট শুনি নাই, যেখানে যাইলে কাহাকেও আর ফিরিয়া আসিতে দেখি নাই, সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত প্রদেশে যাইতে কি এত ভয় ও বিষন্নতা হয়! বহুদিন এ স্থূল দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া ইহার যত্ন ও পরিপাটি করিয়া একটা কেমন স্নেহ ও টান জন্মিয়াছে, এবং শরীর সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় সকলকে নিজের বলিয়া অভিমান হইয়াছে, তাই জরাজীর্ণ হইলেও পরিত্যাগ করিতে কি এত যন্ত্রনা বোধ হয়? জানি না কেন এমন হয়, তবে লোক মুখে শুনিয়াছি, এবং নিজেও বুঝি যে "মরণ বাড়া" আর গালি নাই; মৃত্যুভয়ে সকলেই এত ব্যস্ত, যোগ, যাগাদি নানা উপায়ে মৃত্যু এড়াইতে সকলেরই চেষ্টা। এখন বুঝা যাউক মৃত্যু কি! এই রক্তমাংসবসাপূর্ণ দেহাবসানের নাম কি মৃত্যু? অথবা যে মহাশক্তির কণিকা দ্বারায় এই স্থূল দেহ পরিচালিত তাহারই বিলীনাবস্থা কি মৃত্যু? গীতায় পড়িয়াছি:—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরানি [illegible]হায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতিনবাণি দেহী।"

পুরাতন বস্ত্রত্যাগের ন্যায় দেহ ত্যাগ কোন একটা বিষম ব্যাপার নহে, সুতরাং মৃত্যু কিছুই নহে, "কাপড় ছাড়ার" মতন। ভগবান মৃত্যুকে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কেবল মৃত্যু ভয় নিবারণের জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করা তাঁহার উপদেশানুকূল নহে। আত্মা, অজর, অমর, আমি যাহা তাহার বিনাশ নাই, সুতরাং মৃত্যু দ্বারায় "আমিত্বের', পরিবর্ত্তন হয় না। দেহাভিমান যতদিন থাকিবে ততদিন মৃত্যুভয় ও থাকিবে। হস্তপদবিশিষ্ট সুন্দর

সুঠাম শরীরই আমি, এই শরীরের সুখবর্দ্ধক, বিলাসক্ষেত্র অন্য যাহা কিছু তাহা আমার, মৃত্যু এই দেহাত্ম্য বুদ্ধির একটা গোলমাল ঘটায়, এই সুখের স্বপ্নকে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া দেয়; তাই মৃত্যু এত ভয়ঙ্কর ও শোকপ্রদ। যদি মনুষ্য জানিত যে মৃত্যু আমাদের যে প্রদেশে ও যে অবস্থায় লইয়া যায়, তথা হইতে ঠিক সেই ভাবেও সেই শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করা সহজ, তাহা হইলে মৃত্যু কালে এত কাঁদাকাটির ধুম পড়িত না। আমার সর্ব্বস্ব ফেলিয়া যাইতেছি, কত আদরের, কত যত্নের, কত স্নেহের সামগ্রী সকল রাখিয়া চলিলাম, আর ভোগ করিব না; চোখের দেখা দেখিতেও আর পাইব না, জন্মের মত চলিলাম, দেহীর-বিষয়ীর এ কথা মনে করিলে যে বুক ফাটিয়া যায়।

মোট কথায় বুঝিতে হইলে বলিব যে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম মৃত্যু; গীতায় ভগবান বলিয়াছেনঃ—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র নমুহ্যতি ॥"

এই দেহের যেমন কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা সকল আছে, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তি ও একটা অবস্থা-বিশেষ মাত্র, ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। শ্যাম, বালক ছিল এখন যুবক হইয়াছে, তাহার সে শৈশব-শরীর-কান্তি এখন আর নাই, কিন্তু আত্মীয়েরা এ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ত রোদন করেন না, তেমনি মৃত্যু একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র, ইহাতে শোকের কিছুই নাই। অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের ভিতরে যে এক বিচিত্র শক্তি সকল পদার্থ কে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতেছে, তাহারই লীলার দ্বারায় জন্ম মৃত্যু-রূপ এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। এ বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের মধ্যে সকল পদার্থই পড়িয়াছেন। গুণময়ী সৃজন শক্তির ভিতরে নিত্য অখণ্ড কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্য[illegible]কলেই এ কুম্ভিপাকে ঘুরিতেছে। যোগ বাশিষ্ঠে ভগবান রামচন্দ্রও বলিয়াছেন।

শুষ্যন্ত্যপি সমুদ্রাশ্চ শীর্য্যন্তে তারকা অপি।
সিদ্ধা অপি বিনশ্যন্তি কৈবাস্থা মাদৃশে জনে ॥
দানবা অপি দীর্য্যন্তে ধ্রুবোপ্য ধ্রুবজীবিতঃ।
অমরা অপি মার্য্যন্তে কৈবাস্থা মাদৃশে জনে ॥

পরমেষ্ঠ্যপি নিষ্ঠাবান্ হ্রিয়তে হরিরপ্যজঃ।
ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৈবাস্থা মাদৃশে জনে॥"

"কালে যখন অতল জলনিধি শুষ্ক ভাব ধারণ করিবে, নক্ষত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন হইবে, সিদ্ধ ব্যক্তিদের পর্য্যন্ত বিনাশ ঘটিবে, তখন আর মাদৃশ ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি যত্ন প্রকাশ কেন? কালে যখন দানবেরা বিদীর্ণ এবং ধ্রুব ও অধ্রুব জীবন হয় এমন কি অমরেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে তখন আর আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি? কালে যখন সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা এবং অজন্মা হরিও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এক্ষণে যে সকল বস্তুর সত্ত্বা দেখিতেছি যখন ইহারা থাকিবে না জানিতেছি, তখন আর আমাদের ন্যায় ব্যক্তির প্রতি কিরূপে আস্থা হইতে পারে!" এখানে বলা হইল যে পরিবর্ত্তন জগতের ধর্ম্ম, গতি শীলতা ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি, যে শক্তি প্রবাহে অসীম ব্রহ্মাণ্ডরাশি ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই আদ্যাশক্তির আবর্ত্তবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব কণিকাগুলি কত আকার ধারণ করিতেছে, মৃত্যু এই সকল পরিবর্ত্তনের এক একটি স্তর। কোথায় যায়, কোথায় গিয়া এসব স্থির হইয়া দাঁড়াইবে, কোন অসীম অনন্ত সমুদ্রে এ বিশাল সৃষ্টি প্রবাহ গিয়া মিশিবে তাহা কে বলিতে পারে। কি ছিল, কি হইবে, কেন এমন হয় এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিয়া দিবে? তবে মায়ামুগ্ধ, মোহজড়িত হইয়াও দেখিতে পাই যে সমুদ্র বক্ষে কোন এক অজ্ঞেয় শক্তি পরিচালনে জলরাশি আন্দোলিত হইয়া কত বুদ্‌ বুদ্‌ ফুটিয়া উঠিতেছে, রবিকরসম্পৃক্ত হইয়া কত আভায় রঞ্জিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য দশদিক সৌন্দর্য্য ছটায় সমুদ্ভাসিত করিয়া আবার নিবিয়া যাইতেছে। মৃত্যু এই পরিবর্ত্তন খেলার এক একটি অনন্তমুহূর্ত্ত; অবিশ্রান্ত গতিশক্তির এক একটি অবসর দণ্ড।

"ছুঁয়োনা রে শমন আমার জীত গিয়েছে," যাহার জাতি নাই, যে পতিত, যাহাকে স্পর্শ করিলে, গঙ্গাস্নান করিতে হয়, তুমি ধর্ম্ম হইয়া কেমন করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে। সাধক-রঞ্জন রামপ্রসাদ ভাবরসে যেন ডুবু ডুবু হইয়া, কত আব্দারে, কত জোরে এই কথা টি বলিলেন। শেষে যেন একটু ভাবিয়া বুঝিলেন যে যমরাজার দরবারে একটু যুক্তি দেখান চাই, নচেৎ উকিল মোক্তারে শুনিবে কেন তাই আবার বলিলেন "আমি ছিলাম

গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে।” যে গৃহস্থ, যাহার আমার, তোমার, পর, আপনার জ্ঞান আছে, যাহার শুচি অশুচি বোধ আছে, সেইত ধর্ম্মাচরণ করিবে, কিন্তু আমারত আর বাছ বিচার নাই ; পাগলির হ্যাপায় পড়িয়া আমায় ঘর দুয়ার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী সাজিতে হইয়াছে সুতরাং দূরে পলাও, আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁইলে তোমাকেই চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। ভক্ত ভাবুকের ভাষায় দার্শনিক কঠিন তত্ত্বটি কেমন সহজে বুঝাইয়া দিলেন।

“সংসার-সংহার।”

মায়াতামসীর সূচিভেদ্য অন্ধকারে মনুজ-সন্তান সর্ব্বথা অদূরদর্শী। যদিও হৃদয়ে বিমল ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিরাজিত, বিকর্ম্মে তাহা উদ্ভাসিত না হইয়া সুদৃঢ় অজ্ঞান পটে সমাবৃত হইতেছে। নীলনভস্তলে অগণ্য তারকা স্নিগ্ধ কিরণ জাল বিকীর্ণ করিতেছে, ভূতলে খদ্যোত কুল অতুল শোভা প্রদর্শন পূর্ব্বক আলোক প্রদান করিতেছে, উপকরণ সম্ভারের অভাব নাই, তথাপি নির্ম্মল বোধেন্দু বিকাশ ভিন্ন মনের দর্শন থাকিতে,—অন্ধ ; শ্রুতি থাকিতে বধির, রসনা থাকিতে নীরস, ঘ্রাণ থাকিতে নির্গন্ধ, ও স্পর্শ থাকিতে স্পর্শ-হীন। হৃদয়ে শান্তি নাই, বিরামে আরাম নাই, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই জীবনে স্বাস্থ্য নাই, ভোজনে রুচি নাই, স্বজনে সুখনাই, সংসার কণ্টক ময়। অভাবের প্রতিযোগী নাই, অনুযোগী আছে, দৃশ্য দুরনুসন্ধের দ্রষ্টা প্রচুর আছে, প্রত্যক্ষের প্রয়াস নাই, অনুমানে উপপত্তি সমাধানে সাহস আছে। সাধনার বলবৎ অভিলাষ নাই অনায়াসে সিদ্ধি সংগতির বাসনা আছে। বিরুদ্ধবাদ আছে, মীমাংসার সমাবেশ নাই। ভিষক্ ও ভৈষজ্য আছে, ব্যাধি বিদূরিত হয় না। সমস্তই আছে, প্রকৃতি সুন্দরী সর্ব্বাবয়ব সম্পন্না, ঋদ্ধি মতী, ভোগ-সাধিনী তথাপি সমস্তই অসম্পূর্ণ ও অসম্পন্ন বোধহয়। ঘূর্ণায়মান আশাচক্রে সংসার আবর্ত্তিত হইতেছে। আশা কুহকিনী সময়ে সময়ে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মানব সকলকে মুগ্ধ করিতেছে। সকলেই আশার দাস। অসাধারণ প্রভুত্ব-শালী অদ্বিতীয় সম্রাট

হইতে একান্ত দুর্ব্বল নিঃস্ব প্রাকৃত লোক পর্য্যন্ত সকলকেই আশাদেবীর চরণ প্রান্তে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। আশার আশ্বাসে নির্ভর করিয়া সংসার চলিতেছে। সংসারীর পক্ষে আশাই সুখ। আশার তর্পণ হইলেই সংসারে সাফল্য হইল। কিন্তু অনেক সময়ে আশার সুসার হয় না, কেবল ছলনা। সংসারের অবলম্বন আশা, আশা একাকিনী বিচরণ করে না। সংসারীর আশার সহিত আরও গণ দেবতা আছে। সুধী দূর-দর্শি-গণ উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সতত যত্নপর থাকেন অনেক সময় কৃতকার্য্যতাও লাভ করেন।

"আসানাগনদী মনোরথজলা, তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা,
রাগগ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগা ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্ত সুদুস্তরাতি গহনা প্রোত্তুঙ্গ-চিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসোনন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥ ১১॥"

বৈরাগ্যশতকম্।

আশা নাম্নী প্রসিদ্ধ নদীর জল মনোরথ। এই নদী তৃষ্ণাতরঙ্গে সতত তরঙ্গায়িত, রাগ (সংসার বাসনা) রূপ কুম্ভীর ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া ইহাকে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে পরিণত করিতেছে। নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক বিহঙ্গমগণ ইহাতে যাতায়াত করিতেছে। এই আশানদী তীরস্থ (দেহাশ্রিত) ধর্ম্ম স্বরূপ মহা বৃক্ষের মূল উৎপাটন পূর্ব্বক স্রোতবেগে আকর্ষণ করিয়া ধ্বংস করিতেছে। মোহরূপ আবর্ত্তে (পাক) এই নদী সুদুস্তরণীয়, অতএব অতি গহনত্ব ধারণ করিতেছে। তাহাতে অতি উন্নত চিন্তারূপিনী তটী, আশা তটিনীর সীমাতিক্রমণে বাধা দিতেছে, বিশুদ্ধান্তঃকরণ যোগিশ্বরগণ এইরূপ ভীষণ নদীর পার পাইয়া নিত্য আনন্দ সুখ অনুভব করিতেছেন।

তপস্যা নিরত সাধুগণ ভিন্ন যাবতীয় মনুষ্যই সংসারের স্বাদ অনুভব করিতেছেন, দুঃখানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছেন, তথাপি আশার ছলনায় সংসারে বিমুগ্ধ। এমন বৈচিত্র আর আছে কি? জানি, সংসার ত্রিতাপময় কিন্তু সে জ্ঞান অচিরে মোহকূপে নিমগ্ন হইয়া যায়। বাসনা-সন্দেহ সমুদিত হইয়া অশেষ ভোগ সাধন জন্য প্রণোদিত করে। দেখিয়াও দেখিনা, বুঝিয়াও বুঝিনা, শুনিয়াও শুনিনা, এরূপ মোহোবর্ত্তে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইতেছি,

যদিও ক্ষণ-জ্যোতির বিকাশের ন্যায় অন্তরাকাশে জ্ঞান চন্দ্র-চন্দ্রিকা স্ফুরিত হয় তৎক্ষণাৎ প্রাবৃট্ কালীন কাদম্বিনীর ন্যায় মহামোহান্ধকার সমাগত হইয়া সমাচ্ছন্ন করে।

সংসারে শান্তি অতি দুর্ল্লভ। শান্তি রক্ষার জন্য সকলেরই যত্ন আছে, যাহাদের সমবায়ে এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংসার সঙ্গঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেকের আন্তরিক ইচ্ছা শান্তিদেবী চিরস্থায়িনী হউন, রাজা শান্তি বিধান জন্য বিধি-পূর্ব্বক শান্তিরক্ষক সংস্থাপিত করিতেছেন। তথাপি অশান্তির কালিমা-পরিপূর্ণ ঘোরছবি সমুপাগত হয়। ইহার প্রধান কারণ সংসার স্বার্থময়। যাহাদের সম্মিলনে এক একটী সংসার স্থাপিত হইয়াছে সকলেই স্বার্থ সাধনে তৎপর, স্বীয় স্বীয় স্বার্থ সাধনানন্তর যদি অবসর থাকে তবেই সংসারীর স্বার্থ সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। স্বার্থ সাধনে প্রধানের স্বার্থের ব্যাঘাত হইলেও অনেক সময় তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকে না। কেবল স্বার্থ লইয়াই অশান্তি। গৃহিনী গৃহীর প্রধান শান্তি স্থাপয়িত্রী কিন্তু গৃহিনী পতির প্রতি প্রীতি প্রকাশ, পতির জন্য, প্রায়ই করে না, যাহা করে অনেক সময়ই নিজের জন্য। পক্ষান্তরে গৃহী ও গৃহিনীর প্রতি যে প্রীতি প্রকাশ করেন তাহা গৃহিনীর নিমিত্ত নহে, স্বনিমিত্ত। যে স্থলে নির্নিমিত্ত প্রীতিহার পরস্পর পরিবর্ত্তিত হইয়া হৃদয়ে লম্বমান হয়, তথায়ই শান্তি-সুখ সঞ্চারিত হয়; কিন্তু অদৃষ্ট বিপাকে প্রায়ই তাহা ঘটিয়া উঠে না। ভয়ে শান্তি চিরকাল থাকে না। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় মনোবেগ অন্যত্র যাতায়াত করে, সুবিধা হইলেই সৈকত-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্বার্থ সাধনে প্রধাবিত হয়। সংসারে শান্তি অতি দুর্ল্লভ। মানুষের স্বার্থ ভিন্ন আবার ভৌতিক উৎপাতে অনেক সময় অশান্তিকে ডাকিয়া নিকটে উপস্থাপিত করে। যাহা স্বপ্নেও ভাবা যায় না এমন অচিন্ত্য ঘটনা আসিয়া বিলক্ষণ অশান্তি জন্মাইয়া দুঃখ সাগরের অতল-তলে ডুবাইয়া দেয়, আর তাহার উদ্ধার নাই, কেবল দিবানিশি অশান্তি, উদ্বেগ, চিন্তা দেহ মন পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

সংসারাসক্ত, পরমার্থ ছাড়িয়া অর্থে অপেক্ষাকৃত অনুরক্ত। অর্থার্জ্জন না হইলে ভোগ-তৃপ্তি হয় না। তৃপ্তির আশা হয় কিন্তু প্রায়ই তৃপ্তি হয় না, রূপ রসাদি বিষয় নিচয় ইন্দ্রিয় গ্রামকে উন্মত্তবৎ করিয়া ফেলে। বলবান ইন্দ্রিয়গণ নিরন্তর বিষয় মদিরার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে, যদি চরিতার্থতা ঘটে

তথাপি নিবৃত্তি নাই, ক্রমেই প্রবৃত্তির অধিকার বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সুতরাং তৃপ্তি নাই সুখ নাই। যত কেন অর্থাগম হউক না আকাঙ্ক্ষার বিরাম নাই, আবার অভিপ্রায়ানুরূপ অর্থলাভ ও ভাগ্যবশে অনেকের ঘটে না, সুতরাং আশান্তি ও উদ্বেগ। অনেকে যথোচিত গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেও অসমর্থ, কাজেই পদে পদে দুঃখ। কাহার ইচ্ছানুরূপ ধন জুটিলেও জন জুটেনা, কাহার জন জুটিলে ধন জুটে না, কাহার বা উভয় সন্দর্শনই আজন্ম ঘটিয়া উঠে না। কেহ রুগ্ন, কেহ শীর্ণ, কেহ স্থূলতায় জড়বৎ। সংসারে প্রকৃত সুখ কাহারও আছে কি না জানি না, কিন্তু দেখি নাই। সংসার সর্ব্বথা দুঃখময়, দুঃখ বিদূরিত করিবার বাসনা সকলের অন্তরেই জাগরূক। কেহ দৃষ্ট উপায়কে সংসার ক্লেশ অপসারণের সাধন স্থির করিয়া তৎপ্রতি সাবধান হন। কিন্তু তাহাতে তাপত্রয় উন্মুলিত হয় না। কথঞ্চিৎ সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে মাত্র চির নিবৃত্তি হয় না। ঋষিগণ যাবতীয় দুঃখকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও অধিভৌতিক। এই দুঃখত্রয়কে ত্রিতাপও বলে। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলেন। দুঃখ ধ্বংসানন্তর ভূমানন্দ সঙ্গতিই পরম পুরুষার্থ ইহা সকলেরই মত। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যের প্রথম সূত্রই এই—

"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তি রত্যন্ত পুরুষার্থঃ ॥ ১ ॥

সাংখ্য কারিকারও প্রথম কারিকা তাহাই।—

"দুঃখ ত্রয়াভিঘাতা জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।"

যদিও যাবতীয় দুঃখই মানস, তথাপি দুখোৎপত্তির অবলম্বনানুসারে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। মনে অনুভব হইলেও কতক দুঃখ কেবল মনেই জন্মে, কতক দুঃখ শারীরিক, কতক প্রাণি জাত হইতে এবং কতক অগ্নিবায়ু প্রভৃতি দৈবকাণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে দুঃখ স্বীয় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় তাহা আধ্যাত্মিক, তাহা দুইভাগে বিভক্ত শরীর ও মানস। ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা যে যাতনা জন্মে উহা শরীর। মানস যাতনা অহরহই অনুভূত হইতেছে। ভূত অর্থাৎ, প্রাণিজাত হইতে যে ক্লেশের উৎপত্তি হয় তাহাকে আধিভৌতিক বলে। ব্যাঘ্র চৌর প্রভৃতির ভয়জাত দুঃখ আধিভৌতিক। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি হইতে আধিদৈবিক দুঃখ প্রবৃত্ত হয় যেমন দাহ শীতাদি।

এই ত্রিবিধ দুঃখনাশের বাসনা মানব মাত্রেরই আছে। সংসার বাসনা-শক্ত ভোগ-সুখিগণ দৃষ্ট উপায়কেই দুঃখ নাশোপায় স্থির করিয়া সাধন তৎপর হন। বস্তুতঃ দৃষ্টোপায়ে দুঃখের নিদান উন্মূলিত হয় না।

" ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধি র্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তি দর্শনাৎ ॥

সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য।

সকলেই দেখিয়াছেন ধনাদি দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিরাকৃত হয় না। যদিও কখন নিবৃত্তি হয় কিন্তু নির্ম্মূল হয় না। পুনরাগমন রুদ্ধ হয় না। ধনাদির ক্ষয় হইলে পুনর্দুঃখ। যদি ক্ষয় নাও হয়, তথাপি অন্য কোন দুঃখ আসিয়া আলিঙ্গন করে। রোগ হইলে যদিও ভিষকের উপদেশানুরূপ ভৈষজ্য সেবন করিয়া অনেক সময় নীরোগ হওয়া যায়, কিন্তু রোগের পুনরাবির্ভাব কে বারণ করিতে পারে? এইরূপ যদিও কোন দুঃখের প্রতীকারের উপায় চিন্তা করা যায় কিন্তু কোন উপায়েও সর্ব্বতোভাবে দুঃখবীজ বিধ্বংস হয় না। অথচ দুঃখের বিনাশ সাধনের আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে। কি আর্য্য কি যবন ম্লেচ্ছ সকলেই সুখী হইতে চায়। আবার প্রকৃত সুখ দুঃখ নির্ণয় করাও আর্য্য ও অনার্য্যের প্রভেদ আছে।

এক, পরকালে শ্রদ্ধাবান্, ইহকালের ভোগসুখকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন, ভূমানন্দে ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব পরিহার করিতেও উৎসুক। অন্যে, ইহকালকেই জীবনের ভোগ্য-কাল বোধে পান ভোজন কে সম্পূর্ণ স্থির সুখ জানিয়া তদুপযোগী ব্যবহারে প্রবৃত্ত। দেহ পাতোত্তর আর কিছু নাই সুতরাং শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই লৌকিক। ইঁহাদের অলৌকিক কিছুই নাই। আর্য্যগণ প্রথমাবধিই নিরোধ অভ্যাস করিয়া থাকেন। নিরোধে পশুত্ব পরিহার করিতে সতত যত্নশীল করে। মতিমানগণ আশু সুখ জনক কার্য্যে আসক্ত হন না, পরিণামের জন্য ব্যস্ত। যাহারা রাজস বা তামস তাহারাই বর্ত্তমানের জন্য বিলোল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পান ভোজ-নাদি বৈষয়িক সুখ-সুখ নহে, উহাতে কদাপি ত্রিতাপতপ্ত সংসারীর বিরাম নাই। সংসার থাকিলেই দুঃখ, অতএব সংসার সংহারের উপায় অন্বেষণ করা দূরদর্শিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্য ভিন্ন অন্য জাতিমাত্রেই সংসার সংরক্ষণে ব্যতিব্যস্ত। আর্য্যগণ সংসার সংহারে প্রয়াসী। একের বৈরাগ্য, অন্যের অনুরাগ। একের বৈরাগ্যবলে সমস্তে বিরক্তি, কেবল ব্রহ্মানন্দে

অনুরক্তি। অন্যের অনুরক্তি, কেবল বিষয়-বিলাসে।' এই পার্থক্য লইয়া সুশিক্ষা কুশিক্ষা, উন্নতি অবনতি প্রভৃতি বিবেচিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই মূল সূত্র প্রায়ই অবলম্বিত ও আলোচিত হয় না। এক, পরার্থ জন্য জীবন উৎসর্জনে ব্রতী, অন্যে স্বার্থোদর পরায়ণ। ঔদার্য্য ও সঙ্কীর্ণতার ইহাই পরীক্ষারস্থল। একে পশুপক্ষিগণকে পর্য্যন্ত আহার প্রদান করিয়া যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন। অন্যে নিঃস্ব নিরুপায় মনুষ্যকেও তিরস্কার করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা করিলে আর্য্য ও অনার্য্যের পার্থক্য বিবেচিত হইতে পারে।

সংসার যাতনা পরিহার করিবার বাসনা মানব মাত্রেরই হৃদয়ে বলবতী আছে। বাসনা আছে কিন্তু সাধনা নাই। সাধনার উপায় ও আর্য্যভিন্ন আর কোন জাতির নাই। আর্য্যগণের বাল্যাবধি তদনুরূপ শিক্ষা।

উপনীতবটুগণ আচার্য্য সমীপে অলৌকিক বেদাভ্যাস ও ইন্দ্রিয় সংযমন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। 'নিরোধ-সাধনে নিত্য যতন-শীল। তদবধি সংসার সংহারের সাধনার আরম্ভ। প্রাক্তন সুকৃতি বলে সেই ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমেই কাহার অন্তর বৃত্তি পরিস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া ভোগ বাসনা তিরোহিত হয়। উহারা নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহত হন। ভোগ বাসনা নাই, দারপরিগ্রহ নাই, সংসারের কুহকময় কপটচ্ছবি আর তাহাদের মন-মোহন করিতে পারে না, সংসারের জ্বালা যাতনা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভোগাসক্ত মোহান্ধের তামিস্রপূর্ণ কলুষিত নয়নে এবংবিধ সংসার শূন্য লোকগণও দুঃখী—তবে প্রকৃত সুঃখীকে? আর যাহারা পবিত্র আচার্য্যকুলে বাস করিয়া অমৃতময় ব্রহ্মোপদেশে হৃদয়ের কষায় বিদূরিত করিতে অশক্ত হইলেন তাহারা গৃহধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিয়মিতরূপে বিষয় ভোগ ও নিরোধ সাধনে যত্নবান হইতে থাকেন, এই জন্য ভারতে আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্টান। ক্রমে বর্ণোচিত আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া সংযমে দৃঢ়তা জন্মে, দৃঢ়তার অক্ষুণ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ভোগ বাসনা বিনিবৃত্ত হয়। সুতরাং সংসার, বৈরাগ্যসম্পন্ন সংযমীর নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে বিদায় লইতে থাকে। সন্তানের স্নেহময় মধুর ছবি আর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। কান্তার প্রীতিময় মোহন কর সংস্পর্শে আর প্রবৃত্তি হয় না

পরমার্থ বাসনা, অর্থাশাকে নির্মূল করিয়া দে। সংসারে যত কুহক আছে সমস্তই পরাঙ্মুখ হইয়া যায়। আর তা থাকে না কেবল ভূমানন্দে অন্তর পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত। সংসার জীবগণের লীলা ক্ষেত্র হইলেও চিরকাল লীলা বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতে হইলে প্রকৃত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। বিষয়-বিষ-কীটে দংশন করে নাই এমন লোক অতি বিরল। তথাপি মানব মন বিষয় বিষের জন্য লোলুপ। ইহা কুহক ভিন্ন আর কিছুই নহে। অসার সংসারে বিশ্ব বিজয়ী ভগবদ্ নামই সার। তিনি সত্য নিত্য নিরঞ্জন, তাহা ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। মিথ্যা বিষয়ে আসক্তি জন্মিলে অবশ্যই দুঃখ জন্মিবে। আমরা সংসারের এবম্বিধ কার্য্য কলাপ সন্দর্শন করিয়াও অনিত্য বিষয়-মদে মত্ত। এবং বিষয়ানুধ্যান-নিরত রাজস ও তামস জাতির অনুকরণে ব্যতিব্যস্ত। আমাদের অভ্রান্ত শাস্ত্র প্রতি পদে স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন, বিষয় মোহে মুগ্ধ হইও না সুপথের পান্থ হও, তথাপি আমরা বিজাতীয় সংস্পর্শে সম্পূর্ণ বিজাতীয় হইতেছি। আর শাস্ত্রের শাসন আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যাহা আশু সুখদায়ক সেই সমস্ত বিষয়েই প্রসক্ত হইতেছি, ইহা অধোগতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচার্য্য শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সংসারকে নাশ করিয়া উপযুক্ত হইতে প্রয়াসী থাকা মতিমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমরা মৌখিক বলিতে পারি সংসার সংহার কর, কিন্তু নিজে আসক্ত, আসক্তের নিকট বিরক্তির উপদেশ শ্রবণ করিবে কেন? যে বলিতে পারে করিতে পারে না তাহার অনুকরণ কে করিবে। যাহারা সংসার সংহার করিয়া নিস্পৃহ হইয়াছেন তাহারাও প্রারব্ধনাশ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষায় লোকালয় পরিহার পূর্ব্বক কান্তারাশ্রয় করিয়াছেন—উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন উপদেশ দেন না। কিন্তু বলবতী ইচ্ছার প্রণোদনে তদ্বিধ আচার্য্যের অভাব নাই। সংসার যাতনা দৃষ্টে সাবধান হইয়া নিত্য সুখের জন্য ইচ্ছা হইলেই যথেষ্ট মঙ্গল। নাবিক যেমন ধ্রুবনক্ষত্রকে লক্ষ্য রাখিয়া অকুল জলধি উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ জীবনের ধ্রুবতারা পরব্রহ্মকে হৃদয়ে স্থির রাখিয়া আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অধিকারানুরূপ প্রবৃত্ত হইলে ঐহিক ও পারত্রিক হিত সাধিত হইয়া সংসার বিনাশ পায়। এ ভবমণ্ডলে কিছু নিত্য নহে এরূপ ধারণা থাকিলেই নিত্য সুখের জন্য আন্তরিক চেষ্টা জন্মে,

এবং সেই চেষ্টা, কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলেই সংসার ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে নচেৎ কোনও স্বস্তি নাই।

"আয়ুঃ কল্লোল লোলং কতিপয়-দিবস-স্থায়িনী যৌবনশ্রীঃ,
অর্থাঃ সঙ্কল্প কল্পা, ঘনসময় তড়িদ্বিভ্রমা ভোগপূগাঃ।
কণ্ঠাশ্লেষাবগূঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎপ্রিয়াভিঃ প্রণীতঃ
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াম্ভোধিপারং তরন্তঃ॥

বৈরাগ্যশতকম্।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

শঙ্কর বিজয়।—শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। পুস্তক খানি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। তবে আমরা এরূপ ভাষার পক্ষপাতি নহি। সরল গদ্যে পুস্তক খানি রচিত হইলে আমাদের বিবেচনায় আরও সহজ হইত। যাহা হউক গ্রন্থকারের চেষ্টা সাধু।

আরও অনেকগুলি পুস্তক আমাদের নিকট সমালোচনার্থ আসিয়াছে। কিন্তু সময়াভাবে সে সমস্ত দেখিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ভরসা করি বিলম্ব জন্য গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

বে সং—

৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ৬ষ্ঠ খণ্ড।

আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে বেদান্তদর্শনের আত্মবিষয়ে মত কি, তাহা আলোচনা করা যাউক। বৈদান্তিকগণ বলেন এক মাত্র পরম ব্রহ্মই সৎ। নিত্য-মুক্ত-বুদ্ধ শুদ্ধ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ভিন্ন সমস্তই অসৎ, তিনি পরম প্রেমের-আধার ও পরমানন্দ স্বরূপ। তাঁহাতেই এই বিশ্বচরাচর অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহতী সত্তা লইয়াই জগৎপ্রপঞ্চ আপাততঃ সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সেই পরমাত্মাতেই আরোপিত জগৎ জীবের ভোগ্যস্থল। জীবই জগতের ভোক্তা, তিনি সাক্ষী স্বরূপ স্বতন্ত্র নির্লেপ। যেরূপ চিত্র পটে ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত অবস্থা চতুষ্টয় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরাৎপর পরমাত্মাতেও চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট্ অবস্থা চতুষ্টয় অনুমিত হয়, মণ্ডপাদি দ্বারা পটাদির শুক্লাকরণের নাম ধৌতাবস্থা; ও প্রস্তরাদি কঠিন বস্তু দ্বারা রেখাপাত পূর্ব্বক আকৃতি বিশেষ অঙ্কিত করাকে লাঞ্ছিতাবস্থা বলা যায়। এবং শুক্ল নীল-পীত লোহিত

প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন কোন একটী পুত্তলিকা চিত্র করণের নাম পটের রঞ্জিতাবস্থা বলিয়া থাকে। তাহার ন্যায় স্বপ্রকাশমান অমায়িক পরম ব্রহ্মের চৈতন্যকে চিদবস্থা বলা যায়। মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের চৈতন্য অন্তর্যামী অবস্থা ও সূক্ষ্ম সৃষ্টির উপাদান স্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে সূত্রাবস্থা, এবং স্থূল সৃষ্টির হেতুভূত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট অবস্থা বলিয়া থাকেন। পটাদিতে যেরূপ বিচিত্র পুত্তলিকাদি উত্তমাধম ভাবে অবস্থিতি করে; তাহার ন্যায় আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী, এবং গিরি নদ নদী মৃত্তিকা প্রভৃতি জড়পদার্থ সকল চৈতন্যময় পরমব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে যথাক্রমে উত্তমাধম ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং চিত্রিত পুত্তলিকাদির পৃথক্ পৃথক্ পরিধেয় বস্ত্রসকল যেমন নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকৃত বস্ত্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জগতে দেব তীর্য্যগ্ মনুষ্যাদির জীব চৈতন্য সকল পৃথক্ রূপে অবস্থিত। অজ্ঞানিব্যক্তিরা বিচিত্র বস্ত্রের শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণকে যেরূপ প্রকৃত বস্ত্রের বর্ণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারন্যায় স্থূলদর্শী-অজ্ঞানী লোক সকল জীবগণের সাংসারিক গতিকে পরম ব্রহ্মের সাংসরিক গতি রূপে বিবেচনা করে। তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মায়াময় অলীক সংসারকে পরমব্রহ্মধাম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। যে কারণে অজ্ঞানিব্যক্তিরা অনিত্য ও দুঃখকর সংসারকে পরম সুখপ্রদ জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহার কারণ অবিদ্যা. যথা—

> সংসারঃ পরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি।
> ইতির্বিদ্যা স্যাৎ বিদ্যয়ৈষা নিবর্ত্ততে॥

(পঞ্চদশী চিত্রদীপ)

এই সংসারই পরম পদার্থ, অর্থাৎ সর্ব্ব সুখের আকর। ইহার সহিত পরমাত্মার বিশেষ সম্বন্ধ আছে এইরূপ ভ্রান্তি জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সংসারের ও পরমাত্মার সহিত ইহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তিনি পত্রস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত এইরূপ প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যার (মিথ্যাজ্ঞানের) নাশ হয়। তখন অনিত্য দুঃখকর সংসারকে পরম পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় না। তখন জীবের জগৎকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। এবং নিত্য শুদ্ধ পরম ব্রহ্ম বিজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। সুতরাং ভ্রান্তি জ্ঞানরূপ অবিদ্যার অধিকার থাকিবে না।

উক্ত অবিদ্যা-শক্তি দ্বিবিধ, আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি। অদ্বিতীয় সনাতন পরম ব্রহ্মের এক মাত্র পারমার্থিক চিৎ (চৈতন্য) উপাধি ভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত। যেমন এক অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী আকাশ উপাধি বশতঃ ঘটাকাশ, পটাকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারন্যায় চৈতন্য পরমাত্মাও মায়া বশতঃ কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্ম চৈতন্য, জীব চৈতন্য ও ঈশ্বর চৈতন্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। তম্মধ্যে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যস্বরূপ অন্নময় (স্থূল শরীর) এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের (ক্ষিত্যপতেজ মরুদ্ব্যোমের) কার্য্যস্বরূপ প্রাণময় মনোময়, ও বিজ্ঞানময় কোষ ত্রয় লিঙ্গ শরীর বলিয়া খ্যাত। এবং উক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে সর্ব্বাধারভূত নির্ব্বিকার চৈতন্যই কূটস্থ চৈতন্য রূপে ব্যবহৃত। সেই সর্ব্বাধারভূত কূটস্থ চৈতন্যকে যে শক্তি আবৃত রাখিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইতে দেয় না, সেই শক্তির নামই অবিদ্যার আবরণ শক্তি। এবং শুক্তিকাদিতে দোষ বশতঃ তাহাকে যেমন রজতঃ, বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার ন্যায় যে শক্তি প্রবাহে অবিদ্যার আবরণ শক্তি দ্বারা সমাবৃত কূটস্থ চৈতন্যকে স্থূল শরীর ও লিঙ্গ শরীর বিশিষ্ট জীব চৈতন্যরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই শক্তি অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি। অতএব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবিদ্যা সমাবৃত কূটস্থ চৈতন্যই জীবাত্মা রূপে ব্যবহৃত। এবং তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা পর্য্যালোচনা করিলে, সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য সাধিত হয়। পরমাত্মা যেরূপ নিত্য জ্ঞান সুখস্বরূপ ও পরপ্রেমের আধার ভূত, তদ্রূপ জীবাত্মাও নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ এবং প্রেমময় সুস্পষ্টই প্রতীত হয়। এক্ষণে দেখা উচিত জীবাত্মা জ্ঞান স্বরূপ কি না? এবং জ্ঞান ভিন্ন জগতে অন্য কোন পদার্থের উপলব্ধি হয় কি না? বাস্তবিক প্রকৃততত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জগৎ জ্ঞানময়, জ্ঞানের অস্তিত্ব লইয়াই জগতের অস্তিত্ব। জ্ঞানভিন্ন সমস্তই অসৎ, একমাত্র জ্ঞানই সৎপদার্থ, জ্ঞানই জগতের মূল ভিত্তি, এবং এক ও নিত্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, গো, মনুষ্য ইত্যাদি যাহা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, বাস্তবিক জ্ঞান একই। জ্ঞানের একত্ব ভিন্ন, নানাত্ব প্রতীতি হয় না। কারণ আমি অনির্ব্বচনীয় রূপ দর্শন করিতেছি, ইহা যে জ্ঞান, আমি সুমধুর শব্দ শুনিতেছি ইহাও সেই জ্ঞান। কেবল জ্ঞানের বিষয় রূপ ও শব্দ পৃথক্। সেই রূপ আমি গমন করিতেছি

ও শয়ন করিতেছি ইহাও এক জ্ঞান মাত্র, জ্ঞানের বিষয় শয়ন ও গমন বিভিন্ন। তাহার ন্যায় কালান্তরে বৎসরান্তরে বা মাসান্তরে দিনান্তরে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহা সমস্তই এক। এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন, ও সুষুপ্তিকালে যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা বিভিন্ন নহে। এস্থলে অনেকেই আশঙ্কা করিয়া থাকেন, যে সুষুপ্তি কালে কোন জ্ঞানই জন্মে না, কারণ সুষুপ্তি কালে মনের সহিত ত্বগাদির সম্বন্ধ না হওয়ায়, সেই কালে কোন জ্ঞানই জন্মাইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান নিত্য হইতে পারে না, কারণ যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে সে বস্তু কখনই নিত্য নহে। অতএব জ্ঞানের সুষুপ্তি কালের ধ্বংস হইতেছে ও কোন সময়ে জন্মাইতেছে, অতএব জ্ঞান অনিত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এজন্য বৈদান্তিকগণ বলিয়া থাকেন সুষুপ্তি কালেও জ্ঞানের অভাব থাকে না, সে কালেও জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। কারণ সুপ্তোত্থিত মনুষ্যের আমি অতি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, বা আমি নিদ্রায় অতিশয় অভিভূত ছিলাম এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে, সুষুপ্তি কালেও জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। কারণ যে বস্তুর কখন জ্ঞান হয় নাই তাহার স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং যে সুষুপ্তি কালে জ্ঞান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যথা ঐ ব্যক্তির আমি সুখে নিদ্রায় ছিলাম এইরূপ স্মরণ হইতে পারে না। অতএব সুষুপ্তি কালেও জ্ঞানের সত্তা আছে ইহা অনুভব ও যুক্তিসিদ্ধ।

নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, বাস্তবিক সুষুপ্তিকালে জ্ঞান থাকে না। কিন্তু সুপ্তোত্থীত ব্যক্তির আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম এই-রূপ যাহা অনুভব হয়, তাহা বাস্তবিক স্মরণ নহে। সুপ্তোত্থানের পর তৎকালিক অবস্থা বা পরিশ্রম জন্য ক্লেশ দূর দেখিয়া, "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্তদার্শনিকগণ উক্ত জ্ঞানকে স্মৃতি স্বীকার করিয়া সুষুপ্তি কালেও জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অতএব সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে, জ্ঞান মাত্রেই এক ও নিত্য এবং জীবাত্মা জ্ঞানময় ও পরপ্রেমের আধার। আত্মপ্রেমই নিত্য, নশ্বর স্ত্রী পুত্রাদিতে প্রেম অনিত্য, কারণ স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু আত্ম প্রেমের কখন বিরহ ঘটে না। আত্মা পরম প্রেমাধার তাহাতে আর সন্দেহ কি? মনেকরুন, আপনার স্ত্রী পুত্রাদিকে এত ভাল বাসেন কেন? অবশ্যই স্বীকার করিবেন; পুত্র কলত্রাদি বন্ধুবর্গের প্রতি যে প্রেম

করিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের কোন উপকারার্থে নহে, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত। আপনার নিজের অভিষ্ট সাধনই ঐ স্নেহের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। কারণ পুত্রাদির প্রতি স্নেহ যদি তাহাদের কোন উপকারার্থ হইত, তাহা হইলে স্নেহের কোন ইতর বিশেষ থাকিত না, সকলের প্রতিই সমান স্নেহ হইত। আপনার স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি যেরূপ স্নেহ, উদাসীনের প্রতি যখন সেরূপ দেখা যাইতেছে না, তখন অবশ্যই স্বীকার্য্য, আত্ম সংসর্গী যাহারা তাহাদের প্রতি প্রেম হইয়া থাকে। উদাসীন আত্ম সংসর্গী নহে সুতরাং তাহার প্রতি মমতা জম্মে না। যদি বলেন, স্ত্রী পুত্র বন্ধু ধনাদি প্রেমময় এজন্যই আত্মার তাহাতে প্রীতি হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে, আত্মাই পরম প্রেমময় প্রতীয়মান হয়, ইতর বস্তু কখন প্রেম স্বরূপ হইতে পারে না, কারণ যদি স্ত্রী পুত্রাদি পরম প্রেমাধার হইত, তাহা হইলে উদাসীনের স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি ও মমতা দেখা যাইত। এবং আরও দেখুন, এক বস্তু কাহার প্রীতি বর্দ্ধন করে এবং অপরের হয়ত তাহাতে প্রীতি হয় না। যদি বস্তু প্রীতির আধার হইত, তাহা হইলে সকলেরই ঐ বস্তু প্রীতিকর হইত। অতএব সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন, মনুষ্যের রুচি বিভিন্নতা প্রযুক্ত যে যাহাকে ভালদেখে, সেই বস্তুই তাহার প্রীতি সম্পাদন করে। অতএব বস্তুর স্বতন্ত্র প্রীতি সম্পাদকত্ব নাই তাহাতে সন্দেহ কি? এবং আত্মপ্রীতি লইয়াই বস্তুর প্রতি সাধকত্ব আছে ইহাও বোধ হয়।

এবং আরও দেখুন সৌধ অট্টালিকা বা দুগ্ধফেণনিভশয্যা আপনার আদরের সামগ্রী, কেন তাহাতে আপনার এত মমতা? অবশ্যই বলিবেন অট্টালিকা আমার দুঃসহ আতপতাপ বা প্রবল ঝটিকা কিম্বা বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে আমার শরীর রক্ষা করে, এজন্য আমার এত তাহাতে প্রীতি। অতএব দেখুন আপনার শরীর রক্ষা করে এজন্য অট্টালিকায় এত মমতা, অন্য ব্যক্তির অট্টালিকায় আপনার শরীর রক্ষা করে না এজন্য তাহাতে আপনার মমতা বা তাহা ভগ্নাবশেষ হইলে দুঃখ কিম্বা পুন সংস্করণে প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যাহা আপনার প্রীতিদায়ক তাহাতে আপনার মমতা জন্মিবে। অন্যের প্রতি প্রীতি হয় না, কারণ তাহা আপনার নহে, এজন্য তাহাতে মমতা নাই। অধিক কি যে শরীরকে আমরা পরমপ্রীতির আশ্রয় করিয়া থাকি, যাহার কান্তি বৃদ্ধি করিবার

জন্য কতই চেষ্টা করিয়া থাকি, যাহাতে আমাদের এত মমতা, যাহার শ্রীবৃদ্ধি হইলে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না, যাহাতে সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে আমরা কতই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, সেই শরীরও প্রকৃত প্রস্তাবে পরম আধার নহে। অন্যান্য বস্তু সকল শরীরের সুখ সাধক এবং সেই শরীর আত্মার প্রীতিদায়ক এজন্য শরীরে এত মমতা। শরীর যদি আত্ম সংসর্গী না হইত, তবে শরীরে মমতা থাকিত না। অতএব শরীর অপেক্ষা আত্মাই আদরের সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ কি? কারণ শরীরের অবয়ব যদি ক্ষত বিক্ষত হয়, তাহা হইতে লোকে ইহাই প্রার্থনা করিয়া থাকে, অঙ্গ যায় যাউক জীবন থাকিলেই হইল। অধিক কি এই কান্তিময় শরীর যখন জীর্ণ শীর্ণ পূতিগন্ধময় হইলে, ইহাই লোকে প্রার্থনা করিয়া থাকে, শরীর যাউক তত ক্ষতি নাই, প্রাণ থাকিলেই হইল, জীবন থাকিলেই সব হইবে। যদি এমন কেহ প্রার্থনা করিত প্রাণ যায় যাউক, শরীর থাকুক তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতাম শরীরই প্রেমময়, আত্মা প্রীতির আশ্রয় নহে। শরীর প্রেমময় হইলে মৃত শরীর লইয়া আত্মীয় স্বজন অনায়াশে সযত্নে রক্ষা করিত, স্নেহময়ী জননী মৃত শিশুর অনুপম শরীর সযত্নে ক্রোড়ে রক্ষা করিতেন। অতএব সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন শরীর পরম প্রীতিময় নহে। পরম প্রেমাধার আত্মার কিঞ্চিৎ-কাল সংসর্গ হওয়াতে যে শরীর প্রীতির আশ্রয় হইয়া থাকে, সেই শরীর অপেক্ষা আত্মা প্রেমময় তাহা আর কাহাকে বুঝাইতে হইবে? এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে, যদি আত্মাপরমানন্দ স্বরূপ হইল, তবে সকল সময়ে সেই পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? একটু অনুধাবন করিলে সহজেই এ আশঙ্কা দূর হইতে পারে। যেমন কোন স্থানে বালকগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিলে, তন্মধ্যগত নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথক্ রূপে শ্রুত হয় না, কেবল অব্যক্ত কোলাহল মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, তখন শ্রবণ ও অশ্রবণ উভয়েই সমান। যদিও তাহাতে সুস্পষ্ট কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বিমিশ্রভাবে স্বীয় বালকেরও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুনিতে পারিলেও যেমন তাহার বোধ হয় না, তাহারন্যায় সংসারাবস্থায় জীবের কাম, ক্রোধ, কামনা, বাসনা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক বশতঃ পরমানন্দ অনুভব হয় না। উক্ত বিষয়ানু-রাগরূপ প্রতিবন্ধকই পরমানন্দ বোধের প্রতিবোধক। প্রতিবন্ধক দূর হইলে

আত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের অনুভব হইতে পারে। এবং জীবের অনিত্য দুঃখময় সংসারে এত আশক্ত হইবার কারণ একমাত্র অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান) ও তাহার কারণস্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থা স্বরূপ। যথা "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" সাঙ্খ্যসূত্র। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধা মায়া ও অবিদ্যা। এবং যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যৎকালে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে। এবং যৎকালে প্রকৃতি ঐ সত্ত্বগুণের মালিন্যভাব আশ্রয় করে, তখন তাহাকে অবিদ্যা বলে। অতএব একই প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যা নামে খ্যাত। এবং উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সমন্বিত চৈতন্যই জীবাত্মা নামে খ্যাত। এক্ষণে আত্মা বিষয়ে বেদান্ত দর্শনের মত সংক্ষেপে লিখিত হইল। বারান্তরে এবিষয়ে সাঙ্খ্যও পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতির মত প্রদর্শিত হইবে।

মুক্তিবাদ

তত্রস্বতঃ প্রয়োজনং সুখং তদ্ভোগো দুঃখাভাবাশ্চ।
তত্ত্বঞ্চ অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং নতু প্রয়োজনা-
ন্তরাজনকত্বে সতি প্রয়োজনত্বং, সুখসাক্ষাৎকাররূপং
ভোগং প্রতি বিষয়তয়াজনকে সুখেঽব্যাপ্তেঃ ॥ ২ ॥

সেই প্রয়োজন আবার দ্বিবিধ—এক স্বতঃ প্রয়োজন বা মুখ্য প্রয়োজন, দ্বিতীয় গৌণ প্রয়োজন বা পরতঃ প্রয়োজন, এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে, সুখ, সুখভোগ ও দুঃখাভাব, স্বতঃ প্রয়োজন।

"আমার সুখ হউক ও আমার সুখভোগ হউক" এইরূপ দ্বিবিধ কামনা লোকের হইয়া থাকে, তাই সুখ ও সুখভোগ উভয়ই স্বতঃ প্রয়োজন। ভোগ শব্দে সাক্ষাৎকার। এক কথায় বলিতে গেলে "যাহা অন্যেচ্ছানধীন-

ইচ্ছা বিষয় (যে ইচ্ছা অপর ইচ্ছার অধীন নহে তাহার বিষয়ীভূত বস্তুকে অন্যেচ্ছানধীন-ইচ্ছা বিষয় বলা যায়) তাহাই স্বতঃ প্রয়োজন" অর্থাৎ ইহা স্বতঃ প্রয়োজনের লক্ষণ এবং ইহার উদাহরণ সুখাদি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। "অন্যেচ্ছানধীন-ইচ্ছা বিষয়" কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি—

যে বস্তুর প্রতি অভিলাষ হয় তাহাই প্রয়োজন বা প্রয়োজনীয়, আহার-বিহার-সুখ-প্রেম সকলই প্রয়োজন কেন না ইহাদিগের প্রতি অভিলাষ হইয়া থাকে। অভিলাষ আর ইচ্ছা এক পদার্থ। ফল—যাহা ইচ্ছা-বিষয় তাহার নাম প্রয়োজন। স্বভাবতঃই লোকের আহার-বিহার আমোদ-প্রমোদ হাস্য-পরিহাসে অভিলাষ হয়, কৈ উপবাসাদি কষ্টকর বিষয়ে ত তাহা হয় না। ইহার কারণ কি?—কারণ সুখেচ্ছা। প্রাণীগণ সর্ব্বদাই সুখের অন্বেষণে ফিরিতেছে। যে কার্য্যে সুখ আছে বলিয়া বোধ করে তাহাতেই তাহার অভিলাষ জন্মে। আবার বিষম-দুঃখে অভিভূত ব্যক্তির বিষপান—উদ্বন্ধন অনাহারাদিতেও ইচ্ছা হয়, সে ভাবে "আমি যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহার পক্ষে, বিষপানাদি যন্ত্রণা অকিঞ্চিৎ কর"। এই সকল কার্য্যে ইচ্ছার প্রতি দুঃখ পরিহারেচ্ছা কারণ। অন্যান্য প্রয়োজনের পক্ষে এইরূপ নিয়ম বটে কিন্তু সুখেচ্ছা বা দুঃখপরিহারেচ্ছা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। অন্য কোন ইচ্ছা তাহার প্রতি কারণ নহে। সুখ বা দুঃখ পরিহার,—যে ইচ্ছার বিষয়ীভূত তাহা অপর ইচ্ছার অধীন অর্থাৎ তদ্দ্বারা উৎপাদিত নহে। এখন "যে ইচ্ছা অপর ইচ্ছার অধীন নহে তাহার বিষয়ীভূত বস্তুকে অন্যেচ্ছানধীন-ইচ্ছা-বিষয় বলা যায়" কথাটা স্মরণ করিয়া বুঝিয়া দেখ।

কিন্তু যাহা প্রয়োজনান্তরের জনক নহে অথচ প্রয়োজন তাহাই স্বতঃ প্রয়োজন" এরূপ লক্ষণ হইতে পারে না। কেন, ইহা লক্ষণ হইলে দোষ কি? ভোজনাদি, অন্য প্রয়োজনের সুখাদির জনক; অতএব তাহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নাই এবং সুখাদি অন্য প্রয়োজনের জনক নহে অথচ প্রয়োজন, অতএব ইহাতে লক্ষণের অব্যাপ্তি নাই, তবে ইহাতে কি দোষ আছে যে লক্ষণ হইতে পারে না। দোষ অব্যাপ্তি দোষ আছে—স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতেগেলে কোন দোষই বোধহয় না বটে কিন্তু বস্তুগত্যা সুখেই অব্যাপ্তি হইতেছে, কিরূপে তাহা বলিতেছি—

যাহাকে জানা যায় অর্থাৎ যাহা জ্ঞা-ধাতুর কর্ম্ম—মোটা মুটি তাহাকেই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া বুঝ। যেমন ঘট জ্ঞানের—বিষয় ঘট। যে যে কারণ থাকিলে প্রত্যক্ষ (জ্ঞান বিশেষ) হইয়া থাকে, বিষয়, তাহার মধ্যে অন্যতম কারণ। ঘ্রাণ, আস্বাদন, দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ এবং মনন এই ছয়টী কারণে যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষও ছয় প্রকার। গন্ধ,—ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষের বিষয়; সকল কারণ সত্ত্বেও একগন্ধ না থাকিলে গন্ধ প্রত্যক্ষ হয় না। রস,—রাসন প্রত্যক্ষের বিষয়, সকল কারণ সত্ত্বেও একরস না থাকিলে রস প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ সুখও মানস প্রত্যক্ষের বিষয়, সুখ না থাকিলে, কিছুতেই সুখ-প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষের কারণান্তর সত্ত্বে বিষয়ের সত্তা ঘটিলে অবাধে তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই জন্যই বিষয়, প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভোগ শব্দে সাক্ষাৎকার, (প্রত্যক্ষ বিশেষই) আত্ম সুখেরই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ হয়, পরকীয় সুখ অনুমানে বুঝাযায় ইহা বলাই বাহুল্য এবং ইহাও বলিয়াছি সুখ ও সুখ ভোগ—,স্বতঃ প্রয়োজন; এখন দেখ—সুখ একটী প্রয়োজন, সুখভোগ আর একটী প্রয়োজনান্তর এবং সুখ,—সুখভোগের বিষয়, বিষয় বলিয়াই সুখ,—সুখ ভোগের জনক বা কারণ হইয়া উঠায়, সুখ, "যাহা অন্য প্রয়োজনের জনক নহে অথচ প্রয়োজন" তাহার অন্তর্গত বা স্বতঃ প্রয়োজন-লক্ষণের লক্ষ্য হইতেছে না। লক্ষ্যে লক্ষণ সংগতি না হওয়াকে অব্যাপ্তি ও অলক্ষ্যে লক্ষণ সংগতি হওয়াকে অতিব্যাপ্তি বলে। সুখ যে স্বতঃ প্রয়োজন লক্ষণের লক্ষ্য ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অথচ লক্ষণ সঙ্গতি না হওয়ায় সুখে অব্যাপ্তি হইতেছে। এখন বুঝিলেত কেন বলিতেছি "এরূপ লক্ষণ হইতে পারে না"।

অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ভোজনাদিই গৌণ প্রয়োজন, কেন না সুখাদি রূপ ফলানুসন্ধান বশতঃই ভোজনাদিতে ইচ্ছা জন্মে, অর্থাৎ ভোজনাদিতে যে ইচ্ছা তাহা অন্যেচ্ছায় সুখেচ্ছা বা দুঃখ পরিহারেচ্ছায় অধীন ইহা পূর্ব্বেই একরূপ বলিয়াছি।

শরীর না থাকিলে সুখ দুঃখানুভব হয় না বলিয়া শরীর,—সুখ দুঃখাদির অবচ্ছেদক। যে সুখের অবচ্ছেদক শরীর, দুঃখের অবচ্ছেদক হয় না, ও যে সুখের অব্যবহিত পূর্ব্ব ও অব্যবহিত পরসময়ে স্বাধিকরণ (ঐ

সুখের আশ্রয়। আত্মাতে দুঃখ সম্বন্ধ না থাকে, সেই সুখই দুঃখ মিশ্রিত নহে এবং তাহাই স্বর্গ; এই স্বর্গ যেমন স্বতঃ প্রয়োজন, তর্কশাস্ত্রাদির ফল স্বরূপ মুক্তি ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি একেবারে সমস্ত দুঃখ ধ্বংস (দুঃখাভাব) ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং উহাও সেইরূপ স্বতঃ প্রয়োজন মোক্ষ প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য এবং মুক্তিবোধক তর্কশাস্ত্রের ন্যূনতা পরিহারার্থ, মুক্তি যে স্বতঃ প্রয়োজন ইহা কথিত হইল।

"হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা।'

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে এবং যত প্রকার ধর্ম্মের মর্ম্ম আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম; হিন্দু ধর্ম্মের নিকট অন্য ধর্ম্ম উপধর্ম্ম বা বিকৃত ধর্ম্মের ন্যায় প্রতীতি হয়।

আপাততঃ অনেকে আমাদের এ সিদ্ধান্তকে সংস্কারমূলক বা ভ্রমমূলক বলিয়া উপহাস বা পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্বীয়ানুষ্ঠিত ধর্ম্মকে সকলেই অভ্রান্ত মনে করেন। এবং অন্যানুষ্ঠিত ধর্ম্মকে উপধর্ম্ম বা ভ্রম সঙ্কুল জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমি তথাবিধ সংস্কারের বা রীতির বশম্বদ হইয়া এ প্রবন্ধ প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইনাই। মৎপ্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তি এবং তর্কে ভ্রম দেখাইয়া দিলে এবং তাহা বিচার সহ হইলে অবশ্যই তদ্বিষয় স্বীকার করিব।

যদিও হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে বহু মনস্বী মহাত্মাদিগের মস্তক বিলোড়িত হওয়ায় তদ্বিষয়ে নূতন বলিবার কিছুই নাই বলিলেও হয়, তথাপিও বিক্ষিপ্ত বিষয় সকলের একত্র সন্নিবেশাত্মক প্রবন্ধ প্রকটন অপ্রাসঙ্গিক নহে। বিশেষ বেদব্যাসে বেদের ও বৈদিক ধর্ম্মের সমালোচনা

প্রাসঙ্গিক বলিতে সকলেই সম্মত হইবেন এবিষয়ে ভূমিকার বিস্তৃতি নিষ্প্রয়োজন।

বিদ্বেষ-বাদিদিগের পক্ষপাত পরিপুষ্ট দৃষ্টিতে যে সকল দোষপ্রদর্শিত হইয়াছে যথাস্থানে তন্নিরসনও এপ্রবন্ধের উদ্দেশ্য রহিল।

১ম। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা প্রধান; যেহেতুক হিন্দুধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম।

২য়। বেদ, সমুদয় ধর্ম্মপুস্তক হইতে প্রধান; যে হেতুক বেদ অতিশয় প্রাচীন ধর্ম্ম পুস্তক। বেদের পূর্ব্বে কোন দেশেও কোনপ্রকার সম্প্রদায়ীর কোনও প্রকার ধর্ম্ম পুস্তক প্রকাশ পায় নাই।

৩য়। সকল প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী লোকেই স্বস্ব ধর্ম্ম পুস্তককে অভ্রান্ত ও ঈশ্বরের উপদেশ পরিপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদ যেরূপে স্বীয় অভ্রান্ততা এবং ঈশ্বরের উপদেশ পরিপূর্ণতার প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবে, অন্যবিধ ধর্ম্ম পুস্তক, (কেবল পুস্তক কেন?) অন্যবিধ ধর্ম্মাবলম্বিতার্কিকগণও বেদাতিরিক্ত ধর্ম্ম পুস্তকের অভ্রান্ততা বা ঈশ্বরের উপদেশ পূর্ণতার প্রমাণ করিতে শক্ত হইবেন না। (এই স্থানে বেদশব্দ প্রতিপাদ্য ঋক্ যজু সামাদির ন্যায় বেদার্থোপনিবন্ধ্ স্মৃতি পুরণাদি ও পরিগ্রহ করিতে হইবে)।

৪র্থ। প্রতিকূল বাদ-বিতণ্ডা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মাতিরিক্ত ধর্ম্ম পুস্তক ভ্রম সঙ্কুল বলিয়া যেরূপ সহজে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, বেদে তাদৃশ বাদ-বিতণ্ডা দ্বারা কোন ব্যক্তিরও ভ্রম প্রদর্শন করার সামর্থ্য নাই। অনেকের বিষদন্ত বেদাত্মক যন্ত্র দ্বারা উৎপাটিত বা বিচূর্ণিত হইয়াছে। নাস্তিক দিগের প্রতিকূলাদি কুজ্ঝটিকা দ্বারা আচ্ছাদিত-দৃষ্টি অল্পজ্ঞের নিকট বেদ অদৃশ্য হইলেও কুজ্ঝটিকা বা মেঘদ্বারা দিনকরের আবরণ অসম্ভবের ন্যায় বেদের আবরণ অসম্ভব নিবন্ধনই সুপ্রকাশিত ভাবে বেদ বা বৈদিক ধর্ম্ম চিরকাল কাল যাপন করিয়া আসিতেছে।

৫ম। বেদ, অপৌরুষেয় বলিয়া বহুবাদি সম্মত এবং সর্ব্বপ্রমাণ গরিষ্ট রূপে পরিগৃহীত। হিন্দুধর্ম্মাতিরিক্ত ধর্ম্ম পুস্তকের অপৌরুষেয় (পুরুষ প্রণীত নয় বলিয়া) প্রবাদও হইতে পারে না। কারণ অন্য ধর্ম্মের প্রচারকের সহিত তদ্ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তার নামও প্রকাশিত রহিয়াছে যথা শাক্যসিংহ, নানক, খিস্ত, মহম্মদ্ ইত্যাদি। সেই সেই বিখ্যাত নাম এখন আর বিলুপ্ত করারও সুযোগ নাই।

৬ষ্ঠ। মতভেদে বেদ, পুরুষপ্রণীত বা প্রকাশিত হইলেও সেই বেদ প্রণেতা বা প্রকাশক বিশ্বস্রষ্টা, স্বয়ম্ভূ, সাকার শরীরী, ব্রহ্মা, ভিন্নখৃষ্ট বা মহম্মদের ন্যায় পার্থিব শরীরী কোনও ব্যক্তি হইতে পারিবেন না, কারণ সেইরূপ কোনও ব্যক্তি থাকিলে অবশ্যই তাঁহার নাম ও প্রকাশিত থাকিত। হিন্দুধর্ম্মানুসারে সাকার, দেব, তৈজস শরীরী যথাস্থানে তদ্বিষয় বর্ণিত হইবে।

৭ম। ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বৈদিক সময় নিরূপণ করিতে হইলে তাহার অঙ্ক অঙ্কিত করার সুবিধা নাই, কারণ তত পরিমাণ বোধক অঙ্ক প্রচলিত নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তকের গতজীবন প্রায়শঃ ঊনবিংশত শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়। আর্য্যবংশীয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় ও বিংশতি শতাব্দীর অভ্যন্তরস্থ বিক্রমাদিত্যের বহু সহস্র বা কোটিশঃ বৎসর সময় পূর্ব্বেও বেদ প্রচলিত ছিল। যথা স্থানে সপ্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

৮ম। বেদকে লক্ষ্য করিয়া পরজাত বিধর্ম্মী, গ্রন্থপ্রণেতাগণ অনেক বার বিবিধ ভাবে ভ্রুকুটী বদন করিয়া মর্কট মুখের অভিনয় প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন কিন্তু বেদ-দর্পণে স্বীয় বিকৃত মুখ বিলোকন করিয়া ভীত ভাবেই বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সারাংশ গ্রহণ বা অপহরণ করিয়া স্ব স্ব মত পরিপোষণ বা চৌরবৎ বিভূতি বিকাশ করিয়া বাহাদুরী গ্রহণ করিয়াছেন।

৯ম। আস্তিক বা নাস্তিক যে কোন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক স্ব স্ব মত পোষণ করিয়াছেন তাহার সারাংশই বেদভাণ্ডার হইতে অপহৃত বা পরিগৃহীত। ইহা তন্ন তন্ন রূপে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে, কিন্তু বেদ অন্যধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত একথা অদ্য পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় নাই। কেবল শ্রীভগবদ্গীতা খানি উদার মত-পোষক বাইবেল পাঠের পরে বেদব্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া গীতার মন্তব্যে বঙ্কিম বাবুর সাহেবী সমালোচনা দর্শন করিয়া ছিলাম।

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বেদ কতকালের ধর্ম্মপুস্তক তদ্বিষয়ের নিশ্চয়রূপে নিরূপণ করা নিতান্ত কঠিন। প্রকৃত ইতি বৃত্তের বিরহই তাহার কারণ। তবে বেদ সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে তৎপূর্ব্বে আর কোন প্রকার ধর্ম্মপুস্তক প্রচলন ছিল না। এমন কি বেদের পূর্ব্বে আর কোনও

প্রকার ভাষা ছিল না। বেদ হইতেই প্রথম শব্দের শক্তিগ্রহ হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বেদ পূর্ব্বিকাসৃষ্টি, অর্থাৎ বেদ হইতে শব্দ সকল পরিজ্ঞাত হইয়াই বিধাতা বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত দর্শনে (শারীরিক সূত্রে) উক্ত হইয়াছে।

"শব্দ ইতি চেন্ন অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং।"

ব্যাখ্যা।

"দেবানাং বিগ্রহবত্ত্বে বৈদিকে বস্বাদিশব্দে দেবতাবাচিনিবিরোধঃ স্যাৎ বেদস্যাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গাদিতি নাস্তি বিরোধঃ। কস্মাদতঃ শব্দাদেব জগতঃ প্রভবাদুৎপত্তেঃ। প্রলয়কালেপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিতঃ স ইহকল্পাদৌ হিরণ্যগর্ভস্য পরমাত্মন এব প্রথম দেহিমূর্ত্তের্নস্তবস্থান্তর-মাপন্নঃ সুষুপ্তপ্রবুদ্ধস্যেব প্রাদুর্ভবতি। তেন প্রদীপস্থানীয়েন স্মরনরতীর্থ্যা-গাদি প্রবিভক্তং জগদভিধেয়ভূতং নির্ম্মিমীতে। কথমিদং গম্যতে প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষং শ্রুতিরনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্মৃতিমনুমীয়মানশ্রুতিসাপেক্ষত্বাৎ।

অর্থ।

দেবতা দিগের শরীর থাকিলে বৈদিক বসু প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্দে বিরোধ হয় এবং বেদের আদিমত্ত্ব [অর্থাৎ বসুপ্রভৃতি দেবতারপরে বেদ হইয়াছে এইরূপে বেদ সাদি (আদির সহিত হইল) অনাদি হয় না], প্রসঙ্গ হইল। এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, ইহাতে কিছুই বিরোধ নাই কারণ এই বৈদিক শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে (সুতরাং বেদ পূর্ব্বিকা সৃষ্টি হইলেই বেদ অনাদি সিদ্ধ হইল)।

এই স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে প্রলয় সময়ে বেদ সকল কিরূপে কোথায় ছিল? ইহারও উত্তর করিতেছেন। প্রলয় কালেও সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মাতে

বেদ রাশি অবস্থিত ছিল। কল্পের আদিতে সেই বেদরাশি পরমাত্মারই প্রথম দেহিমূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মনে প্রথমতঃ উদিত হয়, যেমন সুষুপ্তাবস্থাপন্ন ব্যক্তির পূর্ব্বকথা সকল অবিকল রূপে স্মরণ পড়ে এইরূপে ব্রহ্মারও মনে বেদ সকল উদয় হইল।

সেই প্রদীপ স্থানীয় (আলোক ময়) বেদ দ্বারা তমসাচ্ছন্ন সুর, নর, পশু, পক্ষি প্রভৃতি পরস্পর বিভক্ত জগৎকে বিধাতা নির্ম্মাণ করিলেন। কিরূপে ইহা অবগত হইলে (অর্থাৎ বেদ হইতে শব্দ সকল জ্ঞাত হইয়া বিধাতা বিশ্বনির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহা কিরূপে জানিলে?) ইহার উত্তর করিতেছেন।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানই এই বিষয়ের প্রমাণ রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রুতি (বেদ) যে হেতুক বেদ কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া নির্ম্মিত হয় নাই। ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী স্বয়ং দর্শন করিয়াই বেদ বিকাশ করিয়াছেন। এবং অনুমান স্মৃতি; অনুমান বিষয়ীভুত শ্রুতিকে অপেক্ষা করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র যে হেতুক নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃজদগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দিব ইতি পিতৄন্ তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহাণাবসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানিতি শস্ত্রমিতি সৌভগে তান্যাঃ প্রজাঃ।—শ্রুতির সারার্থ এই, বেদ হইতে শব্দজ্ঞান হইয়া দেবাদি প্রবিভক্ত (স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে)। জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।

"সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণিচ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্ময়ে॥

মনু ১। অং ২১।

কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যা।

স পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেষাং নামানি গো-জাতের্গৌরিতি অশ্বজাতেরশ্ব ইতি। কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নাদীনি ক্ষত্রিয়স্য প্রজা রক্ষণাদীনি যস্য পূর্ব্বকল্পে যান্যভবন্ আদৌ সৃষ্ট্যাদৌ বেদশব্দেভ্য এবাব-

গম্য নির্ম্মিতবান্। পৃথক্ সংস্থাশ্চেতি লৌকিকীশ্চ ব্যবস্থাঃ কুলালস্য ঘট-নির্ম্মাণং কুবিন্দস্য পটনির্ম্মাণাদিকা বিভাগেন নির্ম্মিতবান্। ২১।

ভাষা।

সেই পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে (ব্রহ্মারূপে) অবস্থিত হইয়া গো-জাতির গো, এবং অশ্বজাতির অশ্ব ইত্যাদি রূপে সমুদয় জাতির নাম, এবং ব্রাহ্মণের বেদাধ্যায়নাদি ষট্ কর্ম্ম এবং ক্ষাত্রিয়ের প্রজারক্ষণাদি যাঁহার যাঁহার পূর্ব্ব কালের যেই যেই কার্য্য ছিল, তাঁহাদিগের সেই সেই কার্য্যে নিয়োজন স্বষ্টির আদিতে বেদশব্দ হইতেই অবগত হইয়া নির্ব্বাচন ও নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন।

এবং লৌকিকী ব্যবস্থা সকলও যেমন কুলালের (কুম্ভকারের) ঘটাদি নির্ম্মাণ ব্যবস্থা এবং কুবিন্দের (তন্তুবায়ের, তাঁতির) বস্ত্র নির্ম্মাণ ব্যবসা প্রভৃতি জীবিকা সকলও যথা বিভাগ ক্রমে বেদ হইতেই নির্ম্মাণ করিয়া ছেন। ২১।

পূর্ব্বোক্ত শারীরিক সূত্র ও ভাষ্য এবং মনু ও তট্টীকা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, বেদকে অবলম্বন করিয়াই বিধাতা বিশ্ব স্বজন ও ব্যবসা নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিভাগ ক্রমে করিয়াছেন। এই স্থলে বিশেষ বিবেচ্য এই যে প্রলয় কালে সূক্ষ্মরূপে বেদরাশি পরমাত্মাতে কি ভাবে অবস্থিত ছিল; এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্নত্রয় হইতেছে। ১। প্রলয় কালে সূক্ষ্মরূপে বেদ রাশি পরমাত্মাতে অবস্থিত ছিল এইস্থলে বৈদিক গ্রন্থ সকল কি ঈশ্বরে বিলয় হইয়া গেল। বৃহদায়তন জড়াত্মক বৈদিক গ্রন্থ সকল পরমাত্মাতে লয় হওয়ার পক্ষে অনুমান দেখা যায় না। ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু এবং আকাশের লয় সম্বন্ধে বৈদিক মত অযৌক্তিক নহে। যেমন আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি

---

(১) আনুক্রমিক ঈশ্বর হইতে উৎপত্তি এবং ব্যুৎক্রমে লয়ের বিষয়ও বেদান্তে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, বিস্তৃতিভয়ে তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা গেল না।

অনুলোম ক্রমে হইয়াছে এবং প্রলয় সময়েও পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে অগ্নি বায়ুতে বায়ু আকাশে আকাশ নিরাকার পরমেশ্বরে বিলোম ক্রমে লয় হইয়াছে (১) কারণে কার্য্যের বিলয় ও সূক্ষ্মরূপে অবস্থান দার্শনিক দিগেরও মত বটে। বেদের শ্রবণাধীন শ্রুতি সংজ্ঞা, পরে লেখার প্রণালী হওয়াতে গ্রন্থাকারে লিখিত হইতে লাগিল (২) তাল পত্রাদি বা কাগজে লিখিত বেদ পুস্তকের লয় অগ্ন্যাদিতেই প্রত্যাক্ষানুমান সিদ্ধ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মেলয় সম্ভব পর বোধ হয় না বা দেখাযায় না।

২য়। বেদ সঙ্কলনের বর্ণাবলী সকল আনুপূর্ব্বীক ক্রমে ঈশ্বরে লয় সম্বন্ধেও মত ভেদ নানা আপত্তি উত্থিত হয়। কেহ বলেন বর্ণ সকল নিত্য "সএবায়ং শব্দোয়ঃ পূর্ব্বমুপালব্ধ ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।" যেই ঘটাদি শব্দ শ্রবণে প্রথমতঃ আমাদিগের প্রযোজ্য বৃদ্ধ (জানিক শঙ্কেত বিশিষ্ট ব্যক্তি) প্রয়োজক বৃদ্ধ ব্যবহার দ্বারা কম্বুগ্রীবাদিমান্ পদার্থাদিতে শক্তিগ্রহ হইয়াছিল, কালান্তরে বা দেশান্তরেও তাদৃশ আনুপূর্ব্বব্যবচ্ছিন্ন বর্ণাবলী বিশিষ্ট ঘটাদি শব্দ শুনিলেও সেই কম্বুগ্রীবাদি বিশিষ্ট পদার্থাদিরই প্রতীতি হয়।

শব্দ নিত্য না হইলে এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান (পূর্ব্বানুভবপদার্থের বর্ত্তমান কালে তাদৃশ রূপে জ্ঞান) হইতে পারে না। এবং বর্ণ সকল অনিত্য হইলে শব্দ শ্রবণান্তর শব্দ বোধ হওয়ার কালে গৃহীত সঙ্কেতার্থক অন্য শব্দের বিনাশ হইলে অগৃহীত সঙ্কেতার্থক অন্য শব্দই উপস্থিত হয়, সুতরাং পরে ঘট শব্দ শুনিলে আর ঘটত্বাবচ্ছিন্নের বোধ হইতে পারে না। "তে যদ্যনিত্যাঃ স্যুস্তর্হি গৃহীতশঙ্কেতার্থস্য প্রধ্বংসে সতি অগৃহীতশঙ্কেত ইদানীমন্যএব ব্যবহার কালে উপলভ্যত" ইতি। এইমতে বেদের ন্যায় স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি সকলই নিত্য হইতেছে। এইমত সকলের গ্রাহ্য নহে।

১। আকাশাদ্বায়ুঃ বায়ুরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীচোৎপদ্যতে তদেতস্মাদ্বা আকাশ সম্ভূত ইতি শ্রুতেঃ।

বেদান্তসারে।—

২। ষাণ্মাসিকেতু সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রা ক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ ক্রমাৎ।

আহ্নিকাচারতত্ত্ব।

৩। বর্ণের অনিত্যবাদী বলেন্ "বর্ণাশ্চ কণ্ঠতাল্বাদি ক্রমানুবিধায়ি জন্মানঃ কথং নিত্যাভবিতু মর্হন্তি।" বর্ণ সকল কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানে বায়ুর অভিঘাত জন্য নিস্পন্ন হয় তাহারা কিরূপে নিত্য হইবে? সুতরাং বর্ণ সকল উচ্চারণ প্রধ্বংসী বটে। এই মতে সকল বর্ণময় শাস্ত্রই অনিত্য হইয়া উঠে। এই মতানুসারিরা বেদকেও অনিত্য বলিবেন। অথচ বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব অনেকেই স্বীকার করেন। এবং ব্রহ্ম সনাতনং" ঋক্ যজুঃ সাম লক্ষণং বেদত্রয় ব্রহ্ম ও নিত্য। "অপৌরুষেয়ানি বেদবাক্যানি" বেদবাক্য সকল পুরুষ প্রণীত নহে। ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তাচ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ। বেদের কেহ কর্ত্তা নাই বেদের স্মরণ কর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা "বেদে কর্ত্তুরভাবাচ্চ দোষাশঙ্কৌবনাস্তিনঃ" বেদে কর্ত্তার অভাব বলিয়া বেদোক্ত বাক্য দোষের আশঙ্কা ও আমাদের নাই। ইত্যাদি মনু দুর্গসিংহোক্ত এবং স্মৃতির বচনানুসারে বেদকে নিত্য বলেন।

বেদের অনিত্য বাদিরা বলেন "বাক্যত্বাৎ পৌরুষেয়ত্বং ইদানীন্তন বাক্যবৎ"। বৈদিকপদ কদম্ব বাঙময় নিবন্ধন পুরুষ প্রণীত বর্ত্তমান কালোচ্চরিত বাক্যের ন্যায়। পরস্পর এই বিরুদ্ধ মতান্তর থাকিতেও নাস্তিক ব্যতীত আর্য্য সন্তান মাত্রেই বেদেকে অভ্রান্ত ও সর্ব্ব প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন এই বিষয়ের সূক্ষ্মানু সন্ধান করিলে দেখা যাইবে সকলই বেদ বিষয়ের অবিসম্বাদিত মতাবলম্বী। জ্ঞানার্থক বিদ ধাতু (ঘঞ প্রত্যয়) নিস্পন্ন বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। প্রণয়কালে সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মাকে "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য জ্ঞানময় ব্রহ্মে মতভেদে জ্ঞানবান্ ব্রহ্মে বৈদিক জ্ঞান সকল "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" কোনও ভূতকে (প্রাণীকে) হিংসা করিও না ইত্যাদি বৈদিক জ্ঞান সকল সূক্ষ্মরূপে (অব্যক্ত রূপে) অবস্থিত রহিল জ্ঞানময় ব্রহ্মে বৈদিক জ্ঞান সকল থাকিতে কাঁহারও আপত্তির বিষয় নাই। কল্পের আদিতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আত্মায় সেই বৈদিক জ্ঞান সকল উদিত হওয়াতে তিনি বেদ বলিলেন বেদ শব্দ হইতে শব্দার্থ জ্ঞাত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন (মতভেদে এখনও ব্রহ্মাকে বেদকর্ত্তারা বেদস্মর্ত্তা বলুন্ তাহাতে আপত্তি রহিল না) এই নিমিত্তেই বেদের নাম ব্রহ্ম, পরব্রহ্মাবস্থিত পদার্থ ব্রহ্মা হইতে প্রকাশিত হওয়াতে বেদের নাম ব্রহ্মরূপে খ্যাত হইল, যথা—"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" ভগবদ্গীতা। "এবং ব্রহ্ম সনাতনং" মনু।

কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্ম বেদোদ্ভব বেদত্রয় ব্রহ্ম নিত্য ইত্যাদি। এই নিমিত্তেই (ব্রহ্মা হইতে প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই) ভাষার নাম ব্রাহ্মী বলিয়া বিখ্যাত "ব্রাহ্মীতুভারতীভাষা গীর্ব্বাক্ বাণী সরস্বতী" ইত্যমরাভিধানং। এই ব্রাহ্মী ভাষায় সংস্কার করিয়াই সংস্কৃত সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই অনেকানেকের সিদ্ধান্ত। অনেকে বলেন ব্রাহ্মী ভাষা স্বতন্ত্র নহে সংস্কৃত ভাষার নামই ব্রাহ্মী, ব্রহ্ম সংস্কৃত ভাষা দ্বারাই বেদ উচ্চারণ করেন এই নিমিত্তেই সংস্কৃত ভাষাকে দৈবীভাষাও ব্রাহ্মী ভাষা বলে "সংস্কৃত নাম দৈবীবাগন্বাখ্যাত মনীষিভিঃ" কাব্যদর্শ। এই মতে লোকের ভূষণরূপ ভাষাকেই সংস্কৃত বলে (ভূষণার্থে সুট প্রত্যয় নিস্পন্ন সংস্কৃত শব্দ) যাহা হউক ব্রহ্মীভাষা বা সংস্কৃত ভাষা যে সকল ভাষার পূর্ব্ব জাতা তদ্বিষয়ে কোন দেশীয় সভ্য পণ্ডিতের ও মতান্তর নাই।

ক্রমশঃ

"আগমনী।"

"এবার আমার উমা এলে আর আমি পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্‌ব না॥"

এস মা! এই রোগ শোক পরিপূর্ণ আমাদের ভগ্ন কুটীরে এস মা! মা, এক এক বৎসরে যে কত বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটিতেছে, কত পাপ তাপ আসিয়া আমাদিগকে যুড়িয়া বসিতেছে তাহাত তুমি সকলি জান; তবে তোমার কাছে দুঃখের কথা বলিলে বড়ই তৃপ্তি হয়। মা একটা বড় অভিমান্ হয়—দুঃখ হয় যে তোমার ত আমরা সকলেই ছেলে, সকলেই ত তোমাকে মা বলিয়া ডাকি, তবে আমাদের আব্দার রাখ না কেন? আমাদের ইচ্ছা হয়—মা তুমি আমাদের নিকটে থাক, আমাদের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া, কাঠামভরা ঠাকুর সাজিয়া, আনন্দময়ি, আমাদের দুঃখদারিদ্র্য পরিপূর্ণ সংসারে বাস করো। আমরা জানি যে জননী আদর যত্ন করিয়া দুষ্ট ছেলে সকল গুলিকে শান্ত করিয়া থাকেন, কত দৌরাত্ম্যই সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু মা, তুমি কি আমাদের কোলে লও, না যত্ন কর; এই যে আমরা কত কষ্ট পাইতেছি, আমাদের কত কুবুদ্ধি ঘটিতেছে, তুমি কি সকল সংবাদ রাখ?

অরূপিণি—সামান্য খেলিবার দুই চারিটি চুকচুকে সামগ্রী দিয়া কোথায় লুকাইয়া থাক, তাহা ত স্থির করিতে পারি না, কত খুঁজিয়া বেড়াই তবুও তোমাকে পাই না। তবে নাকি বৎসরান্তে নিজ মাতাঠাকুরাণী মেনকারাণীর সম্মান রাখিবার জন্য কৈলাস ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া থাক তাই তোমার রাঙ্গা পা দুখানি দেখিতে পাই। কিন্তু মা এবার আর তোমাকে যাইতে দিব না।

উমে! এস মা! মা এস, এস, এত বলিতেছি, কিন্তু তোমাকে আবার আসিতে বলিতেও ভয় হয়। মা তুমি রাজরাজেশ্বরী, কুবের তোমার ভাণ্ডারী, আবার তুমি বড়মানুষের মেয়ে সাজিয়াছ, এ দুঃখী দরিদ্রদিগের গৃহে কি তুমি আসিবে? তোমাকে আসিতে হইলে বাহনগুলি ত সঙ্গে আসিবেন? মা আমাদের নিজের খাইবার ভাত নাই, পরিধেয় বসন নাই, আমরা অতি দীন হীন, তোমার সঙ্গীগণের আদর, যত্ন, আপ্যায়িত করিতে পারিব না। দরিদ্রের মা হইয়া যদি আসিতে পার ত আসিও। তারা, সর্ব্বদুঃখাপহারিণি, নিস্তারিণি, মা! কিম্বা তুমি যদি সুশাণিত অসি হস্তে দিগম্বরী বেশে, লোলরসনা, করালবদনা, ভারতবক্ষে সংহার নৃত্য করিতে পার; যদি তুমি ভৈরব নাদে দিক্‌পালগণকে বিকম্পিত করিয়া ম্লেচ্ছপদবিদলিত ভারতক্ষেত্রে আমাদের রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, উলঙ্গিনি, আসিও। একবার যেমন শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছিলে, অনন্তকোটি রাক্ষসের শোণিতে তোমার বিষম পিপাসা মিটাইয়াছিলে, পাপভারাক্রান্তা ধরিত্রীর ভার হরণ করিবার জন্য সর্ব্ব-সংহারিণী বেশে সৃষ্টিকৌশল কে বিক্ষুব্ধ ও সঙ্কুচিত করিয়াছিলে, তেমনি করিয়া যদি এ ম্লেচ্ছাচার-পূর্ণ, যবনীকৃত ভারতবর্ষকে নররক্তস্রোতে বিধৌত করিয়া দিতে পার ত আসিও। সত্য বলিতে কি মা, যেমন দিন কাল পড়িয়াছে, যে প্রকার বিষম পাপার্ণবে আমরা ডুবিয়া আছি, তাহাতে আর বাঁচিবার কোন সাধ নাই। কিসের জন্যই বা বাঁচিব, যাহার ঘর নাই, দুয়ার নাই, অন্নবস্ত্রও নাই, যাহারা পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতেছে তাহাদের বাঁচিয়া লাভ?

দুর্গে! এস মা! কাঙ্গালের পর্ণকুটীরে এস মা! ত্রিনয়নি! তুমি ত মা ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান দেখিতে পাও, তোমার কাছে ত মা ভিতর—বাহির নাই; জ্ঞানদে, এমন কিছু দেও মা, যাহাতে এই অজ্ঞান—তিমিরান্ধ—আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, আমাদের পাপবুদ্ধি দূরে যায়। অভয়ে, সংসারের এ ভীষণ বিরাট রূপ দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছি মা, এ অনন্তসাগর

পার হইতে পারিব কি না—জানি না। মা গো সর্ব্বদুর্গতিনাশিনি, আমাদের এ দুর্গতি নাশ কর, মা। শক্তিরূপিণি! এ জড়বুদ্ধিপূর্ণ দেশে সঞ্জীবনী-শক্তির তড়িদ্বেগে জীবন-সঞ্চারিত করিয়া দেও মা। তোমার ছেলে বলিয়া পরিচয় দিবার যে আমরা উপযুক্ত নহি তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি, তবে মা—তুমি ত সর্ব্বকালেই আমাদের মা! তবে কেন এত দুঃখ। মা, তুমি সর্ব্বদুঃখহরা, তবে আমাদের এত দুর্দ্দশা কেন? অন্যের কাছে ছলনা কর ক্ষতি নাই, কিন্তু সর্ব্বস্বহীনের সহিত, রোগী ও সন্তপ্তের সহিত, তোমার শিশু সন্তানের সহিত এত ছলনা কেন মা! নৃত্যকালি—নাচিতে নাচিতে কোথায় লুকাইয়া থাক, কি প্রচ্ছন্ন ভাব অবলম্বন কর তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব।

"গিরি, প্রাণগৌরী আন আমার; উমা বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আঁধার।" এস মা, ঐ শুন তোমার পাষাণী মা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, তুমি নাই তাই আমাদের ঘর আঁধার, তোমার প্রাণজুড়ান মূর্ত্তি না দেখিলে, তোমার সেই স্নেহমাখা, হাঁসিভরা মুখ খানি না দেখিলে মনের তৃপ্তি হয় কৈ? এস মা, তোমার লক্ষ্মী সরস্বতী লইয়া, তোমার কার্ত্তিক গণেশ লইয়া, শরদুৎফুল্ল-কেতকী-কুমুদকহ্লার লইয়া, কাশ-কুসুম লইয়া, হাঁসি হাঁসি চাঁদনি যামিনী লইয়া এস মা। মা তুমি আসিবে শুনিয়া আমরা দিন গণিতেছি, নিরানন্দময় আমাদের গৃহেতে হাঁসির জ্যোৎস্না রেখা ফুটাইয়াছি, দুঃখ-দারিদ্র্য পূর্ণ অন্নবস্ত্রবিহীন আমাদের পর্ণকুটীরে নূতন বস্ত্র আনিয়াছি, ঐ দেখ ছোট ছোট বালক বালিকাগুলি মা আসিবেন শুনিয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া গলিয়া পড়িতেছে, আমোদে-আহ্লাদে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মা এস মা!

মা—তোমায় কতক্ষণ হইতে এস এস বলিতেছি, কত করিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু মা সত্য করিয়া বলত "মাতা বর্ত্তমানে এ দুঃখ সন্তানে, মা বেঁচে তার কি ফল বলনা" এই কথাটি ঠিক কি না? মা তুমি থাকিতে আমরা এত কষ্ট পাই কেন? যাহাদের মা অন্নপূর্ণা তাহারা অন্নের জন্য হা হা করিয়া বেড়ায় কেন? যাহাদের মা রাজরাজেশ্বরী তাহারা লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্র পরের কাছে ভিক্ষা করিতেছে কেন? যাহাদের মা কমলা তাহারা দুই এক পয়সার জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়ায় কেন? যাহাদের মা বরাভয়-প্রদায়িনী দনুজদলনী রণরঙ্গিনী উন্মাদিনী

তাহারা এত ভীত লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত কেন? অথবা মা তুমি যে দশমহা-বিদ্যা সাজিয়া দশদিক আলো করিয়া পিনাকী কে ত্রস্ত ভীত করিয়া পিতৃগৃহে আসিয়াছিলে, সে কি ইন্দ্রজাল, না সত্য সত্য তোমার ঐশ্বর্য্যরাশি? যদি তাহাই হয়, তবে মা আমাদের এমন অবস্থা কেন, খাইতে কুলায় না, পরিতে কুলায় না—এমন অকুলান কেন হইল? যে বুদ্ধি ছিল, যেমন মেধাবী ছিলাম, যে বিদ্যা কৌশল ছিল, যেমন জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ ছিলাম, সে সকল গেল কোথায়? মা, চরাচর বিমোহিনি, কোন মোহজাল বিস্তার করিয়া আমাদিগকে এমন হতবুদ্ধি করিয়াছ! কিন্তু মা "ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশি, না হয় ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মাগি খাব, মা বলে আর কোলে যাব না।"

দশভুজে দশদিকপ্রসারিণি, দুর্গতিনাশিনি, এস মা! মা তোমার সে জগন্মোহিণী মূর্ত্তি যেন চক্ষের উপর দেখিতেছি। মা তুমি যে দুখানি হস্তে অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া আছ, সে কাহাকে রক্ষা করিবে বলিয়া, ঐ অপর হস্তে করাল ব্যালের সহিত অসুরের কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতেছ দক্ষিণ হস্তে ধনু এবং বামদিকের আর এক খানিতে তীর কেন মা, এত সাজ সজ্জা কিসের? মা সর্ব্বেশ্বরি, তোমাকে কে এত হেতি, পেতি, যন্ত্র মন্ত্র দিয়া সাজাইয়া তুলিয়াছে, অমন সুশাণিত চক্র, অঙ্গুলির উপর লইয়া ঘুরাইতেছ, মা গো স্বয়ং চক্রপাণী বিষ্ণুই যে ভয় পাইবেন! আবার মা ঐ ঊর্দ্ধে অমন যেন লুকান ভাবে কাহাকে বরাভয় প্রদান করিতেছ, ও শঙ্খ লইয়া বিকট নাদে কি চরাচর স্তব্ধ করিবে! মা তোমার হাত গুলির দিকে তাকাইলে ভয় হয় নিজে নিজেই চক্ষু বুজিয়া আইসে 'অত সাজ সজ্জা করিওনা মা! দুঃখীর গৃহে আসিলে তোমাকে মনের কথা খুলিয়া বলিব, দুঃখযাতনা সব জানাইব, তোমার পা দুখানি ধরিয়া না কাঁদিলে তৃপ্তি হয় না, শান্তি পাই না, সর্ব্বমঙ্গলে! মা প্রসন্না হও। যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে শ্যামা তুমি নাচিতে নাচিতে আইস, অথবা সর্ব্বদুর্গতিহরা দশভুজা হইয়াই আইস একবার আসিতেই হইবে। তোমাকে অকালে ভগবান রামচন্দ্র ডাকিয়া-ছিলেন তুমি তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলে, বিপদে পড়িয়া শ্রীমন্ত তোমায় ডাকিয়াছিল, তুমি কাঁদিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছিলে "বল পদ্মা বল প্রাণ চঞ্চল কেন হ'ল বল কিসেরি কারণ", ভগীরথ ডাকিয়া ডাকিয়া কুলপাবনী তরঙ্গিনী গঙ্গা কে আনিতে পারিলেন না—শেষে "একবার মা বলিয়া ডাক

দেখিরে সূর্য্যবংশ চূড়ামণি" এই উপদেশমত মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে ধরাধামে আনিয়াছিলেন। "ডাকার মতন ডাক দেখি ভাই কেমন মা তোর রইতে পারে"—মা — ডাকার মতন ডাক জানি না — মা তুমি, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া থাকি—এবং মা বলিলেই যে ডাকা হয় তাহাই জানি—মা আয় মা—আয়!

"দেবীপ্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য,
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।"

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে।

অথ আদ্যাস্তবঃ।

প্রাগ্‌দেহস্থো যদাহং তবচরণযুগং নাশ্রিতো নার্চ্চিতোহম্‌
তেনাদ্যাকীর্ত্তিবর্গৈঃ জঠরদহনগৈর্ব্বধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ
স্থিত্বা জন্মান্তরং নঃ পুনরিহ ভবিতা ক্বাশ্রয়ঃ ক্বাপি সেবা
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ১॥

বাল্যে বাল্যাভিলাষে জড়িত জড়মতিঃ বাললীলা প্রসক্তো
নত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষ-হরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্‌
নাচারো নৈব পূজা নচগুন-কথনং নস্মৃতিঃ নৈব সেবা
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ২॥

প্রাপ্তোহং যৌবনঞ্চেদ্বিষধর-সদৃশৈ-রিন্দ্রিয়ৈ র্দষ্টগাত্রো
নষ্ট-প্রজ্ঞঃ পরস্ত্রী পরধন হরণে সর্ব্বদা সাভিলাষঃ
ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা নস্মৃতোহং কদাপি
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ৩॥

প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃকলত্রার্থমন্নাদিচেষ্টঃ
ক্বপ্রাপ্তিঃ কুত্রবানীত্য নিশমনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ
নস্তে ধ্যানং ন চর্চ্চা নচ ভজনবিধিঃ নাম সংকীর্ত্তনং বা
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ৪॥

বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ
কর্ম্মানর্হোঽতিহীনঃ প্রগলিত-দশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ
পশ্চাত্তাপেনদগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যানমাত্রং নচান্যৎ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ৫॥

কৃত্বাস্নানং দিনাদৌ ক্বচিদপি সলিলং নাহৃতং নৈবপুষ্পং
নৈবেদ্যাদি চেষ্টা ন ক্বচিদপিচ কৃতা নাপি ভাবো নভক্তিঃ
ন ন্যাসো নৈবপূজা নচগুনকথনং নাপিচর্চ্চা কৃতা তে
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ৬॥

জানন্নিত্বাং ভবানীং ভবভয়হরনীং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাত্রীম্
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যশুদ্ধাং দয়াঢ্যাং
মিথ্যাকার্য্যভিলাষৈঃ অনুদিনমভিতঃ পীড়িতোদুঃখ-সংঘৈঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ৭॥

কালাভ্র শ্যামলাঙ্গীং বিগলিত-চিকুরাং খড়্গমুণ্ডাভিরামাং
ত্রাসত্রানেষ্টিদাত্রীং কুণপগণ-শিরোমালিনীং দীর্ঘদেহীং
সংসারৈকসারাং জনুমরণ-হরাং ভাবিতোভাবনাভিঃ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ৮॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশঃ পরিণমতি পদাম্ভোজযুগ্মং সদাতে
ভাগ্যাভাবান্বিতোঽহং নচজননি ভবৎ পাদপদ্মং ভজামি
নিত্যং লোভৈঃ প্রমোহৈঃ কৃত বিবশমতিঃ কামুকস্ত্বাং যযাচে
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ৯॥

রাগৈঃ দ্বেষৈঃ প্রমোহৈঃ কলুষজড়তনুঃ কামভোগানুলুব্ধঃ
কার্য্যাকার্য্য-বিচারে কুলমতিঃ রহিতং কৌলসঙ্গৈর্ব্বিহীনঃ
ক্বধ্যানন্তে ক্বচার্চ্চা ক্বচমনুজপনং নৈবকিঞ্চিৎকৃতোঽহং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে॥ ১০॥

রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ কৃপণপরবশঃ পাংশুলঃ পাপচেতা
নিদ্রালস্য-প্রসক্তঃ স্বজঠর-ভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা
কিন্তে পূজা বিধানং ক্কচতব নমতিঃ ক্কানুরাগঃ ক্কাচাস্থা
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১১ ॥

মিথ্যাব্যামোহবর্গৈঃ পরিবৃত মনসঃ ক্লেশসংঘাবৃতস্য
ক্ষুত্তৃণ্ড নিদ্রা-স্বিতস্য স্মরণবিরহিণঃ পাপকর্ম্মপ্রবৃত্তেঃ
দারিদ্রস্য ক্কধর্ম্মঃ ক্কচভজনরুচিঃ ক্কস্থিতিঃ সাধুসঙ্গে
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১২ ॥

মাতাস্তাতস্যদেহাজ্জননীজঠরগঃ বিস্মৃতঃ শুদ্ধদেহং
ত্বংকর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্ম্মহেতু স্বরূপা
ত্বংবুদ্ধি শ্চিত্ত-সংস্থাত্বমপিচজগতি সর্ব্বমেব ত্বমম্ব
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১৩ ॥

ত্বংভূমিস্ত্বং জলৌঘ স্ত্বমসিহুতবহ স্ত্বংজগদ্বায়ুরূপা
ত্বঞ্চাকাশো মনস্ত্বং প্রকৃতিরসিমহৎ পূর্ব্বিকাহং কৃতিস্ত্বং
আত্মাচৈবাসি মাতঃ সকল মপিসদাত্বং পরং নৈবকিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১৪ ॥

ত্বং কালী ত্বঞ্চতারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবীত্বং
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসিচভুবনা ত্বংহি লক্ষ্মীঃ শিবাত্বং
ধুমা মাতঙ্গিনীত্বং ত্বমসিচবগলা হিঙ্গলা মঙ্গলাখ্যা
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিত-বদনে কামরূপে করালে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্কর স্বামিবিরচিতঃ।

আমাদের অনুগ্রাহক এবং গ্রাহকবর্গকে বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে ৺পূজার তিন দিন তাঁহারা যেন অঞ্জলি দিবার পর ভক্তি বিশুদ্ধচিত্তে করযোড়ে মাতৃ সন্নিধানে উপরুক্ত স্তোত্রটি পাঠ করেন। বে সং।
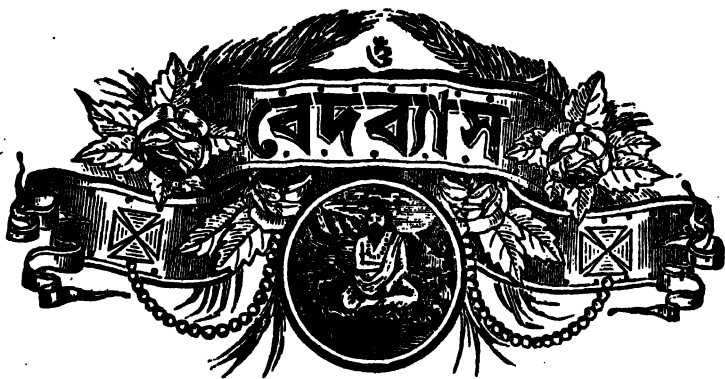
৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ৭ম খণ্ড।

"হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা।" *

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সেই ব্রাহ্মীভাষায় বা সংস্কৃতভাষায় বিনির্ম্মিত বেদ কতকালের পুস্তক তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে দেখা যায় সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের মান ৪৩,২০০০০ বৎসর। যথা—

বস্বক্ষিগত্ররিপুরন্ধ্র মানাঃ।
বেদারসাষ্টভুজবহ্নিবেদাঃ।

---

* এ প্রবন্ধটী কেবল শাস্ত্রীয় যুক্তি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এবং একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত, সুতরাং বর্ত্তমান শিক্ষিত মণ্ডলীর ইহা পাঠ্য বলিয়া মনে ধরিতে না পারে। তবে যাঁহারা শাস্ত্র বিশ্বাসী তাঁহারা অবশ্য পাঠে আনন্দ পাইবেন। পরে না হয় স্বকপোল কল্পিত যুক্তি শুনান যাইবে। বেঃ সং।

এতানি শূন্যত্রয়তাড়িতানি।
যুগাব্দসংখ্যাপরিকীর্ত্তিতানি॥

জ্যোতিষ।

অস্যার্থঃ।

বসু ৮ অক্ষি ২ মৈত্র ১৭ অঙ্কের বামগতি বলিয়া ১৭২৮০০০ বর্ষ সত্য যুগের মান।

রিপু ৬ রন্ধ্র ৯ মাস ১২ ঐ নিয়মে ত্রেতার মান ১২৯৬০০০ বৎসর। পূর্ব্বাঙ্কের এক চতুর্থাংশ ত্যাগ করিয়া ইহাতে তিন ভাগ অঙ্ক।

বেদ ৪ রস ৬ অষ্ট৮ ঐ নিয়মে ৮৬৪০০০ বৎসর দ্বাপরের মান। ইহাতে প্রথমাঙ্কের অর্দ্ধাঙ্ক।

ভুজ ২ বহ্নি ৩ বেদ ৪ ঐ নিয়মে ৪৩২০০০ বৎসর কলিযুগের মান ইহাতে প্রথমাঙ্কের চার ভাগের এক ভাগ আছে। এই সকল অঙ্কের সমষ্টি ৪৩,২০০০০ বৎসর হইল।

বেদাঙ্গাত্মক সূর্য্য সিদ্ধান্তের মধ্যাধিকারেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—

" সূর্য্যাব্দসংখ্যায়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ "।

ইহার গূঢ়ার্থ প্রকাশক ব্যাখ্যানে উক্ত হইয়াছে। যথা—

" অঙ্কনাং বামতো গতিরিত্যনেন
দ্বাত্রিংশদধিকচতুঃশতমিতৈঃ।
অযুতেন দশসহস্রেণ গুণিতৈঃ "॥

৪৩২ কে দশ হাজার দিয়া গুণিত করিলে ৪৩২০০০০, ফল হইল। ইহা যুগ চতুষ্টয়ের সমষ্টি মান জানিবে।

কলিযুগের মান হইতে কলির গত বর্ষের সংখ্যা ৪৯৮৯ বৎসর তদ্বিষয়ে প্রমাণ " বর্ত্তমান শকাব্দেশ্চ রন্ধ্রসপ্তেন্দুবহ্নিভিঃ। যোগেন লব্ধো যোঽঙ্কঃ স্যাৎ গতাব্দঃ স কলেঃ স্মৃতঃ "। জ্যোতিষ।

" রন্ধ্র মুনি চন্দ্ররাম শক মিসাইয়া তায়।
এক করিয়া দেখ কলির কত বৎসর যায় "॥

রন্ধ্র ৯ মুনি ৭ চন্দ্র ১ রাম ৩ অঙ্কের বামগতি নিয়মানুসারে ৩১৭৯ সহিত শকাব্দা ১৮১০ অঙ্কের যোগ করিলে ৪৯৮৯ বৎসর।

৩১৭৯

১৮১০

৪৯৮৯ ফল।

এই বর্ষের দিনপঞ্জিকাতে উপরি নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক দেখিতে পাইবেন। এই অঙ্ক বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধি হয় এবং গত পঞ্জিকাতে এই অঙ্কের হ্রাসও দেখিতে পাইবেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ ও বানর হইতে মনুষ্য হইয়াছে এই মতবাদী ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সহিত আমরা এইস্থলে ঐকমত্য হইতে পারিতেছি না। তাঁহারা পৃথিবীর সৃষ্টি পাঁচ হাজার বৎসর বলেন, আমাদের মতে কলিরই গত জীবন ১১ বৎসর ন্যূন পাঁচ হাজার বর্ষ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরীয় সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের মানাধীন—

১৭২৮০০০ সত্যের মান

১২৯৬০০০ ত্রেতার মান

৮৬৪০০০ দ্বাপরের মান

৩৮৮৮০০০ সকলের সমষ্টিতে

কলির গতাব্দ মান ৪৯৮৯

৩৮,৯২,৯,৮৯

যখন শাস্ত্রমতে সত্যের আদিতে বেদ প্রকাশ হইয়া থাকে তখন আটত্রিশ লক্ষ বিরানব্বুই হাজার নয় শত ত্রিরাশী বর্ষ যে বেদ প্রচারের সময়, শাস্ত্রানুসারেই নির্ণীত হইতেছে। ইহাতে মন্বন্তর সংখ্যা গৃহীত হয় নাই। এই অঙ্কের সংখ্যা দেখিয়াই অনেকে বিস্মিত হইয়া উপহাস তৎপর হইবেন। বিশেষ উপহাসের কারণ যে, কোন সাহেব বৈদিক সময় এতকাল স্বীকার করিবেন না। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভাষা দ্বারা ৫০০০ বর্ষের ঊর্দ্ধে বেদ প্রকাশিত সময় বলিতে চাহিবেন না। কিন্তু হিন্দুদিগের মতে যুধিষ্ঠিরাব্দাও পাঁচ হাজার বর্ষের অধিক কাল। ১১ বৎসর ন্যূন

কলির পাঁচ হাজার বর্ষ গত হইল যুধিষ্ঠির দ্বাপরাবসানের লোক সুতরাং ৫০০০ হাজার বর্ষের উর্দ্ধের লোক।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বেবেদও প্রচার ছিল। কহ্মণরাজতরঙ্গিনীর মতে যুধিষ্ঠির দ্বাপরাবসানে কলির সন্ধিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। যথা—"গতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষুচ ভূতলে। কলের্গতেষু বর্ষেষু অবভন্‌ কুরুপাণ্ডবাঃ। এই মতে কলির ৬৫৩ বর্ষের সময়ে প্রাদুর্ভব স্থিরহয়।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন হিন্দুদিগের ইতিহাস মহাভারতকে মানিতে হইলে রামের বহু শতাব্দী পরে যুধিষ্ঠিরের জন্ম বলিতে হইবে। বনবাস গত যুধিষ্ঠির, রামের বন গমন বৃত্তান্ত শ্রবণোপলক্ষে রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির পর জন্মা না হইলে পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি হিন্দুদিগের ইতিবৃত্তের পুস্তক সকল উন্মত্ত প্রলাপ হইয়া উঠে।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ভারতীয় গ্রন্থাবলী হইতে নিম্নলিখিত বিষয় দর্শিত হইল। সারউইলিয়ম জোনস রামচন্দ্রকে খ্রীষ্টের ২০২৯ বর্ষের পূর্ব্বের লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই অভ্রান্ত মতে—

২০২৯ খ্রীষ্ট পূর্ব্বজাত সময়।
১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দাঃ।

৩৯১৭ সমষ্টি।

রাম তিন হাজার নয় শত সতের বর্ষের লোক স্থির হইল, অথচ শাস্ত্রমতে যুধিষ্ঠির পাঁচ হাজার বর্ষের লোক সামাঞ্জস্য রক্ষণ করে কে?

মহামতি ভাষাজ্ঞ বেণ্টানি সাহেব রামকে ৯৫৪ নয়শত চৌয়ান্ন বর্ষের লোক বলেন। এই মতে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ ১৯৪৫ হইতে
৯৫৪ বাদ দিলে

---

৯৯১ মোট।

নয়শত একানব্বৈ বর্ষ অবশিষ্ট রহিল সুতরাং বিক্রমাদিত্যের ৯৯১ বর্ষ পরে রামচন্দ্রের জন্ম স্থির হইল। আবার বিশুদ্ধ বুদ্ধি টড সাহেব রামকে ১১০০ বর্ষের লোক বলেন, এই মতে রাম শকাদিত্যের ১৮১০

শকের অভ্যুদয়ের সাতশত দশবর্ষ পরে রামচন্দ্র জন্মিয়াছেন। কাহার কথা মানিব।

শেশী সাহেব রামকে হোমের সমকালীন লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মার্শমান ও আর্নল্ড্ সাহেব রামকে খ্রীষ্টের

পূর্ব্বের	১৩০০	বর্ষের লোক বলেন
শকাব্দাঃ	১৮৮৮	উভয়ের যোগ করিলে
	৩১৯৮	তিন হাজার একশত আটানব্বই বর্ষের লোক

বলিয়া রাম স্থির হইলেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ ইতিবৃত্তবেত্তা যনমূলাঙ্ক প্রকাশক সাহেবদিগের মত সকল পরস্পর বিরুদ্ধ দেখিয়া (তাঁহারা স্বাধীন প্রকৃতির লোক কাহার মতের সহিত কেহ যোগ না দিয়া স্বাধীন ভাবেই রামের কাল নিরূপণ করিয়াছেন) পরাধীন আমরা পূর্ব্বোক্ত কোন মতের সহিতই যোগ দিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বলিখিত সংখ্যা ৩৮,৯২,৯৮৩, এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের গতাব্দ ধরিয়াই লিখিত হইল, কিন্তু মন্বন্তর সংখ্যা ধরিলে বেদ প্রচারের সময় ইহা হইতে অত্যধিক দেখিতে পাইবেন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে এক মহাযুগ, ইহার এক সপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর, ইহার ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়া সপ্তম মন্বন্তের বৈবস্বত মনুর কাল। ২৭ সপ্তবিংশতি মহাযুগ অতীত হইয়াছে অষ্টা-বিংশতি মহাযুগের সত্যত্রেতা দ্বাপর গত হইয়া কলিযুগের ৪৯৮৯ বর্ষ গত হইয়াছে।

১ম। স্বায়ম্ভুব মনু। ২য়। সারোচিষ মনু। ৩য়। ঔত্তমি মনু। ৪র্থ। তামস মনু। ৫ম। রৈবত মনু। ৬ষ্ঠ। চাক্ষুষ মনু। ৭ম। বৈবস্বত মনু। এই সপ্তম মনু।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মধ্যাধিকারে উক্ত হইয়াছে, যথা—"যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে। যুগানাং সৈকা সপ্ততিরেকসপ্ততিমহাযুগ-মিত্যর্থ,"—গূঢ়ার্থ প্রকাশক টীকা।

"কল্পাদস্মাচ্চ মনবঃ ষড় ব্যতীতা সমম্বরঃ
বৈবস্বতস্ত চ মনোর্যুগানাং ত্রিঘনোগতঃ।"

অর্থ।

সত্যত্রেতা দ্বাপর কলিযুগাত্মক এক মহাযুগ ইহার এক সপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর। এই কল্পে ছয় মনু অতীত হইয়াছে। বৈবস্বত মনুর মহাযুগ সকলের তিন প্ররিতের তিনগুণ সময় অর্থাৎ সপ্তবিংশতি মহাযুগ গত হইয়াছে। তিনের তিন গুণে নয় তাহার তিনগুণে সাতাইস হয় ৩×৩—৯। ৯×৩—২৭ হইল। এই স্থলে প্রথমতঃ যুগচতুষ্টয়ের মান ৪৩২০০০০ কে ৭১ অঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে এক মন্বন্তর স্থির হইবে, তাহাকে আবার ৬ অঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে ছয় মন্বন্তরের সময় নির্দ্দিষ্ট হইবে। এ ৬ অঙ্ককে ২৭ দিয়া গুণ করিলে সপ্তবিংশতি মহাযুগ হইবে, তাহার সহিত এবারের সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির গতাব্দ যোগ করিলে কাল স্থির হইবে।

যুগচতুষ্টয়ের মান	৪৩,২০০০০	বৎসর—
	৭১	পূরণ—
	৪২৩	
	৩০২৪	
ত্রিশকোটি বা তিন অর্ব্বুদ সাতাইশলক্ষ বিশ হাজার।	৩০৬৭২০০০০	বৎসর হইল
	৬	পূরণ
আঠার বৃন্দ চল্লিশ কোটি তিন লক্ষ বিশ হাজার।	১৮৪০৩২০০০০	বৎসর ছয় মনুর সময়।
এই ক্ষণ সপ্তবিংশতি মহাযুগের সময় নির্ণয় করিয়া যোগ কিরতে হইবে।	১৮৪০৩২০০০০	
	১১৬৬৪০০০০	
	১৯১৬৯৬০০০০	

৪৩২০০০০ বৎসরকে | উনিশ বৃন্দ পাঁচ অর্ব্বুদ ছয় কোটি নয় লক্ষ ষাইট হাজার বর্ষ, এই অঙ্কে সত্যত্রেতা দ্বাপর কলির গতাব্দ মান—

২৭ পূরণ

৩০২৪

৮৬৪

১১৬৬৪০০০০

এগার অর্ব্বুদ ছয় কোটি ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজারকে পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত যোগ করিতে হইবে। | ৩৮,৯২,৯৮৯ যোগ করিলে অষ্টাবিংশ মহাযুগের সহিত সময় নিরূপিত হইবে।

১৯৫৬৯৬০০০০

৩৮৯২৯৮৯

১৯৬০৮৫২৯৮৯

উনিশ বৃন্দ ষাইট অর্ব্বুদ আট লক্ষ বাওয়ান্ন হাজার নয়শত তিরাশী ফল হইল।

এই যুগ চতুষ্টয়াত্মক কালে মহাযুগ বা এক দিব্য যুগ বলে, মন্বন্তরন্ত দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ। ইত্যমরকোষঃ। শেষাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট (১৯৬০৮৫২৯৮৯) এই সময়ের পূর্ব্ব প্রচারিত বেদ বলিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের শিরোভূষণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও অন্যান্য জ্যোতিষ এবং দিন পঞ্জিকাকারদিগের মতে গণনার দিন চন্দ্রিকাদি পুস্তক, ভাস্বতী ও ভাস্করাচার্য্য এবং আর্য্য ভট্ট প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সম্মত, অমর সিংহও এই মতের পোষক এবং হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র স লই জ্যোতিষিক মতানুগত সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে বেদের প্রচলিত সময় নিরূপণ পূর্ব্বোক্তরূপে নির্ণয় করিয়া নিশ্চয়ই উপহসিত হইব ইহা স্থির জানিয়াও হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী বেদব্যাসের সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে অশঙ্কুচিত চিত্তেই এই প্রবন্ধ প্রেরণ করিলাম। হিন্দুধর্ম্মে নিরত ব্যক্তির নিকট হিন্দুধর্ম্মের অনুগত মত লিখিতে ভয়ের বিষয় কি?

পূর্ব্ব বর্ণিতরূপে বেদের প্রাচীনতা প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে এখন বেদ যে অভ্রান্ত ও সর্ব্ব প্রমাণ গরিষ্ঠ তদ্বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। বৈশেষিক দর্শন সংগ্রহ তত্ত্বাবলির কিয়দংশ এই স্থলে অনুবাদিত হইতেছে।

নির্ব্বাণ মুক্তি এবং অভ্যোন্নতি যদ্দ্বারা লাভ হয় তাহার নাম ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম কথনাধীন আম্নায়ের (বেদের) প্রমাণতা যে হেতু ধর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে অতএব বেদ প্রমাণ। ২।

প্রামাণিক অর্থের বোধের নিমিত্তে যে সকল বাক্য প্রযুক্ত হয় সেই সকল বাক্য প্রমাণ হয় ইহা লোকদিগের নিশ্চয়ই আছে। ৩।

অথবা ঈশ্বর কর্তৃক বেদ কথিত হইয়াছে বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য সকলেই ইচ্ছা করেন। বেদে যে সকল বাক্য রচনা হইয়াছে তাহা বুদ্ধিমান কর্তৃক রচিত বলিয়াই প্রতীতি (জ্ঞান) হইতেছে। ৫।

বিবিধ পদার্থের সংজ্ঞা নির্ব্বাচন এবং কর্ম্মকাণ্ড কথন দ্বারাও বেদবক্তার বুদ্ধিমত্তার প্রতীতি হইতেছে এবং দানের গ্রহণের ও প্রতি গ্রহের নির্ণয় দ্বারাও বেদের রচনা বুদ্ধি পূর্ব্ব বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। ৬।

যাঁহার স্বর্গ বিষয়ে এবং যাগাদি জন্য অপূর্ব্ব বিষয়ে যথার্থ বুদ্ধি রহিয়াছে তিনিই বেদ নির্ম্মাণের কর্ত্তা, সেই কর্তৃত্ব ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাতেও থাকিতে পারে না। ৭।

ক্রমশঃ

নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়য়োর্যতঃ সিদ্ধির্ভবত্যনন্।
সদ্ধর্ম্মস্তৎ প্রবচনাৎ আম্নায়ানাং প্রমাণতা। ২।

মহা মহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত তত্ত্বাবলিঃ।

প্রামাণিকার্থবোধকং যদ্ধি বাক্যং প্রকল্পতে।
তৎ প্রমাণং ভবত্যেব লোকানামেষ নির্ণয়ঃ। ৩।
যদ্বেশ্বরেণ কথনাৎ বেদপ্রমাণ্যমিষ্যতে।
বাক্যানাং বচনাত্তত্র বুদ্ধি পূর্ব্বা প্রতীয়তে। ৫;

তত্ত্বাবলির যে সকল অংশ বিচার পূর্ব্বক লিখিতে হয় এবং কঠিন তাহা এই স্থলে পরিত্যক্ত হইল। সহজ অংশ নির্ব্বাচন দ্বারাই অভিমত হইবে।

সজ্ঞাকর্ম্ম ব্রাহ্মণে যৎ তৎকর্ত্তৃ বুদ্ধি লক্ষণং।
দানশ্রুতির্বুদ্ধি পূর্ব্বা তদ্বদেব প্রতিগ্রহঃ। ৬।
যথার্থ বুদ্ধির্যস্যাস্তি স্বর্গা পূর্ব্বাদিগোচরা।
সএব কর্ত্তা বেদানাং সচান্যোন মহেশ্বরাৎ ৭

শক্তি ও শক্তিমান।

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনি রহং বীজ প্রদঃ পিতা॥

ভগবদ্গীতা। ১৭ অঃ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক মহাশক্তি বলে উপজাত হইয়াছে। এই যে সূর্য্য আপন পথে চিরকাল চলিয়া যাইতেছে—এই যে পৃথিবী অসংখ্য নদনদী, ভীষণ পর্ব্বত পাহাড় সহ নীরবে আপন পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—এই যে শূন্যে আশ্চর্য্য কৌশলে হীরকখণ্ডবং দেদীপ্যমান গ্রহ নক্ষত্রগুলি বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে—এ গুলি সেই মহাশক্তির আংশিক লীলা-বিকাশ। এই যে মনুষ্য-সমাজ যথাভাবে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ধাবমান, এই যে স্রোতস্বিনী কুলকুলরবে সাগরাভিমুখে অগ্রসর, এও সেই শক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে। ঐ যে দেখিতেছ পর্ব্বত-গহ্বরে সমাসীন হইয়া প্রবল ইন্দ্রিয়-গ্রাম সংযত করিয়া, যোগিগণ ধ্যানে নিমগ্ন—ইহাও সেই মহাশক্তির আরাধনা। প্রকৃতিবাদী যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছে, জড়বিজ্ঞান-বিৎ যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ (gravitation) বলিয়া চীৎকার করিতেছে, যোগী যাহাকে কুণ্ডলিনী বলেন, মায়াবাদী যাহাকে মায়া বলেন,—ইহা সেই মহা-শক্তি—সেই একমাত্র "মহদ্‌যোনি" বা ব্রহ্ম-শক্তি। এই জগৎ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই শক্তির আংশিক পরিস্ফুটন। এই শক্তিই প্রতি মুহূর্ত্তে কত কত পরমাণুর বিশ্লেষণ করিয়া পরিদৃশ্যমান পদার্থ রাশিকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতেছে, আবার এই শক্তির প্রভাবেই, কত কত পরমাণু সংযোজিত ও আকৃষ্ট হইয়া নূতন পদার্থের গঠন করিতেছে। এই যে পীযূষপোরা শরন্নিশার সুধাংশু-কিরণ-স্রোতে প্রাণ আকুল হইতেছে—এই জ্যোৎস্নার প্রতি অন্তরালে সেই শক্তি বিরাজমানা। ঐ যে সূর্য্য-কর-রঞ্জিত-ইষদ্রক্তিম-সচল-কাদম্বিনী এক একবার চন্দ্রকে অবগুণ্ঠিত ও এক একবার প্রকাশিত করিতেছে, ভক্ত! দেখ দেখ, উহারও অন্তরালে সেই

মহাশক্তি। ঐ যে দেখিতে দেখিতে চারিদিক ভীষণ মেঘমালায় পুরিয়া গেল, ঘন ঘন বজ্র নিনাদ ঘোররবে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিল, সুস্পষ্ট মধ্যাহ্ন-কালে ঘোর অমানিশার অন্ধকারে ভুবন ঘিরিল, প্রবলতর করকাঘাতে মেদিনী টলিল ;—জান কি উহার অভ্যন্তরে কে সূত্র ধরিয়াছে ?—উহাও ঐ মহাশক্তির খেলা। আবার ঐ যে দেখিতেছ প্রশান্ত সান্ধ্যগগণে অস্তা-চলোন্মুখ রবি ঈষৎ রক্তিম রাগ প্রকাশিত করিয়াছে, ঐ যে ভুবন আনন্দ রসে প্লাবিত হইয়াছে—ইহারও ভিতরে সেই মহাশক্তির ক্রীড়ার বিকাশ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ঘটনার মূলে, প্রতি কার্য্যের বিস্ফুরণে, সেই ব্রহ্মশক্তি গাঢ়তমরূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে।

এই মহাশক্তির প্রস্ফুরণ না থাকিলে, এ ব্রহ্মাণ্ড আদৌ কার্য্যকর হইত না, অধিক কি ইহার অস্তিত্বই থাকিত না। পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য বলিয়া-ছেন—"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং, নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি"। ব্রহ্ম এই শক্তি বলেই সৃষ্টি লয় স্থিত সাধনা করিতেছেন। নিরালম্বোপনিষদে "ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধজগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণ সমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ" অর্থাৎ জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন-পালন-নাশ-কার্য্যে ব্রহ্মের যে শক্তি বিরাজিত আছেন তাহারই নাম প্রকৃতি। এই শক্তিতে ইচ্ছাময় পর-ব্রহ্মের কামনার উদয় হইলেই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়। নির্ব্বাণ তন্ত্রের চতুর্থোল্লাসে মহাদেব ভগবতীকে কি বলিতেছেন দেখুন :—

"ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ ॥
নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্ব্ব কারণ কারণং।
তস্যেচ্ছা মাত্র মালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা ॥
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতৎ চরাচরং।
রূপ প্রকৃতি কার্য্যানাং ত্বন্তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা"

ইত্যাদি।

"এই জগৎ যখন সৃষ্ট হয় নাই, যখন ইহা অব্যক্ত ছিল; তখন এই বীজভূতা শক্তি বা মায়াও অব্যাকৃত ছিলেন। সেই অপ্রত্যক্ষ বীজভূতা

মায়া হইতে ঈশ্বরেচ্ছায় কালে এই জগৎ সৃষ্ট হইল। "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভি-ধ্যাত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত" ইত্যাদি। প্রলয়কালে এই শক্তি-তেই জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে। এ শক্তি অনির্ব্বচনীয়া, ভগবান এই শক্তিকেই পরিণত করিয়া ভূতগ্রাম রচনা করিয়াছেন। যখন সৃষ্টি ছিল না তখন আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না। এই শক্তি সমষ্টি ও ব্যষ্টি এই দুই ভাগে বিভক্ত; সমষ্টি প্রকৃতির অবলম্বনে জগতের এবং ব্যষ্টি অবলম্বনে জীবাদির সৃষ্টি। ঐ শক্তি যখন পরিণত হইতে লাগিল, সূক্ষ্মরূপে যখন মনবুদ্ধ্যাদি সৃষ্ট হইল, তখন শক্ত্যধিষ্ঠাতা ব্রহ্মও সেই সেই সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে মহাশক্তি স্থূলরূপে পরিণত হইতে লাগিল—তখন জগৎ সৃষ্ট হইল—ব্রহ্মও ঘটে আকাশ প্রবেশের ন্যায় তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। সূক্ষ্ম ও স্থূল সৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই শ্রুতিতে ভগবানকে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" বলিয়াছেন। অলৌকিক প্রভাব বশতঃ প্রথমতঃ শক্তি সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্ররূপে উৎপন্ন হইল; এই দৃশ্যমান স্থূল আকাশের উপাদান স্বরূপ সূক্ষ্ম আকাশ এবং এইরূপে তদন্তর্ভূত শক্তি হইতে সূক্ষ্মবায়ু ও ক্রমে ক্রমে তেজ, জল, পৃথিবী উৎপন্ন হইল। আবার ঐ তন্মাত্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তির বিকাশ বশতঃ ঐ ঐ পদার্থের গুণ স্বরূপ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়া উৎপন্ন হইল আবার প্রলয়কালে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী জলে, জল তেজে এইরূপে সংহৃত হইয়া বিলয় পাইবে। যোগশাস্ত্রে ও দেহমধ্যে মূলাধারে ভূ অর্থাৎ পৃথিবীর সূক্ষ্ম তন্মাত্রা, স্বাধিষ্ঠানে জলের সূক্ষ্মভাগ, মণিপুরে তেজের, অনাহতে বায়ুর এবং বিশুদ্ধে ব্যোমের সূক্ষ্মতন্মাত্র ভাগ কল্পিত হইয়াছে। ঐ ঐ চক্রেও ক্রমে গন্ধ রসাদিগুণও নাসিকা জিহ্বা প্রভৃতি তাহাদের আস্পদ এবং ঘ্রাণ আস্বাদন প্রভৃতি ক্রিয়ার ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইহাদেরই সংঘাত বিলয়ে সৃষ্টি ও নাশ হয়। আরও দেখ যেমন ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ স্থূল সৃষ্টিতে ভূরাদি পঞ্চলোক জয় করিলেই ব্রহ্মপদ, সেইরূপ দেহেও মূলা-ধারাদি পঞ্চলোকের পরে আজ্ঞাচক্রে কুণ্ডলিনীর প্রাপ্তি হয়। আবার বাহ্যিক পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ব্রহ্ম তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন তদ্রূপ এই দৈহিক সূক্ষ্মতন্মাত্রে অনুরূপে—সূত্ররূপে—প্রবিষ্ট হই-লেন:—যেমন গীতাতে আছে—"ইদং শরীরং কৌন্তেয় * * * * ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ"। তবে দেখ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রার

সহিত বাহিক পঞ্চতন্মাত্রার কেমন অনমুচিন্ত্য সামঞ্জস্য!! যাহা হউক বহুকাল পর্য্যন্ত এই সকল সূক্ষ্মতন্মাত্র অসংযুক্তাবস্থায় ছিল তৎপরকালে, সেই মহাশক্তি ও ব্রহ্মের সম্মিলনে ক্রমে উহা হইতে ভূরাদি লোক বিকাশিত হইয়া পড়িল।

"পঞ্চী করোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিষয়াদিকঃ।
দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে"।

পঞ্চদশী ২।২৬—২৭ শ্লোক।

যেমন মনে কর স্থুল আকাশ=½ সূক্ষ্ম আকাশ+⅛ সূক্ষ্ম বায়ু+⅛ সূক্ষ্মতেজ +⅛ সূক্ষ্মজল+⅛ সূক্ষ্ম পৃথিবী। ইত্যাদি।

এতাবতা নির্দ্দিষ্ট হইল যে, এই জগতের প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির প্রতি ব্রহ্ম-শক্তিই বীজভূতা। এই শক্তিই সমলা হইয়া জীবাদির সৃষ্টি ও তাহাদের ভোগের কারণ হইয়াছে; এই শক্তিই নির্ম্মলা হইয়া (জৈবিক ও ভৌতিক সৃষ্টির ক্ষমতার অতীত বিষয়ের প্রয়োজন হইলে) ব্রহ্মের ইচ্ছা ক্রমে রামকৃষ্ণাদি অবতারের সৃষ্টির বীজ হইয়াছে; এই শক্তিই ভূতরূপে চন্দ্র সূর্য্যাদি নির্ম্মাণের নিদান হইয়াছে। ফল কথা, এই শক্তিই সমস্তের কারণ, ব্রহ্ম ইহার অধিষ্ঠাতা মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মের ইচ্ছা না হইলে—কামনা না জন্মিলে—এই শক্তি স্বতন্ত্রা হইয়া কোন কার্য্য করিতেই সমর্থা হয় না। এই জন্যই ভারতবর্ষে অগ্রে শিবপূজা তৎপরেই দুর্গা পূজা। প্রত্যেক অবতারের সঙ্গেও ভগবান্ প্রকৃতি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেবল পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কেবল প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়। এই জন্যই শিব-দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-গোবিন্দ, রাম সীতা প্রভৃতি যুগ্ম-যুগ্মরূপে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বয় করিয়া পূজার বিধানও এই জন্যই।

অগ্নি হইতে যেমন তাহার দাহিকাশক্তি পৃথক্ নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেও ব্রহ্মশক্তি পৃথক নহে। ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, শক্তিও তেমনি নিত্য পদার্থ। এ স্থলে একটা আপত্তি আসিতে পারে। যেমন মনে কর অগ্নি রহিয়াছে, তন্নিকটে একটা দাহ প্রতিকূল মণি ধরা গেল; যদি বল শক্তি নিত্য পদার্থ তবে এখন দাহ করিতে পারিতেছে না কেন? অগ্নিতে দাহিকাশক্তি আছে

বটে, কিন্তু মণির প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা কার্য্য করিতেছে না মাত্র। উপরে একখানি চুম্বক প্রস্তর, তন্নিম্নে একটী ক্ষুদ্র লৌহপিণ্ড, তন্নিম্নে একটী বৃহৎ লৌহ রহিয়াছে মনে কর। চুম্বকের আকর্ষণ বশতঃ ক্ষুদ্র লৌহটী চুম্বকের নিকটবর্ত্তী হইল, পৃথিবী সমস্ত বস্তুতে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া বৃহৎ লৌহখণ্ড ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন রহিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র লৌহটী চুম্বকের প্রতিকূলতা ও বৃহৎ লৌহখণ্ডের ব্যবধানতা বশতঃ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লগ্ন হইতেছে না। এ স্থলে কি বলিবে যে পৃথিবীর শক্তি নাই ? যদি না থাকিবে তবে সম-সময়ে বৃহৎ লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইল কি করিয়া ? তবে স্বীকার করিতে হইবে যে শক্তি নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল কোন বিধর্ম্মীর প্রতিকূলতায় তাহাতে কার্য্য করে না, এই মাত্র। অতএব প্রমাণিত হইল যে শক্তি নিত্য এবং উহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। এই শক্তির আরাধনা ও ব্রহ্মের আরাধনা একই কথা। ওঁ তৎসৎ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

প্রকৃতিই সৃষ্টির উপাদান, আর উপাদানই বিকারী (কার্য্যে পরিণত), এটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। কিন্তু প্রকৃতি কার্য্যে পরিণত (বিকারী) বলিলে সৃষ্টির বাধ হয়। অর্থাৎ যেমন মৃত্তিকা ঘটে পরিণত হইলে আর সেই মৃত্তিকায় অন্য ঘট উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ আবার প্রকৃতি অবিকারীও বলিতে পারেন না, কারণ উপাদান কার্য্যে পরিণত না হইলে আর কি কার্য্যে পরিণত হয় ? যদি বলেন যে, জল যেরূপ ঘটের উপাদান হইয়া অর্থাৎ মৃত্তিকাকে ঘটে পরিণত করতঃ আপনি স্বরূপে থাকে, প্রকৃতিও সেইরূপ। তাহা হইতে পারে না, যে হেতু ঘটের মৃত্তিকা ও জল দুইটি উপাদান আছে। একটি কার্য্যে পরিণত হয়, অপরটি হয় না ; কিন্তু সৃষ্টির এক প্রকৃতি ভিন্ন আর উপাদান নাই, একটি উপাদান অবশ্যই কার্য্যে পরিণত হইবে ; অতএব এখন বলুন, যে, কি কার্য্যে (সৃষ্টিতে) পরিণত হয় ? যদি বলেন, যে, পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ হইলেই মহৎ উৎপন্ন হয়,

এবং সেই মহতই ঘটের মৃত্তিকার মত সৃষ্টির উপাদান। প্রকৃতি জলের মত অবিকারী উপাদান এটি অমূলক যুক্তি, কারণ দুই বস্তুর সংযোগে যে কার্য্য হয়, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যে, উহা অবশ্য উভয়ের বা একের বিকার; বস্তুর সংযোগ হয়, কিন্তু বস্তু বিকৃত হয় না—অথচ কার্য্যে উৎপন্ন হয়—এ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে মহৎ উৎপন্ন হয়, আর সেই মহতই বিকারী বলিলে তাহাতে দোষ পড়িতেছে। এক্ষণে বলুন যে, এই সৃষ্টি কাহার বিকার? যদি বলেন যে, প্রকৃতির স্বভাব বিকার নহে, ধর্ম্ম (গুণই) বিকারী, অর্থাৎ ত্রিগুণের বিকারই সৃষ্টি; তাহা বলিলেও প্রকৃতির বিকার আশঙ্কা হইতেছে, কারণ প্রকৃতির স্বভাবই ত্রিগুণ (ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি)। অতএব নিরাকৃত হইল যে, প্রকৃতি এই বিশ্বের উপাদান কারণ হইলেও প্রকৃতি পরিণামী নহে; যে হেতু যে উপাদান কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাতে আর নূতন কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি থাকে না কিন্তু আজও যখন সৃষ্টি হইতেছে, তখন প্রকৃতি স্বভাবেই আছে। দ্বিতীয় শ্রুতিতে নিরাকৃত হইয়াছে যে, প্রকৃতি পরিণামী নহে। শ্রুতি যে প্রকৃতিকে অপরিণামী বলিয়াছেন তাহা অজ্ঞান (মায়া)। এক্ষণ যদি সাংখ্যাচার্য্যের পক্ষ (দ্বৈতবাদ) সমর্থন করিতে হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত দোষ অর্থাৎ প্রকৃতি সৃষ্টির উপাদান ও বিকারী বলিলে নূতন সৃষ্টির বাধ এবং শ্রুতি মিথ্যা হয়; সুতরাং, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ এক পুরুষই নিত্য বিদ্যমান আছেন, কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। একমাত্র অজ্ঞানেই এই বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে; তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকিতেছে না। কারণ কল্পনা পরিণামী কার্য্য হইয়াও অপরিণামী (অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় উৎপন্ন বস্তু নহে)। আবার অজ্ঞানকে কোন দ্বৈত সত্বাও বলিতে পারেন না, কারণ পুরুষের ভ্রান্তি জ্ঞান বা অবিবেক আর অজ্ঞান একই কথা। তবে বলিতে পারেন যে, পূর্ণ জ্ঞানময় পুরুষের অজ্ঞান—এ কিরূপ যুক্তি? এতদুত্তরে আমরা বলিব যে, শুদ্ধ বুদ্ধ অসঙ্গ নিরবয়ব পুরুষে জড় প্রকৃতির ধর্ম্ম উপরাগ হওয়াই কি যুক্তি সঙ্গত হয়? এক্ষণে বিচার্য্য যে, নিরাকার অসঙ্গ শুদ্ধ পুরুষ কি সাবয়ব (বীজাঙ্কুরবৎ প্রকৃতিতে জগৎ আছে, অতএব প্রকৃতি সাবয়ব)। জড় প্রকৃতি কখন সংযোগ (অয়স্কান্ত মণিবৎ) সম্বন্ধ হইতে পারে না; এ বিষয়ে যুক্তি এই যে, স্বজাতি দ্রব্যই (সাবয়ব অর্থাৎ যাহার আকার (অঙ্গ) আছে) সংযোগ

(চুম্বুকাকর্ষনের মত) ও উপরাগ (জবাস্ফটিকের মত) হইতে পারে, নিরবয়বে ও সাবয়বে বাস্তব সংযোগ (তাত্ত্বিক) হওয়া দূরে থাক, উপরাগ (অভিমানিক) ও হইতে পারে না; অর্থাৎ স্ফটিক যদি নিরবয়ব অসঙ্গ, আর জবাসাবয়ব অনু হইত, তাহা হইলে কি জবাস্ফটিক উপচার হইতে পারে? দ্বৈতবাদে জড় প্রকৃতির আকর্ষণ শক্তি হইতে পুরুষের যে বন্ধন ও সৃষ্টি হয় এটি নিতান্ত অযুক্তি, সুতরাং দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে পারেন না।

এখন দেখা উচিত যে, কেবল এক পুরুষই বিদ্যমান আছেন, ও তাঁহার স্বরূপের ভ্রান্তি জ্ঞান (অজ্ঞান) হইতে তাঁহার অভিমানিক বন্ধন, এবং সেই অজ্ঞানেই এই সৃষ্টি কল্পিত হইতেছে,—জন্মিতেছে না (অর্থাৎ পুরুষের বন্ধন যেরূপ অভিমানিক, এ সৃষ্টিও সেইরূপ, তাত্ত্বিক নহে)। এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে কি দোষ হয়? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ জ্ঞানময় পুরুষের ভ্রান্তিজ্ঞান (অজ্ঞান) বলিলেই পুরুষে অনবস্থ দোষ অর্থাৎ অজ্ঞান-জ্ঞান-নাশ্য, (প্রকাশের অপ্রকাশ) আশঙ্কা হইতেছে। বস্তুতঃ এই আশঙ্কাটি বাস্তব কি অবাস্তব তাহা বিচার করা আবশ্যক হইয়াছে ভাল, বলুন দেখি, যে, যখন শুক্তিতে রজত ভ্রান্তি (অজ্ঞান) হয়, তখন শুক্তির স্বভাব (স্বরূপ) বাধ (অভাব) হয় কি?—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, শুক্তির স্বরূপের কোন অংশের অভাব বা বাধ হয় না শুক্তি স্বভাবেই থাকে। পুরুষের ভ্রান্তি জ্ঞান (অজ্ঞান মায়া) ও সেইরূপ। অর্থাৎ পুরুষের অজ্ঞান (ভ্রান্তি জ্ঞান) থাকিলেও পুরুষের স্বভাবের (পূর্ণ জ্ঞানময়ত্বের) বাধ হয় না। অজ্ঞান, জ্ঞান-নাশ্য-তম নহে। তবে বলিতে পারেন, যে, দৃক্ (পুরুষ) এবং দৃশ্য (রজত ও শুক্তিতে রজত সাদৃশ্য) দুইটি বস্তু বিদ্যমান আছে বলিয়াই শুক্তিতে ঐরূপ রজত ভ্রান্তি (অজ্ঞান) হয়, কিন্তু যখন এক দৃক্ (পুরুষ) মাত্রই আছেন, তখন দৃশ্য অর্থাৎ শুক্তি রজতের মত উপাদান কোথায়? ঐ অজ্ঞান (মায়া) ই দৃশ্য (উপাদান) হয়, অর্থাৎ যেরূপ শুক্তিতে রজত ভ্রম হইলে ঐ অজ্ঞানের একাংশ "আবরণ শক্তি" দ্বারা শক্তির স্বরূপ আবৃত হয়, আর অপরাংশ "বিক্ষেপ শক্তি" দ্বারা ঐ শক্তিই রজত রূপের ভাণ্ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানের আবরণ শক্তি দ্বারা পুরুষের স্বরূপ আবৃত হয়, ও বিক্ষেপ শক্তি (অপরাংশ) দ্বারা ঐ একই পুরুষে (দৃকে) শুক্তি রজতের মত দৃশ্য (এই বিচিত্র বিশ্ব)

ভাণ্ হয়। যদি বলেন যে, একই বস্তু (দৃক্) ভাব ও অভাব এরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আর এক দৃক্ (পুরুষ) দৃশ্য (শুক্তি রজতের মত) হইলে বিরুদ্ধ দ্বৈরূপ দোষ হয়; এই আশঙ্কায় সাংখ্যাচার্য্য বেদান্তের মায়া (অজ্ঞান) স্বীকার করেন নাই। এক দৃক্ই (পুরুষ) ভাব ও অভাব হইতেছে না; কারণ বলুন দেখি যে, যখন শুক্তিতে রজত ভ্রান্তি হয়, তখন কি শুক্তির স্বরূপ অভাব, অর্থাৎ রজত ভাবে শুক্তির অভাব, হইয়া থাকে? পূর্ব্বেই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, শুক্তিতে রজত ভাণ হইলে শুক্তির স্বরূপ (স্বভাব) অভাব হয় না, বস্তুতঃ শুক্তিই থাকে। অজ্ঞানই এক শুক্তিকে আশ্রয় করিয়া দৃশ্য (রজত) ভাণ হয় মাত্র; সেইরূপ দৃক্ (পুরুষ) স্বরূপতঃ স্বভাবে (স্বরূপে)ই থাকেন, অজ্ঞান (মায়া) তাঁহাকে (দৃক্) আশ্রয় করিয়া দৃশ্য (এই বিশ্ব) ভাণ হয় মাত্র, উৎপন্ন হয় না; এক বস্তুতে (দৃকে) অন্য বস্তু (দৃশ্য-বিশ্ব) উৎপন্ন হইলে সাংখ্যাচার্য্যের "বিরুদ্ধ দ্বৈরূপ" দোষ হইত। কিন্তু অন্য বস্তু (দৃশ্যবিশ্ব) উৎপন্ন হয় নাই, এক দৃক্ (পুরুষই) নিত্য বিদ্যমান (স্বভাবে) আছেন, অতএব আর বিরুদ্ধ দ্বৈরূপ দোষাশঙ্কা থাকিতেছে না। যদি বলেন যে, তাহা হইলে অনাদি অজ্ঞান (প্রকারান্তরে দ্বৈতসত্ত্বা) স্বীকার করিতে হয়? এতদুত্তরে আমরা বলিব যে, অজ্ঞান (মায়া) অনাদি হইলেও বস্তুতঃ কোন দ্বৈতসত্ত্বা নহে। তাহা ঐ শুক্তি রজতেই দেখুন না কেন?—অর্থাৎ যখন শুক্তির স্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন আর রজত ভাণ (অজ্ঞান) থাকে না। ফল, যাহার অত্যন্ত অভাব (জ্ঞান হইলে অজ্ঞান অত্যন্ত অভাব) হয়, তাহাকে দ্বৈতসত্ত্বা বলিতে পারেন না। সেইরূপ পুরুষে (দৃকে) অনাদি অজ্ঞান থাকিলেও পুরুষের জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান (মায়া) অত্যন্ত অভাব হয়, অতএব অজ্ঞান (মায়া) কে দ্বৈত সত্ত্বা বলিতে পারেন না। সাংখ্যাচার্য্যও বলিয়াছেন যে, পুরুষ প্রকৃতির মণিবৎ সম্বন্ধ হইতে পুরুষের অবিবেক। সেই অবিবেক হইতে পুরুষের অভিমানিক বন্ধন ও সৃষ্টি হয়। এক্ষণে বলুন দেখি, যে, অবিবেক বা অবিদ্যা সেই একই অজ্ঞানের অন্তর্গত কি না? আর দ্বৈতবাদে প্রকারান্তরে সেই অজ্ঞান (মায়া বাদ) অনুমোদন হইয়াছে কি না? ফল কথা, স্থূলদর্শী মাত্রেই দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন; আর দ্বৈতবাদে অনবস্থা দোষ থাকিবেই থাকিবে। এই অনবস্থা দোষ নিবারণের জন্যই শ্রুতি মায়াবাদ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

স্বীকার করেন। যেরূপ এই পৃথিবী কোথায় অবস্থিতি করিতেছে এই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ বলেন যে, পৃথ্বী সূর্য্যের আকর্ষণে আছে; আবার সূর্য্য কোথায় আছে?—না অন্য কোন একটি গ্রহের আকর্ষণে আছে। আবার ঐ গ্রহটি কাহার আকর্ষণে আছে, ঐরূপে অনবস্থা দোষ আইসে। সুতরাং বলিতে হইবেই হইবে যে, পৃথ্বী ও সমস্ত গ্রহাদি শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে, এবং এইটিই স্বরূপ তত্ত্ব। সেইরূপ দ্বৈতবাদ বা আধুনিক বিজ্ঞানবাদের মত (নিত্যতাপ ও অণু) স্বীকার করিলেই অনবস্থা দোষ হয়। সেই দোষ নিবারণের জন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিতেই হইবে। অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী না হইলে মায়াবাদ উপলব্ধি হয় না। ইতি। *

---

* এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, পূর্ণ জ্ঞান এবং দুই বা বহু বস্তু না হইলে কোন এক বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না (পরে প্রকাশিতব্য মায়াবাদ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ সেই বস্তুটি যে কি তাহার প্রকৃত জ্ঞান হয় না। বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব না জানা, আর অজ্ঞান একই কথা। ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞানময় হইলেও দ্বৈত সত্ত্বা না থাকাতে তাঁহার অজ্ঞান আছে, অর্থাৎ স্বরূপ জানা (আপনাকে আপনি জানা) নাই। আর যতদিন তিনি, ততদিন সেই অজ্ঞান অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞান (এই অজ্ঞান শ্রুতিতে ব্রহ্মের আবরণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)। অনাদি অজ্ঞান থাকিলেও তাঁহার পূর্ণত্বের কোন বাধ হয় না। এই অজ্ঞান (অর্থাৎ দুই বা বহু বস্তুর মত) আশ্রয় করিয়াই শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞানান্তর্গত মহতত্ত্ব না হইলে বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয় করে কে? অতএব প্রকারান্তরে (সাংখ্যমতে অভিধাৎ হইতে) অজ্ঞানের (মায়ার) উদ্দেশ্য (বস্তুর স্বভাব নিশ্চয় করা) হইতেছে। বস্তুতঃ দ্বৈত সত্ত্বা না থাকাই (nonduality) অজ্ঞানের (মায়ার) কারণ। সেই মায়া মহতত্ত্বের প্রসূতি, মহৎ অহঙ্কারের কারণ, আবার সেই অহঙ্কার এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হয়। এই যুক্তির সত্যতা চিন্তাশীল মাত্রেই অনুভব করিয়া দেখুন।

ন-জ্ঞান=অজ্ঞান, অজ্ঞানও যে জ্ঞান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একটু চিন্তা করুন, দেখিবেন যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব অজ্ঞানে ভাসমান রহিয়াছে। কিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব নাই, এবং কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। কেবল একমাত্র অনুভবাত্মক জ্ঞানেরই পৃথক্ পৃথক্ অনুভবই (Introspection) এক একটি বস্তুর অস্তিত্বের কারণ। মনে করুন যে, যেরূপ আকাশ,-অবকাশ-অভাব (যাহা কিছু নহে) হইয়াও জ্ঞানে তাহার অনুভব হইতেছে, অর্থাৎ অজ্ঞান (মায়া) অন্তর্গত যে অভাব জ্ঞান, তাহাই অবকাশের (কিছু নহের) ভিত্তি। সেইরূপ পরিদৃশ্যমান যাবদীয় বস্তুরই অভাব (কিছু নহে) কেবল একমাত্র অনুভবাত্মক জ্ঞান, অর্থাৎ যাহা কিছু দেখিতেছেন তৎ সমস্তই জ্ঞান, সেই অনুভবাত্মক জ্ঞানের নিরোধই এই বিশ্বের লয়; এবং সেই দ্বৈত জ্ঞানের নিরুদ্ধাবস্থাই মোক্ষ বাচ্য হয়। ইতি

চার্ব্বাক মত খণ্ডন। *

প্রথম প্রস্তাব।

চার্ব্বাকাদি নাস্তিক দর্শন সকল মদ্যকণার উন্মত্ততা শক্তি থাকার ন্যায় পঞ্চভূতে এক শক্তি স্বীকার করিয়া সেই শক্তি প্রভাবে পঞ্চভূত মিলিত হইয়া জীবদেহ রূপ কার্য্য উৎপন্ন করে, নিশ্চয় করিয়া দেহাতীরিক্ত আত্মা (বেদান্ত মত) অস্বিকার করিয়াছে। তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতিবৃর্দ্ধি নাই, তবে একটা মীমাংসা করিয়া নাস্তিক মত নিরাশ করিতে পারি বা নাই পারি, কএকটা যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইব; বিচারে জয়লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সত্য বেদান্ত মতটি (দেহাতীরিক্ত আত্মা আছেন) যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে, এবং দেহাভিমানি চার্ব্বাকের মত অমৃত পানে বঞ্চিত না হন ইহাই অভিপ্রায়।

বিচার।

একটা সামান্য কথা এই যে, পঞ্চভূতের সংযোগাদি যে একটি ক্রিয়া, এবং দেহ যে একটি কার্য্য তাহা সকল মতেই স্বীকার করা হয়। এক্ষণে একটি স্বতঃসিদ্ধ সামান্য যুক্তি এই যে, ক্রিয়া বা কার্য্য কখন কি তাহার কর্ত্তা (নিমিত্ত কারণ) জানিতে পারে; কর্ত্তাই (নিঃ কাঃ) তাহার ক্রিয়াও কার্য্য জানিতে পারে। ঘট বা ঘটনির্ম্মাণ ক্রিয়া কখন কুম্ভকার জানিতে পারে না, কুম্ভকারই তাহার কার্য্য ঘট ও ঘট নির্ম্মাণ ক্রিয়া জানে। আর একটি যুক্তি, সূর্য্যই ঘট প্রকাশ করে, ঘট কখন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না; ক্রিয়া বা কার্য্য হইয়া কর্ত্তা (নিঃ কাঃ) নির্ণয় করিতে চেষ্টা করাই প্রলাপ মাত্র; এই প্রলাপ ও ভ্রান্তিই চার্ব্বাকাদি দর্শনের জনক।

---

* এই প্রবন্ধ ও ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধটি একজন পর্ব্বত গুহা নিবাসী সন্ন্যাসীর প্রেরিত সুতরাং আমরা ইহা যথাযথ প্রকাশ করিলাম। বেঃ সং।

এই খানে বলিতে পার, যে, বেদান্ত মতও প্রলাপ ও ভ্রান্ত; যে হেতু ঐ যুক্তিতে প্রমাণ হইল যে, ক্রিয়া বা কার্য্য কর্ত্তা (নিঃ কাঃ) নির্দ্দেশ করিতে পারে না; অতএব বেদান্তই বা কিরূপে কার্য্য হইয়া কর্ত্তা (নিঃ কাঃ) নির্ণয় করিয়াছে? এখানে সে বিচার অনাবশ্যক। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, চার্ব্বাকের মত অদ্বৈত বেদান্তবাদী আপনাকে কার্য্য বা ক্রিয়া বলে না, অর্থাৎ কর্ত্তা (সৃষ্টির নিঃ কাঃ) বলিয়াই জানে (কর্ত্তা অবশ্য আপনাকে জানে)। কর্ত্তাকে জানিবার জন্য অন্য কর্ত্তার আবশ্যক হয় না, কেবল মাত্র ক্রিয়া ও কার্য্য দ্বারা আপনি আপনাকে জানে।

যদি বল যুক্তি দেখাও। ঘট অপ্রকাশিত থাকে বলিয়াই ঘটের প্রকাশের জন্য দীপ ও সূর্য্য আবশ্যক হয়। দীপ বা সূর্য্যকে প্রকাশ জন্য অন্য দীপ ও সূর্য্য অনাবশ্যক, যে হেতু উহারা স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। এখন নিরাকৃত হইল যে নিমিত্ত কারণ ক্রিয়া ও কার্য্যকে জানে; কারণ, কর্ত্তা স্বয়ং প্রকাশ,—ক্রিয়া ও কার্য্য নিমিত্ত কারণ জানিতে পারে না। কোন মতের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া সরল অন্তঃকরণে বল দেখি, যে, চার্ব্বাক মত (অর্থাৎ যে ক্রিয়া ও কার্য্য হইয়া নিমিত্ত কারণ জানিয়াছি বলে) এবং বেদান্ত মত (অর্থাৎ যে স্বয়ং নিমিত্ত কারণ হইয়া ক্রিয়া ও কার্য্য জানিয়াছি বলে) এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি সত্য মত?

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বস্তু মাত্রেই কার্য্য, কার্য্য হইলেই তাহার কারণ আছে, সেই কারণ স্বভাবতঃ দুইটি, উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বিচার।

ঘট একটি কার্য্য, ইহার দুইটি কারণ আছে। মৃত্তিকা ও জলাদি ঘটের উপাদান কারণ, কুম্ভকার ও তাহার চক্রদণ্ডাদি নিমিত্ত কারণ হয়। আমরা এটি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, যে, উপাদানই কার্য্যে পরিণত হয়; ঐ ঘটে যে উহার উপাদান আছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে, ঐ ঘটে উহার নিমিত্ত কারণ আছে কি?—না। তাহার জন্য কি? ঐ ঘটই জড় বস্তু, অর্থাৎ কার্য্য হয়। আর "নিমিত্ত কারণ" কর্ত্তা

হয়। কর্ত্তা কখন ক্রিয়া ও কার্য্য হইতে পারে না, এটি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আর যুক্তি এই যে, কার্য্য ও কর্ত্তা উভয়েই ভিন্ন ধর্ম্মী (অর্থাৎ বস্তুগত পার্থক্য আছে); সুতরাং ঘট আপনি আপনার জন্য অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না। যেরূপ ঘট একটি কার্য্য, দেহও সেইরূপ একটি কার্য্য হয়। কার্য্য হইলেই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ থাকিবে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ঘটের মৃত্তিকাদি উপাদানের মত পঞ্চভূত এই দেহ-কার্য্যের উপাদান। কিন্তু "উপাদান কারণ" যেরূপ এই দেহে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, "নিমিত্ত কারণ" সেরূপ দেখিতে পাই না; অতএব তবে কি উপাদান পঞ্চভূতই এই দেহের "নিমিত্ত কারণ" হয়? কার্য্য কখন আপনি আপনার জন্য হইতে পারে না। ঐ ঘট-কার্য্যে ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য কখন কর্ত্তা (নিমিত্ত কারণ) জানে না, কর্ত্তাই কার্য্যকে জানে, অর্থাৎ কুলাল ঘটকে জানে, ঘট কুলালকে জ্ঞাত নহে। যখন এই দেহ একটি কার্য্য তখন কেমন করিয়া কর্ত্তাকে জানিবে? এই দেহের যে কর্ত্তা (নিমিত্ত কারণ) সে অবশ্য দেহকে জানে। এই দেহের কার্য্য-কারণত্ব বিষয়ে নাস্তিক দর্শন স্থির করিয়াছে, যে, মদ্যকণা মধ্যে যেরূপ একটি মাদক শক্তি থাকে, সেই শক্তি প্রভাবে মানুষ উন্মত্ত হয়, সেইরূপ পঞ্চভূত মধ্যে একটি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা পঞ্চভূত সংযুক্ত হইয়া এই দেহ উৎপন্ন করে। এইটি নিতান্ত ভ্রান্তি যুক্তি; কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, নিমিত্ত কারণই (কুলালই) উপাদান-মৃত্তিকাদি ভূতকে ঘট-কার্য্যে পরিণত করে। উপাদান-কারণ ভূতে কখন জন্য-শক্তি (নিঃ কাঃ) থাকিতে পারে না। ন্যায় যুক্তিমতে কার্য্য কখন আপনি আপনার জন্য হয় না। নাস্তিকদিগের ঐ যুক্তি নিতান্ত ভ্রান্ত তাহাতে কোন সংশয় নাই। ন্যায় যুক্তি আশ্রয় করিয়া বিচার করিলে জানা যায় যে, দেহ অবশ্য একটা কার্য্য, এবং ইহার একটা জন্য বস্তু (নিঃ কাঃ) আছে। এক্ষণে একটি যুক্তি এই যে, ঘট-কার্য্যের নিমিত্ত কারণের (কর্ত্তার) গুণ নিশ্চয় করিতে পারিলেই এই পঞ্চভৌতীক দেহের কর্ত্তা নিশ্চয় হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, জগতে যত কার্য্য ও কারণত্ব দেখি, তাহা দুইভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ জড়শক্তি অজ্ঞান) কৃত কার্য্য এবং জ্ঞান শক্তি (চিৎশক্তি) কৃত কার্য্য। ভূতাদির অজ্ঞান শক্তি সকল যখন কর্ত্তা হইয়া ক্রিয়া ও কার্য্য করে, তখন সেই সকল ক্রিয়া ও কার্য্যের কার্য্যশৃঙ্খলা বা নীরনৈপুণ্য

নাই। এবং যখন জীবাদির জ্ঞান শক্তি হইয়া কার্য্য করে, তখন সেই সকল ক্রিয়া ও কার্য্যের কার্য্য শৃঙ্খলা ও শীল্প নৈপুণ্যাদি থাকে। এই যুক্তিটি ঘট-কার্য্যেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি ও জ্ঞানকৃত ক্রিয়া ও কার্য্য অতি সুন্দর রূপে বিচীত্র শীল্প নৈপুণ্যের সহিত নির্ব্বাহ হয়; আর যাহা অজ্ঞান (জড় শক্তি) কৃত ক্রিয়া ও কার্য্য তাহাতে শীল্পনৈপুণ্যের নামও নাই। এই জগতে যত প্রকার ক্রিয়া ও কার্য্য আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, প্রত্যক্ষ উল্লিখিত মত দেখিতে পাইবে। এক্ষণে এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া ঘট বিচার কর, দেখিবে যে, ঘটটি একটি বিচীত্র কার্য্য, অর্থাৎ শীল্পনৈপুণ্যের সহিত নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যে কার্য্যে বিচীত্র শীল্প কৌশল আছে, তাহাই জ্ঞান শক্তির কার্য্য জানিবে। জ্ঞান শক্তি বস্তুটি যে কি এক্ষণে তাহা বিচার্য্য। জ্ঞান শক্তি বেদান্তানুমোদিত চিৎ-শক্তির প্রতিবিম্ব; অর্থাৎ প্রকাশ। তাহার প্রমাণ—যাহা কার্য্যকে প্রকাশ করে ও জানে তাহা স্বয়ংই প্রকাশ বস্তু হয়। প্রকাশ না হইলে কি কখন অপ্রকাশকে প্রকাশ করিতে পারে? তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেরূপ ঘট অপ্রকাশ বলিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না, দীপ বা সূর্য্য তাহার প্রকাশক হয়। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ হইল যে জ্ঞান-শক্তি সকল ক্রিয়া ও কার্য্যকে প্রকাশ করে ও জানে, অতএব তাহা অবশ্য স্বয়ং প্রকাশ পদার্থ। পূর্ব্বেই নিরাশ করা হইয়াছে, যে কার্য্য কখন আপনি আপনার কর্ত্তা হইতে পারে না। এক্ষণে বিচার্য্য যে পঞ্চভৌতীক দেহ-কার্য্যের কর্ত্তা কে? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, যে সকল ক্রিয়া ও কার্য্য জ্ঞান-শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর ও বিচীত্র শীল্প কৌশল দ্বারা নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। এক্ষণে এই পঞ্চভৌতীক দেহ যেরূপ অদ্ভুত কৌশলে নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহা জ্ঞান শক্তির বিশেষ পরিচয় দিতেছে, অতএব নিশ্চয়ই এই দেহ কার্য্যের কর্ত্তা জ্ঞান শক্তি ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না।

তৃতীয় প্রস্তাব।

যদি বল যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, উহা দ্বারা পঞ্চভুতের পরিণামী দেহ-কার্য্যের কর্ত্তা (নিঃ কাঃ) ঘট-কার্য্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়াছে।

কিন্তু তাহা বলিয়া ঘটের "নিমিত্ত" কুলালের ন্যায় এই জীব দেহের "নিমিত্ত" জ্ঞানশক্তি আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, চুম্বুক ও লৌহ যেরূপ আপনাপনি সংযোগ হয়, সেইরূপ পঞ্চভূতেও চুম্বুকের মত একটা শক্তি আছে যাহার প্রভাবে তাহাদের আপনাপনি সংযোগ হইয়া পরিণামী দেহ উদ্ভব হয়।

বিচার।

ভাল বল, যে, প্রত্যক্ষ ও যুক্তি এই উভয় প্রমাণের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? তোমার দেহের "নিমিত্ত কারণ" স্বীকার করিয়া কাজ নাই। কিন্তু সরল ভাবে বল দেখি যে, কার্য্য মাত্রই উপাদানাদি ও নিমিত্ত দুই কারণ ভিন্ন উদ্ভব হইতে পারে কি না? এবং প্রত্যেক কার্য্যে ঐ দুই কারণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই কি না? তোমার লৌহ ও চুম্বুকের যে সংযোগ হওন, উহাও একটি ক্রিয়া, সুতরাং একটি ক্রিয়া হইলেই কার্য্য উদ্ভব হইবে। লৌহ চুম্বুকের আকর্ষণ শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া উক্ত চুম্বুকের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকাই একটি কার্য্য। কার্য্য হইলে—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ অবশ্য থাকিবে, অর্থাৎ ঐ সংযোগ কার্য্যের উপাদান—লৌহ নিমিত্ত কারণ—মণি, কিম্বা প্রকারান্তরে বলিতে পার, যে, লৌহ ও মণি, উপাদান, মণির যে "আকর্ষণ শক্তি" তাহা নিমিত্ত কারণ, এবং লৌহ ও মণি সংযুক্ত হইয়া থাকা পরিণামী কার্য্য। এক্ষণে দেখ যে, তোমার মতেও লৌহ ও চুম্বুক সংযোগ হইয়া পরিণামী কার্য্য উদ্ভব করে। অতএব আর বলিতে পার না যে, লৌহ ও চুম্বুকের মত পঞ্চভূত আপনাপনি সংযোগ হইয়া এই দেহ উৎপাদন করে। এক্ষণে তোমাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দেহ একটা কার্য্য, পঞ্চভূত উপাদান, এবং ঘটের "নিমিত্ত কারণ" কুলালের মত একটি "জ্ঞান শক্তি" (চিৎ শক্তি) আছে, যাহা পঞ্চভূতের সংযোগের নিমিত্ত হয়। যদি বল যে, দেহের "নিমিত্ত কারণ" চুম্বুকের আকর্ষণ শক্তির মত এক শক্তি যাহা ঐ পঞ্চভূত মধ্যেই থাকে; তাহা বলিতে পারে না, কারণ ইহার সদ্‌যুক্তি এই যে, চুম্বুকের যে "আকর্ষণ শক্তি" উহা জড়শক্তি (অজ্ঞান শক্তি) উহাতে বিচীত্র কার্য্য শৃঙ্খলতা ও শীঘ্র নৈপুণ্যাদি অভাব, কাজেই জড়শক্তি (অজ্ঞান) বলিয়া

স্বীকার করিতে হইবে; এবং পঞ্চভূতের পরিণামী দেহের যেটি নিমিত্ত শক্তি হয়, উহা জ্ঞানশক্তি (চিৎ শক্তি); কারণ এই দেহের অদ্ভুত বিচীত্র নির্ম্মাণ কৌশলই তাহার প্রমাণ দিতেছে।

এখন যদি বল যে, এই দেহের নিমিত্ত কারণকে জ্ঞানশক্তি বলিয়াই স্বীকার করিলাম; কিন্তু লৌহ ও চুম্বুক সংযোগ কার্য্যের নিমিত্ত চুম্বুকের আকর্ষণ জড়শক্তি যেরূপ উপাদান চুম্বুক মধ্যেই অবস্থিতি করে, সেই রূপ এই দেহের নিমিত্ত "জ্ঞান শক্তি" দেহের উপাদান পঞ্চভূতের কোটির মধ্যেই অবস্থিতি করে। এইখানে একটা কথা, বল দেখি যে, যে "জ্ঞান শক্তি" সকলের নির্ম্মাতা ও জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা তাহাকে কে নির্ম্মাণ করিবে, কে জানিবে, আর কেইবা দেখিবে? কুলালকে কি তাহার ঘট নির্ম্মাণ ক্রিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারে? না, তাহার ঘট-কার্য্য তাহাকে দেখিতে পায় ও জানিতে পারে?—কুলালই তাহার ঐ ঘট নির্ম্মাণ ক্রিয়া ও ঘট-কার্য্যকে জানে ও দেখে। এক্ষণে যে তুমি জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছ যে, "দেহের উপাদান পঞ্চভূতের মধ্যেই ঐ নিমিত্ত কারণ "জ্ঞান শক্তি" থাকে, সেই "তুমিই" এই দেহ ও তাহার উপাদান পঞ্চভূতের নিমিত্ত কারণ "জ্ঞান শক্তি"। যদি বল তাহার প্রমাণ ও যুক্তি কি? ঐ ঘট নির্ম্মাণ ক্রিয়া ও তাহার কার্য্য ঘটেতেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখ না কেন? অর্থাৎ কর্ত্তা তাহার ক্রিয়া ও কার্য্য যে জানে ও দেখে; ঐ দেখ কুলাল তাহার কার্য্য ঘটকে জানিতেছে এবং দেখিতেছে, ঘট কুলালকে জানিতে ও দেখিতে পাইতেছে না; অর্থাৎ তুমিই এই দেহ এ উপাদান পঞ্চভূতকে জানিতে ও দেখিতে পাইতেছ, দেহ ও তাহার উপাদান পঞ্চভূত তোমাকে জানিতে ও দেখিতে পায় না; অতএব এইখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল যে, "তুমিই" এই দেহ ও তাহার উপাদান পঞ্চভূতের কর্ত্তা (নিঃ কাঃ) সেই "জ্ঞান শক্তি" (বেদান্তের চিৎ শক্তি)। যদি বল যে, সেই "তুমি" (চিৎ শক্তি) তোমাকে জানে না, এইটি তোমার প্রধান ভ্রম, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য কারণত্বের কর্ত্তা ও প্রকাশক তাহাকে আর কে জানিবে ও প্রকাশ করিবে? তোমার ক্রিয়া ও কার্য্য দ্বারা তুমি আপনাকে প্রকাশ কর এবং জানিতে পার। এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, যখন "তুমি" (চিৎ শক্তি) এই দেহ ও তাহার উপাদান পঞ্চভূতের কর্ত্তা হইলে, তখন "তোমার (চিৎ শক্তির) এই দেহ ও তাহার উপাদান

পঞ্চভূতের মধ্যে থাকাত সম্ভব হইতে পারে না। কারণ এটি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, ঘটের কর্ত্তা কুলাল তাহার ঘট নির্ম্মাণ ক্রিয়া ও ঘট-কার্য্য হইতে পৃথক্ অবস্থিতি করে। ভাল, বল দেখি যে, যদি তুমি (চিৎ শক্তি) তোমার কার্য্য এই দেহ ও উপাদান পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত হইবে, তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমার (চিৎ শক্তির) কার্য্য দেহ ও উপাদান পঞ্চভূতকে জানিতেছ এবং দেখিতেছ? অতএব এই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হইল যে "তুমি" (চিৎ শক্তি) কুলালের মত তোমার কার্য্য দেহ ও উপাদান পঞ্চভূতাতীরিক্ত "চিৎ শক্তি" হও।

এক্ষণে দেখ যে, যাহা দেহাতীরিক্ত বস্তু, দেহনাশে তাহার নাশ হয় না। অর্থাৎ কুলালের কার্য্য ঘটটি নাশ হইলে কি কুলালের অভাব হইতে পারে? ঘট উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে কুলাল যেরূপ ছিল, ঘট অবস্থিতি কালেও সেইরূপ থাকে, এবং ঘটটী ভগ্ন হইলেও ঠিক সেই একইরূপ থাকিবে। অতএব এই দেহ বা উপাদান পঞ্চভূত উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে "তুমি" (চিৎ শক্তি) যেরূপ ছিল, দেহ ও উপাদান ভূত সকল অবস্থিতি কালেও সেইরূপ থাকে, এবং দেহ ও উপাদান অভাব হইলেও ঠিক সেই একরূপ থাকিবে। এই যুক্তি দ্বারা বেদান্তের "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য প্রমাণ হইল। নাস্তিক তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ইহ লোকে ও পরলোকে শ্রেয় আছে, নচেৎ অবসাদ সাগরে ডুবিয়া মরিবে।

যদি কেহ এই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য জানিতে চাও, এবং বিষাদ ও অশান্তির হস্ত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অমৃত পানের অধিকারী হইতে চাও, তবে অদ্বৈত বেদান্তবাদীর "চিৎ শক্তি" স্বীকার কর।

চতুর্থ প্রস্তাব।

চার্ব্বাক দর্শনের মতাবলম্বী হইয়াই একটা যুক্তি দেখাইতেছি,—"যথা, মদ্যকণার মাদক শক্তি থাকার মত পঞ্চভূত মধ্যে এক শক্তি আছে, সেই শক্তি প্রভাবে পঞ্চভূত সংযুক্ত হইয়া জীবদেহ উৎপাদন করে, এবং সেই দেহের বা দেহস্থ উন্মাদ শক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য সুখ ও শান্তি লাভ করা; নাস্তিকচূড়ামণি চার্ব্বাক এই কথা বলে।

বিচার।

নাস্তিক চার্ব্বাক শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্যই পঞ্চভৌতীক দেহকে নানাবিধ বিচীত্র ভোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আইস, দেখি যে, কি উপায়ে দেহস্থ জৈবিক শক্তি পরম সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে।—চার্ব্বাকের বিষয় সুখ যে দুঃখ মিশ্রিত তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, বিষয়ানুরাগী কিছুকাল বিষয় ভোগ করিয়া একবারে সেই বিষয় ত্যাগ করে। ভোগ যাহার একমাত্র সুখ, সে ভোগ ত্যাগ করে কেন? যদি বল বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাই বিষয় ত্যাগ করে। তাহা বলিতে পার না, কারণ যে পরিতৃপ্ত সে কেন আবার বিষয়ান্তরে সুখ লাভের চেষ্টা করে? ইহাতে বুঝা যায় যে, বিষয়ে প্রকৃত সুখ নাই, যে প্রকৃত সুখ পাইয়াছে, সে কখন সুখের জন্য বিষয়ান্তরে যায় না। যে বিষয় নাস্তিকের প্রধান প্রিয়, সেই বিষয় ত্যাগ করিয়া নাস্তিক কেন বিষয়ান্তরে গমন করে? ইহার কারণই বিষয়ের দোষ ও দুঃখ, অর্থাৎ বিষয় ভোগ দ্বারা সুখের পূর্ণতা হয় না। যদি একবার ভোজন করিলে দেহের উপযোগী উপাদান পূর্ণ হইত, তাহা হইলে কে দুইবার ভোজন করিত? যেরূপ একবার আহার করিলে দেহের সমস্ত অভাব পূর্ণ হয় না, সেইরূপ বিষয় ভোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সুখান্বেষণ করিতে হয়। অতএব এই যুক্তি দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, চার্ব্বাকাদির অনুমোদিত বিষয় ভোগে পরম সুখ ও শান্তির অভাব। যদি বল যে বিষয়টি ত্যাগ করা হয়, সেই বিষয়টীর ভোগ বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তাহা বলিতে পার না, কারণ ক্ষুধা নিবারণ করাই ভোজনের উদ্দেশ্য। যদি তণ্ডুলকণা ভোজন করিয়া উদর পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি আর উপাদেয় খাদ্যাদি ভোজনে প্রবৃত্তি হয়? এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে, ততক্ষণ ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়, উদর পূর্ণ হইলে আর ভোজনের ইচ্ছা থাকে না। যেরূপ ক্ষুধা একরূপ, কিন্তু খাদ্য নানাবিধ, সেইরূপ উপভোগ্য বিষয় বহুবিধ হইলেও সুখ একই বস্তু। একটি বিষয় ভোগ করিয়া নাস্তিক যদি পরিতৃপ্ত হইত, তাহা হইলে কখন বিষয়ান্তরে যাইত না; অর্থাৎ এক তণ্ডুলকণা ভোজনেও যে উদর পরিপূর্ণ হয়, নানাবিধ উপাদেয় ভোজনেও

সেই উদর পূর্ত্তিই হয়; সেইরূপ একটি বিষয় ভোগ করিয়াও যে সুখ লাভ হয়, বহু বিষয় ভোগ করিয়াও সেই সুখই লাভ হয়; এক্ষণে বেশ জানা যাইতেছে যে, বিষয়ে প্রকৃত সুখ ও শান্তি নাই। আর একটি যুক্তি এই যে, নাস্তিকের দেহস্থ জৈবিক শক্তির প্রত্যহ তিনটি অবস্থা হয়, অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থা কালে দেহস্থ জৈবিক শক্তি পঞ্চভৌতীক দেহ বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ভোগ দ্বারা চরিতার্থ করে, এবং সুষুপ্তিকালে স্বীয় কারণে লয় বা পঞ্চভৌতীক দেহে বিলীন (তমোভিভূত) হয়। তমগুণ (জড়) ঐ ভৌতীক দেহের ধর্ম্ম। এক্ষণে বল দেখি যে, ঐ জৈবিক শক্তি জাগ্রত ও স্বপ্ন কালে যখন মনোবৃত্তি দ্বারা বিষয় (দেহ গ্রাহ্য বস্তু) ভোগ করে, তখন অধিক সুখ, কি সুষুপ্তি কালীন তমোভিভূত (ইন্দ্রিয় বা দেহ গ্রাহ্য বস্তু হইতে পৃথক্, অর্থাৎ ঐ জৈবিক শক্তির মন বলিয়া যে একটা দেহ বা অবস্থা আছে, যাহা জাগ্রত ও স্বপ্ন কালে বিদ্যমান থাকে, সেই মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ) হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক সুখ ও শান্তি লাভ করে? এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, নাস্তিকের দেহস্থ জৈবিক শক্তির জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে সুষুপ্তি কালেই ঐ জৈবিক শক্তি অধিক সুখ লাভ ও শান্তি লাভ করে। অতএব যদি এখন কোন কৌশল দ্বারা ঐ সুষুপ্তি (অর্থাৎ ঐ জৈবিক শক্তির বিষয় ভোগ বৃত্তির নিরুদ্ধ) অবস্থা অধিক কাল (যতদিন এই পঞ্চভৌতিক দেহ থাকিবে) স্থায়ী রাখা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত সুখ ও শান্তিলাভ (অর্থাৎ যে সুখ ও শান্তি ভোগের জন্য দেহস্থ জৈবিক শক্তি বিষয়াসক্ত) হয়। এক্ষণে তুমি ঐ জৈবিক শক্তিকে দেহাতীরিক্ত আত্মা বল আর নাই বা বল, কিন্তু প্রশান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে, তোমার দেহস্থ জৈবিক শক্তির তিনটি অবস্থা ও বিষয় ভোগ দ্বারা ইহলোকে সুখ লাভ হয় স্বীকার করাতেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ তোমার দেহস্থ জৈবিক শক্তি যেরূপ সুষুপ্তিকালে বিষয় ভোগ বাসনা সকল নিরুদ্ধ করিয়া বিষয়াতীরিক্ত সুখ ও শান্তিলাভ করে, আস্তিক যোগীগণও সেইরূপ যোগ কৌশল দ্বারা দীর্ঘকাল (যতদিন দেহ থাকে) তোমার সুষুপ্তির সুখ ও শান্তি অপেক্ষা পরম সুখ ও পরম শান্তি উপভোগ করেন। তোমার সুষুপ্তি অপেক্ষা যোগ কৌশল দ্বারা যোগীর যে সমাধি (চিত্ত বৃত্তি নিরোধ) হয়, তাহা দীর্ঘকাল (যতদিন দেহ থাকে) [illegible]

জৈবিক শক্তি ভোগ বাসনা শূন্য (চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ) হয়, ভোগ বাসনা শূন্য হইলেই সুখ ও শান্তি লাভ হয়। এইখানে তোমার মতেই সিদ্ধ হইল যে, যোগীই প্রকৃত ভোগ বাসনা শূন্য হইয়া পরম সুখ ও শান্তি লাভ করেন।

আর একটি যুক্তি এই যে, তুমি বা তোমার দেহস্থ জৈবিক শক্তি যে সুখ, ভোগের জন্য বিষয়াশক্ত হয়, সেই সুখ বিষয়েতে আছে কি তোমাতে (ঐ জৈবিক শক্তিতে) আছে? যদি বল বিষয়ে, তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? যুক্তি এই যে, তোমার জৈবিক শক্তির স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে বিষয় ভোগ হয় না, কিন্তু তখনত তোমার (ঐ জৈবিক শক্তির) সুখ উপভোগ হয়। অতএব একটু চিন্তা করিয়া দেখ, দেখিবে যে, সুখ বিষয় বা ভৌতীক দেহের গুণ নহে, তোমার অনুমোদিত দেহস্থ ঐ জৈবিক শক্তিরই গুণ। এইখানে তুমি প্রকারান্তরে বেদান্তের দেহাতীরিক্ত আত্মার আনন্দ ধর্ম্ম স্বীকার করিলে। অতএব তোমার স্বীকৃত দেহস্থ জৈবিক শক্তির আনন্দ গুণটি বেদান্তের আত্মার আনন্দগুণের সহ ঐক্য হইল। তাহা হইলে অন্য গুণেরই । কেন একতা না থাকিবে? বস্তুর সহিত বস্তুর জাতিগত সম্বন্ধ থাকিলেই সেই দুই বস্তুই এক বস্তু হইবে। এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া নিরাকৃত হইল যে, তোমার অনুমোদিত জৈবিক শক্তি ও বেদান্তের আত্মার মত "চিৎ শক্তি", (চিঃশক্তি মাত্রই দেহ থাকিয়া দেহাতীরিক্ত হয়) এই চিৎশক্তি তোমার ভৌতীক দেহের নিমিত্ত কারণ হয়। নিমিত্ত কারণ কখন কার্য্য হইতে পারে না; অতএব ঐ চিৎশক্তি দেহস্থ হইয়াও দেহাতীরিক্ত হয়। এক্ষণে বল যে দেহ নাশে কেমন করিয়া দেহাতীরিক্ত বস্তুর অভাব হইবে? কার্য্য নাশ কখন কর্ত্তার অভাব হয় না। শেষ কালে একটা কথা এই যে আমরা তোমাদের দেহাতীরিক্ত আত্মা স্বীকার করিতে বলি না, তবে এইমাত্র বলি যে, যখন জীবনের উদ্দেশ্য সুখ উপভোগ করা, আর সেই সুখ ভোগ-বাসনা ত্যাগে (অর্থাৎ তোমারই মতে সুষুপ্তি কালে ভোগ ইচ্ছা থাকে না) অধিক উপভোগ হইয়া থাকে; তখন যোগীগণের অনুমোদিত যোগ কৌশল দ্বারা একবারে ভোগ-বাসনা শূন্য হওয়া কি ভাল নহে?

পঞ্চম প্রস্তাব।

এক্ষণে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দেখা কর্ত্তব্য যে, যাহা সকল কার্য্য ও সকল কারণের মূল কারণ (The great cause) তাহাকে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিশেষ রূপ নাম ও গুণ দিলে, অথবা বেদান্তের মত রূপ নাম গুণ শূন্য করিলে কি দোষ হয়?

বিচার।

এই বিষয়ে আমরা অধিক কথা বলিতে চাহি না, একটা সামান্য যুক্তি আশ্রয় করিয়া বিচার করিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাল বল দেখি যে; যদি বলি

যে এই পৃথিবী কূর্ম্মের উপর রহিয়াছে, তাহা হইলে কি তোমার মনে এ সংশয় আসে না যে, ঐ কূর্ম্ম কিসের উপর আছে? আর যদি বলি যে, ঐ কূর্ম্ম বাসকী নাগের উপর আছে; আবার তুমি কি জিজ্ঞাসু হও না যে, ঐ নাগ কিসের উপর আছে? এইরূপে কি একটি অনাশ্রয় দোষ আইসে না? আর সেই অনাশ্রয় দোষ নিবারণের জন্য তোমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হয় যে, এই বসুধা কাহারও উপর অবস্থিত করে না, ইহা শূন্যে আছে। এক্ষণে বাস্তবিক দেখ যে, পৃথিবী শূন্যে আছে নিরাকৃত হওয়ায় তোমার সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল এবং প্রকৃত তত্ত্বও আবিস্কৃত হইল। এক্ষণে ঐরূপ যদি নির্দ্দিষ্ট রূপ নাম ও গুণ দিয়া বলি যে, চার্ব্বাকানুমোদিত মদ্যকণায় মাদক শক্তি থাকার মত পঞ্চভূতান্তর্গত একটি শক্তি এই সৃষ্টির কারণ, কিম্বা বৈজ্ঞানিকদিগের অনুমোদিত তাপ ও অণু এই সৃষ্টির কারণ, কিম্বা সাংখ্যানুমোদিত জড় প্রকৃতি ঐ সৃষ্টির কারণ, কিম্বা পৌরাণিকানুমোদিত ষড়ৈশ্বর্যশালি ঈশ্বর এই সৃষ্টির কারণ, তাহা হইলে কি উক্ত প্রকার অনাশ্রয় দোষ ও সংশয় হয় না?—সুতরাং সকল কার্য্য ও কারণের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার কোন বিশেষ রূপ নাম ও গুণ নাই। যত প্রকার রূপ, যত প্রকার নাম (শব্দ) এবং যত প্রকার শক্তি (গুণ) আছে তাহা সকলের অতীত বলিলেই এইখানে সকল দোষ ও সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। সেই জন্যই অদ্বৈত বেদান্তবাদী অনাদি অনন্ত, নিরাকার নির্গুণ কায়মনোবাক্যের ও বুদ্ধির অগোচর এক অপূর্ব্ব সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন। এই বেদান্ত বিচার যে কত গভীর ও উচ্চ তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন।

মন্তব্য।

লোকে নাস্তিক হয় কেন? দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি পড়িয়া প্রায় অনেক লোকেই বুদ্ধিভ্রান্ত ও জ্ঞানান্ধ হয়, এবং শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়। ঐ সময় বিষাদ ও অশান্তি আসিয়া দেখা দেয়; সুতরাং পশুদের মত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও মদ্যপানাদি করিয়া ঐ অবষাদ ও অশান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উন্মত্ত হয়। বাস্তবিকই কলিকাতাদি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনেক বি, এ, এম, এ, পরিক্ষোত্তীর্ণ যুবার এই দশা ঘটিয়াছে ও ঘটে জানিবে। অধিক লোকেই যে জীবনের কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিতে পারে না; এবং কোন পথে গেলে যে প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাইবে, তাহা বুঝিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়; কাজেই অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় ও মদ্যপানাদি দ্বারা মনটাকে এক প্রকারে ভোব দেয়। ইতি।

৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ৮ম খণ্ড।

"হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভ্রম প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সাদি দোষ দ্বারা বাক্যের অবিশুদ্ধিতা জন্মে। সেই ভ্রম প্রমাদাদি ঈশ্বরে নাই সুতরাং তদ্বাক্যে ও ভ্রম-প্রমাদাদির সম্ভাব নাই। ৯।

বেদোদিত স্বর্গাদি বিষয় সকলের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূতত্ব নিবন্ধন এবং বেদের অতিশয় বিস্তারতা হেতুকও বেদ কর্ত্তৃত্ব যদি ঈশ্বর ভিন্ন সম্ভাবনা হয় তবে তাহা বল ? । ১০ ।

ভ্রমাদ্যস্তে যথাদিভ্যো যদ্বাসামবিশুদ্ধয়ঃ ।
তেচেশ্বরে ন বিদ্যন্তে তাদৃগ্যদ্বচসাং কথং । ৯ ।
অতীন্দ্রিয়ত্বাদর্থানাং অতিবিস্তারত স্তথা ।
তৎ কর্ত্তৃত্বং সম্ভবেত্তাং যদিনন্যাদ্যেশ্বরেণ ? । ১০ ।

শব্দ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহা সঙ্কেত (ঘট শব্দের কম্বুগ্রীবাদি-মান্ পদার্থে) শক্তি প্রতিপাদ্যার্থের জ্ঞানাধীনই হইয়া থাকে, শক্তিগ্রহ না থাকিলে পদার্থ জ্ঞান হয় না। অতএব স্বর্গ ও অপূর্ব্বাদি অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সঙ্কেত কর্ত্তা, ঈশ্বর ভিন্ন আর কে হইতে পারে?। ১১।

যিনি স্বর্গাদি বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন তিনিই (দুঃখানবচ্ছিন্ন) নিরবচ্ছিন্ন সুখ জনক স্থানাদ্যর্থে স্বর্গাদি শব্দ সঙ্কেত করণার্থে যোগ্য হন। সেই অলৌকিক বিষয়ের সঙ্কেত কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই হইতে পারে না। ১২।

যদি বল শব্দেরই তথাবিধার্থ প্রতিপাদনে স্বভাব; তবে আর্য্যজাতিতে ও ম্লেচ্ছ জাতিতে এক শব্দেরই অর্থের বিসদৃশতা দেখা যায় কেন? সকলের মতেই একার্থ হইতে পারে, ভিন্নার্থ হওয়া যুক্ত নহে। ১৩।

কোন প্রকারেও কোন ব্যক্তি স্বভাবের অতিক্রম করিতে পারে না, তবে স্বাভাবিক অর্থ প্রতিপাদক-শব্দের ভিন্নার্থ বুদ্ধি হয় কেন?। ১৪।

বেদকে বাঙ্‌ময় বলিয়া বার্ত্তমানিক উচ্চরিত বাক্যের ন্যায় পৌরষের বলিতে হয় বল;—কিন্তু বেদের আপ্তোক্তত্ব (ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ রহিত পুরুষোক্ততা) অনুমান সিদ্ধই রহিয়াছে, যেহেতুক বেদকে মহাজন মহর্ষি সকলে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ১৫।

শব্দাদর্থ প্রতীতির্হি সঙ্কেতাদেব নান্যথা।
স্বর্গা পূর্ব্বাদি শব্দানাং কঃ সঙ্কেতয়িতা ভবেৎ॥ ১১॥
স্বর্গাদিযো বিজানাতি সঙ্কেতয়িতু মর্হতি।
স্বর্গাদি শব্দং তত্রার্থে নেশ্বরা দপরস্ত্বসৌ॥ ১২॥
শব্দস্যৈব স্বভাবশ্চেৎ আর্য্য ম্লেচ্ছাদি জাতিষু—
একস্যৈবার্থ বৈষম্যং শব্দস্যেতি ন সাম্প্রতং॥ ১৩॥

১৩। শ্লোকে,—হিন্দুধর্ম্মে মরীচি অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডলকে আকাশস্থ সপ্তর্ক্ষ বলে। ম্লেচ্ছাদি বিজ্ঞানেও তাহাকেই বড় ভালুক বলে। এইরূপ আধুনিক সঙ্কেত কত শত শত স্থানে রহিয়াছে, তাহা লিখিতেও এক বৃহৎ পুস্তক হয়।

ন কেনচিৎ প্রকারেণ স্বভাব স্যাপ্যতি ক্রমঃ—
কদাচিৎ শব্দবতেষস্তং বিভিন্নার্থ ধিয়ঃকুতঃ॥ ১৪॥
বাঙ্ময়ত্বাৎ পৌরুষেয় মস্তং ইদানীন্তন বাক্যবৎ।
আপ্তোক্তত্বানুমেয়া মহাজন পরিগ্রহাৎ॥ ১৫॥

স্বর্গ ও অপূর্ব্বাদি অলৌকিক বিষয়ে কাহারও (ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের) হইতে পারে না, যদ্দারা বেদের প্রামাণ্য সংশয় কল্পনা হইবে? । ১৭ ।

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পুস্তকে স্বর্গাদির বিষয় বর্ণিত থাকিলেও তাহা বেদোল্লিখিতের অনুকৃতি মাত্র—কারণ বেদ সকল ধর্ম্ম পুস্তকের অগ্রগণ্য। যদি বেদের রচক কোন ব্যক্তি থাকিত, তবে পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ অবশ্যই তাহার নাম জানিতেন এবং লোক বঞ্চনার্থ বেদ রচিত হইলে সেই ধূর্ত্তের অগ্রণী রচককে অবশ্যই সকলে নাম করিয়া নিন্দা করিত। ২০ ।

বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্মাদি নিন্দিত হইলে কোন কালেও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বৈদিক ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। কারণ মিথ্যা বিষয়ে কোন ব্যক্তি কায়ক্লেশ পূর্ব্বক (কৃচ্ছ্রসাধ্য উপবাস নিয়ম ব্রতাদিতে) প্রবৃত্ত হয় না। ২১ । ইহা দ্বারা বঞ্চককৃত বেদ বলিয়া যে নাস্তিকদের সিদ্ধান্ত ছিল তাহা নিরস্ত হইল।

এই বেদোদিত বিষয়ে কিছুই মিথ্যা বিষয় বর্ণিত হয় নাই, কারণ ঈশ্বর কিরূপে মিথ্যা বর্ণনা করিবেন। জন্মান্তরে ফল (শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্টের কার্য্য) হইবে ইহা যথার্থই কল্পনা (বিচরণ) হইয়াছে। ২২ ।

নাস্তিকগণ বেদকে এই বলিয়া নিন্দা করেন;—ক্রিয়া করিলে বর্ত্তমান কালেই কেন তাহার ফল দেখা যায় না। সুতরাং বেদ বৃথা কথা সব বলিয়া গিয়াছেন। (এই বিষয়ের উত্তর এই যে) বেদোক্ত কর্ম্মের অঙ্গবৈগুণ্য নিবন্ধন ও ফলের উদয় হয় না। অঙ্গের সহিত বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ফল হয়। ২৪ ।

কস্তাপ্যলৌকিকীতাবৎ স্বর্গাপূর্ব্বাদি কল্পনা।
যত্তাব্যতে কথংনাম যেন প্রামাণ্য সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
আসীচ্চেৎ কল্পকঃ কশ্চিৎ বেদানাং প্রাকৃতপেস্তদা।
সোঽবশ্য মুপলভ্যেত ধূর্ত্তানাম গ্রণীরপি ॥ ২০ ॥
উপলব্ধে তদুক্তেষু বিষয়েষু ন জাতুচিৎ।
বুদ্ধিমন্তঃ প্রবর্ত্তেরণ কায়ক্লেশাদি কারিষু ॥ ২১ ॥
এতাস্মিন্ননৃতং নাস্তি কথং কুর্য্যাৎ তদীশ্বরঃ।
জন্মান্তর ফলত্বন্তু যুক্তচিৎ পরিকল্প্যতে ॥ ২২ ॥
যথাবৈগুণ্যতোঽন্যানাং ফলানুদয় কল্পনা।
সাঙ্গাদি বৈদিকাদস্তু কর্ম্মণঃ ফল সম্ভবং ॥ ২৪ ॥

অগ্নিহোত্র যাগের প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের বিধি দর্শন করিয়া এবং উভয় কালের হোমে নিন্দাবাদ দর্শন করিয়া নাস্তিকেরা বলিয়াছেন বেদ ভ্রান্ত পুরুষ প্রণীত, কারণ পূর্ব্বাপর লিখিত বিষয় বিস্মৃত হইয়াই এই বিপদে পড়িয়াছে, ইহার উত্তর এই যে, অগ্নিহোত্র যাগ স্থলে ইচ্ছা বিকল্প স্বত্ব। যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালেই হোম করিবেন এবং যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনিও প্রতিনিয়ত সায়ংকালে হোম করিবেন। কিন্তু প্রাতঃকালের হোম কর্ত্তা সায়ংকালে হোম করিলে তিনি নিন্দিত হইবেন এবং সায়ংকালের হোম কর্ত্তা প্রাতে হোম করিলেও তিনি নিন্দিত, এই বিষয়ের মীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

সায়ংকাল বা প্রাতঃকাল যে কোন কালকে স্বীকার করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিহোত্র যাগ আরম্ভ করিলে তাহার ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু পরে যদি নিয়মিত কাল ত্যাগ করিয়া অন্য কালের আদর করে তবে সেই যাগ কর্ত্তা নিন্দা শ্রুতি দ্বারা নিন্দিত হয়। ২৫।

বেদের পুনরুক্তিকেও নাস্তিকগণ উল্লেখ করিয়া বেদভ্রান্ত প্রণীত বরিয়াছে তদ্বিষয়ের উত্তর এই, যে. বেদে অভ্যাসার্থে বা দৃঢ় প্রত্যয়ার্থে উক্ত বিষয় সকল বিরচিত হইয়াছে, পুনরুক্ত দুষ্ট নহে, যে হেতুক পূর্ব্বোক্ত কারণ রহিয়াছে, অতএব নিষ্প্রয়োজন কিছুই উক্ত হয় নাই। ২৬।

ইত্যাদিরূপে নাস্তিক প্রদত্ত বৈদিক দোষ সকল অভিজ্ঞ দার্শনিকগণ তন্ন তন্ন করিয়া মীমাংসা পূর্ব্বক বেদের অখণ্ড প্রামাণ্য স্থাপন ও প্রমাণ গরিষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সাংখ্য দর্শন প্রণেতা ভগবান কপিলের প্রকৃতি পুরুষ বাদ দর্শন করিয়াই কুতার্কিক নাস্তিকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, ক্রমে দেশব্যাপ্ত হওয়ার প্রায় উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অন্তঃসার বিহীন "ঈশ্বরোনাস্তি" এই বাদকে দার্শনিকগণ বিচার করিয়া ফুৎকার দ্বারা উড্ডীন করিয়া দিয়াছেন যে তাহা পাঠে বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ন ব্যাঘাতোঽভ্যুপেত্য বং কশ্চিৎকালমাদিতঃ।
অন্তকালে যদাঃপশ্চাৎ নিন্দাবাদেন নিন্দতে॥ ২৫॥
অভ্যাসমাত্রাদেতস্মিন্ পুনরুক্তিন শক্যতে।
যথা সত্যাভবতে জাতু ন কিঞ্চিন্নিষ্প্রয়োজনং॥ ২৬॥

স্বভাববাদি নাস্তিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে না চাহিয়া বলিয়াছেন।—

"অস্তুতাবদসৌ সর্ব্বজ্ঞঃ কর্ত্তা বক্তা তু কথং?
ইতিচেৎ বচন শক্তৌ সত্যাং পরার্থৈকত্তনত্বাৎ।
যোহি হিতাহিত বিভাগং বিদ্বান্ পরার্থাভিপ্রায়ঃ—
স্থান চারণ পাটবেসতি অবিদুষোহবশ্য মুপদিশেৎ
যথা অন্ধায় দক্ষিণেন যাহি বামেন মাগাঃ
ইতি পৃথগজ্জনোপি তথা ভগবানিতি"।

বৌদ্ধাধিকার।

নাস্তিকদিগের আশঙ্কাও স্বয়ংপ্রদত্ত উত্তর সকল তার্কিক কুলকেশরী ভগবান্ উদয়নাচার্য্য স্বপ্রণীত বৌদ্ধাধিকার গ্রন্থে অতীব বিসদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ই এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

"তাঁহারা বলেন, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বরং জগতের কর্ত্তা হউন, কিন্তু তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) বক্তা (বেদবক্তা) বলিব কেন?" নাস্তিকগণের এরূপ প্রশ্নই অসঙ্গত। কারণ শর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বচন শক্তি আছে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে, নচেৎ সর্ব্বশক্তিমত্তা থাকে না। বচন-শক্তি থাকিলে সেই বচন-শক্তির প্রয়োজনার্থে নিশ্চয়ই বিস্তার হয়। যিনি হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ হন, অথচ যাঁহার পরের হিতার্থে অভিপ্রায় থাকে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তিনি অবশ্যই উপদেশ করিবেন।

যেমন অন্ধ ব্যক্তিকে দক্ষিণ পথে যাও, বামভাগের পথে যাইও না, এইরূপ উপদেশ, অপৃষ্ঠ হইয়াও বহিরঙ্গ ব্যক্তি করিয়া থাকেন; সেইরূপ জগৎ-হিতৈষী ভগবান্ও বেদ দ্বারা সকলকে উপদেশ দিয়াছেন।

অপিচতত্রৈব।

স্থান করণ পাটব মসিদ্ধং দেহা ভাবৎ
তেষাং তাবাদিং বিবৃতি রূপত্বাৎ ন চ তদন্ত-
বেনৈব বর্ণিবর্ণভিঃ তদুৎপত্তের বধারণাৎ।

ন চ তৎ কারণ মনধিষ্ঠিতং তৎ কর্তৃত্ব
মীশ্বরস্থাপীতিবেন্ন যস্য কার্য্যস্য যৎ কারণং
মন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধং তৎ কারণাধিষ্ঠান-
বদবশ্যম্ভাব নিয়মাৎ—

বৌদ্ধাধিকার।

অর্থ।

ঈশ্বরের শরীর নাই বলিয়া তাল্বাদিতে বাচ্যভিঘাতেরও শক্তি নাই, সুতরাং তিনি বচন বলিতেই শক্ত নহেন, নাস্তিকদিগের এই প্রশ্নেরও আচার্য্য সমাধান করিতেছেন।

ঈশ্বরের দেহ নাই বলিয়াই স্থান ও করণের পটুতা অসিদ্ধ হইতেছে। বাক্যের সম্বন্ধে তাল্বাদির বিস্তারের হেতুতা। তাল্বাদি বিস্তার ব্যতীতেও বাক্যোচ্চারণ সামর্থ্য আছে, এইরূপও বলিতে পারা যায় না। বাক্যোৎপত্তির প্রতি তাল্বাদি বিবৃতির নিশ্চয় কারণতা। যদি বল নিরাশ্রয়েই বাক্যের কারণ তাল্বাদি রহিয়াছে, সুতরাং বাক্য প্রয়োগ কর্তৃত্ব ঈশ্বরের আছে। তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ যে কার্য্যের সম্বন্ধে যে কারণ অন্বয় ও ব্যতিরেক সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ তাল্বাদি থাকিলে শব্দোচ্চারণ করিতে পারিবে, তাল্বাদি না থাকিলে শব্দোচ্চারণ করিতে পারিবে না, এই নিয়ম সিদ্ধ), সেই কারণ ও সেই কারণের আশ্রয় স্থানের স্থূল সিদ্ধির নিমিত্তে তাহার অবয়ব পরম্পরাও কারণ এবং কারণাশ্রয় স্থানবান্ ব্যক্তির অবশ্য-ম্ভাব্যনিয়মাধীন (ঈশ্বরেরও তাদৃশ সংস্থান আছে)। "কুসুমাঞ্জলীগ্রন্থে ও ভগবান্ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন। শরীরান্বয় ব্যতিরেকানু বিধায়িনিকার্য্যে তস্যাপি তদ্বত্বাং গৃহ্নাতিহি ঈশ্বরোপি কার্য্যবশাৎ শরীরং।"

অর্থ।

শরীরের অন্বয় ও ব্যতিরেকের অনুগত কার্য্যে ঈশ্বরের ও শরীরের বিদ্যমানতা আছে, যে হেতুক কার্য্য বশতঃ ঈশ্বরও শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং স্ব শরীরী ঈশ্বর কর্তৃক বেদ প্রণয়ন সম্ভব হইল

নাস্তিকেরা বলেন যে, বেদসকল ভণ্ড প্রণীত, এই অজ্ঞতা সম্বন্ধে কথিত হইতেছে।

> কএবং লোকোত্তরো যঃ পরবঞ্চন কুতুহলী
> শ্রমেণ ব্রহ্মচর্য্যেন ব্রতেন ইজ্যয়া উপবাসাদিনা
> যাবজ্জীবমাত্মান মবসাদয়ন্তি ন হেতাবতো
> দুঃখ রাশেঃ প্রতারণ সুখং গরীয়ঃ।
>
> কুসুমাঞ্জলিঃ।

এইরূপে লোকের অতীত স্বভাবকে ছিল যিনি পরদিগকে বঞ্চন করণার্থে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই শ্রম দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, দ্বারা ব্রতাচরণ দ্বারা এবং উপবাসাদি দ্বারা চিরজীবন আত্মাকে অবসন্ন করিয়াছেন। (নিজে প্রবৃত্ত না হইলে অন্যে প্রবৃত্ত হইবে কেন?) পূর্ব্ব কথিত অনুষ্ঠান দ্বারা যে সকল দুঃখ রাশি হইয়াছিল তাহা হইতে যে পরপ্রতারণা জনিত সুখ অধিকতর তাহা কেহই বলিবে না। অতএব বেদ বঞ্চক কৃত নহে।

নাস্তিকদিগের চরম প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বর বেদবক্তা হইতে হয় হউন। কিন্তু তিনি ত সাক্ষাৎকার হইয়া কাহাকে কোন প্রকার উপদেশ দেন নাই, তবে কিরূপে লোক সকলে এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইল? একজন উপদেশ না করিলে প্রথমতঃ আজ্ঞামাত্রে তাঁহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না, এই আপত্তির ও মীমাংসা বৌদ্ধাধিকারে রহিয়াছে, যথা—

> "ভগবানএব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন ব্যগ্রঃ কায়সহ
> স্রাভিব্যুৎপাদ্য ব্যুৎপাদক ভাবস্থিতানি নির্ম্মায়—
> তদাতনং মহাজনং পরিগ্রাহিতবান নষ্টেনোপাধ্যায়
> বৎ স্বয়ং নটীত্বা ইতি সর্ব্বসুস্থং।"

অর্থ।

ভগবান্ ঈশ্বরই সম্প্রদায় সকল প্রবর্ত্তন করনার্থে ব্যগ্র হইয়া স্বীয় শরীর বহুরূপে উৎপন্ন করিয়া উৎপন্নাভিপ্রায়ে স্থিত বস্তু সকলকে নির্ম্মাণ করতঃ

তৎ সময়জাত মহাজনদিগকে সমুদয় বিষয় শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। যেমন নটের অধ্যাপক নট, স্বয়ং নৃত্য করিয়া শিক্ষার্থী নটকে নৃত্য শিক্ষা দিয়া থাকে, সেইরূপে ঈশ্বরও পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব সমুদয়ই সুস্থির হইল। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে শ্রুতি সকলও অনুকূল রহিয়াছে। যথা—

" নমোস্তু কর্ত্তৃভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমঃ।
নমোস্তু কুলালেভ্যঃ কর্ম্মকারেভ্যশ্চ বো নমঃ। "

অর্থ।

সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার থাকুক এবং রথকাররূপী কুলালরূপী এবং কর্ম্মাকাররূপী ঈশ্বর উদ্দেশে নমস্কার।

ইহা দ্বারা সযৌক্তিক রূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈশ্বর শরীর পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বেদ সকল বিস্তার করতঃ জগৎ নির্ম্মাণ ও জগতের লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া সম্প্রদায় সকল বিভাগতঃ প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। তদ্দ্বারাই বিবিধ শ্রেণীভেদে এই জগৎ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই বেদই সৃষ্টির মূল, এই বেদই ধর্ম্ম সকলের মূল এবং বেদই বিবিধ শ্রেণীভেদের মূল।

মনু বলিয়াছেন—

বেদোখিলেধর্ম্মমূলং স্মৃতি শীলেচতদ্বিদাং—

২। অং ৬।

বেদ অস্মিন ধর্ম্মের মূল এবং বেদজ্ঞদিগের স্মৃতি অনুশীলন ও ধর্ম্মের মূল জানিবে।

অপিচ।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাগরঃ স্বস্যচপ্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং।

মনুঃ ২। অ। ১২।

ইতি বেদ প্রামাণ্য নিরূপণং।

" বিচিকিৎসা। "

অন্তঃকরণে সময়ে সময়ে এক এক ভাব হইয়া থাকে, ঐ ভাবগুলি অন্তরের এক একটী ব্যাপার। অন্তরের ব্যাপারকে বৃত্তি বলে। যাবতীয় বৃত্তিগুলি চারিভাগে বিভক্ত। তদনুসারে অন্তরিন্দ্রিয়ও চতুর্ব্বিধ অভিধানে অভিহিত। সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ। এই বৃত্তি চতুষ্টয়ের বিভেদে এক অন্তঃকরণই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

" মনোবুদ্ধিরহঙ্কার শ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়াইমে॥
বেদান্ত পরিভাষা॥

সংশয় ও বিচিকিৎসা এক কথা। বিচিকিৎসা মানব মাত্রেরই আছে। পাত্র ও কার্য্যভেদে ঐ বিচিকিৎসায় সুফল ও কুফল উভয়ই হইয়া থাকে। সত্ত্ব-পূর্ণ সত্যকাম ব্যক্তির সংশয়ে সুফল ফলে। কুতার্কিক বৈতণ্ডিকের সংশয়ে কুফল ফলে। একের তমোমল অপসারিত হইয়া তত্ত্বপথ পরিস্কৃত হয়, অন্যে চিরান্ধকারে বিচরণ করে। একে সাবলম্ব, অন্যে নিরবলম্ব।

পরমেশ্বর অতীন্দ্রিয় অবাঙ্‌মনসোগোচর। সত্ত্বপ্রবণ হৃদয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু আচার্য্য মুখে আগমোপদেশে স্বরূপতত্ত্ব অধিগত করেন। ইহার বিচিকিৎসা স্বরূপ তত্ত্ব পথ সঙ্গতির আপাতঃ বিরোধ। আচার্য্য আগম বলে তাহার অপনোদন করিয়া মীমাংসা সাহার্য্যে বিরোধ ভঞ্জন করেন। সংশয় চিরনির্মূলিত হয়। বৈতণ্ডিকের আগম ও আচার্য্যে আস্থা থাকে না, সুতরাং সন্দেহ সন্দোহে বিচালিত হইয়া তথ্যলাভে বঞ্চনা করে। সুতরাং বিনাশ লাভ ঘটে। ভগবান বলিয়াছেন " অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি "। যাহার আগম ও আচার্য্য অবলম্বন সাধন আছে তাহারই সংসারে সৎপথ পরিস্কৃত হয়। আর যাহার অবলম্বন সংশয় অথবা শূন্য, তাহার পরিণাম ও শূন্য।

আমরা সনাতন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিতে পারি জগৎ, দেব ও অসুরে অথবা দেবভাব ও অসুর ভাবে পরিপূর্ণ। দেব-হৃদয় আস্তিকতার

পরিপূর্ণ, আর অসুর-মানস নাস্তিক্য পরিপূর্ণ। দেবগণ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বলাভ জন্ত অপৌরুষের আগম ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের অনুসরণ করেন। মোক্ষ ইঁহাদের শেষফল; সুতরাং পুনঃ পুনঃ জনম মরণরূপ সংসারের প্রতি নিরীক্ষণ করেন। ও তদনুরূপ প্রস্তুত হইতে অশেষ সাধনায় জীবনাতিপাত করেন। অসুর ভাবাপন্নগণ ইহ সংসারে বিষয়-সুখ ভোগকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া পরম তত্ত্বে সন্দিহান হইয়া প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সুখ ভিন্ন অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে সতত সন্দেহ প্রকাশ করেন। পান ভোজনাদি সংসার কার্য্যই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য, শূন্য পরিণাম।

সত্ত্বভাব ও আস্তিক্য ভারতেই পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। দেশান্তরে উহার নাম গন্ধও ছিল না। ভারত-সাহচর্য্য সঙ্গতি দ্বারা উহার কোন কথা অন্যত্র প্রচারিত হইলেও প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই, হইবেও না হইতেও পারে না। কারণ ভারতকেই ঈশ্বর কর্ম্মভূমি করিয়াছেন। আকৃতি প্রকৃতি বিচার ও আচার প্রভৃতি দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়। অধিকারী না হইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। অনাধিকারী তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রয়াস পাইলে কেবল বিচিকিৎসার বৃদ্ধি হইবে। ভারত ভিন্ন দেশে ধর্ম্মের সাধনা নাই, বিস্তর বিচিকিৎসা আছে। কলি মাহাত্ম্যে সেই বিচিকিৎসা এখন ভারতে প্রচুররূপে প্রচারিত হইয়া অধর্ম্মের প্রশ্রয় হইতেছে। অধর্ম্ম প্রাবল্যে সত্ত্বভাব বিদূরিত হইতেছে, সেইজন্ত অনেকের ধর্ম্মে আস্থা নাই, বেদে বিশ্বাস নাই, পরকাল বোধ নাই। প্রতিতত্ত্বে বিচিকিৎসা।

যাহার যত অজ্ঞানভাব সে তত বালক। বালককে নিরাময় করিতে হইলে প্রলোভনে ঔষধ গ্রহণ করাইতে হইবে। অনেক সময় নানা প্রলোভনে অশন পানাদি প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হয়; তখন বালক "কেন" "কেন" করিয়া কারণ চাহিলে, কারণ বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, বালকের স্বাস্থ্য বা জীবন কোনরূপে রক্ষিত হইতে পারে না। পিতৃ বাক্য অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করাই বালকের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভবরোগগ্রস্ত বালকগণকেও পিতৃস্থানীয় বেদ বাক্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, নচেৎ উদ্ধার নাই। বিষয় কুপথ্যে ক্রমশঃ বিকার বিরুদ্ধ হইয়া উপসর্গের উৎপত্তি হইতেছে। উপসর্গের বিসর্গ একান্ত প্রয়োজন। বিজাতীয় সংসর্গে এ উপসর্গের উপদ্রব পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বিদেশীয় রোগ পবিত্র আর্য্যধামে সংক্রমিত হইয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত কারণে

বেদবাণীতে বিচিকিৎসা, পরকালে বিচিকিৎসা, ধর্ম্মে বিচিকিৎসা, অশনে বসনে সর্ব্বত্রই বিচিকিৎসা। এসকল কুলক্ষণ, নিঃশেষের পূর্ব্বলক্ষণ।

ম্লেচ্ছগণ বলিলেন বেদ অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় কৃত গন্থ। অমনি ভারতের নবীন কৃতবিদ্য মহোদয়গণ উহা শিরোধার্য্যকরিয়া উদরস্থ করিলেন। সময় পাইলে উদ্গীরণ করিতেও ছাড়েন নাই। আবার দয়ানন্দ প্রমুখ কপটভিক্ষু তন্মতে প্রায়ই আস্থাবান। দয়ানন্দ সরস্বতীকে কপটভিক্ষু কেন বলিলাম যদিও সম্পূর্ণরূপে এ প্রবন্ধে প্রদর্শন করা বিধেয় নহে তথাপি দুই একটী কথা বলিব। কারণ দয়ানন্দের অন্তরে বিচিকিৎসা ছিল।

"দয়ানন্দ কপট ভিক্ষু"—কাশীধামস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া চাতুরী প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ইহা কাশী অঞ্চলে প্রসিদ্ধ আছে। শাস্ত্রে আছে।

"এতাশ্চান্যাশ্চ সেবতে দীক্ষা বিপ্রোবনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদি রাত্ম সংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ,,॥

মনু ৬অ ২৯ শ্লোক।

তৃতীয় আশ্রমে আত্ম সিদ্ধির জন্য ঔপনিষদী শ্রুতির সেবা করিতে হইবে। উপনিষদ্ গুলি চিরকাল শ্রুতি বলিয়া প্রচলিত হইয়াও বেদান্ত অভিধানে অভিহিত। কাহারও বিচিকিৎসা জন্মিল যে, ঈশোপনিষদ্ ভিন্ন যাবতীয় উপনিষদ্ পৌরুষের। বেদব্যাস স্বপ্রণীত দর্শনে ঈশোপনিষদ্ ব্যতীত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদের অধিক আলোড়ন করিয়া মীমংসা করিয়াছেন। তাহাদিগকে শ্রুতি বলিয়াছেন আচার্য্য পরম্পরায় তাহা অধীত ও অধ্যাপিত হইতেছে। বেদান্ত দর্শনে যথা।—

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ', অং ২ পাং ১ সূ ২৭।
"পদান্ত তচ্ছ্রুতেঃ" অং ২ পাং ৩ সূ ১৪।
"ভেদশ্রুতেঃ" অং ৩ পাং ২ সূ ৪।
"তদভাবে নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেঃ" অ ৩ পাং ২ সূ ৭।
সূচকশ্চ হি শ্রুতি বা চক্ষতে তদ্বিদঃ। অং ৩ পাং ২ সূ ৪।
"গুণসাধারণ্য শ্রুতেশ্চ" অং ৩ পাং ৩ সূ ৬৩।
"বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ" অং ৪ পাং ৩ সূ ৬।

ইত্যাদি সূত্রে ব্যাস উপনিষদ্ না বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন। ব্যাস-গ্রাহ্য শ্রুতি পৌরুষের ইহা কলিকাল ভিন্ন আর শ্রুত হওয়া যায় নাই। এই কালেই যত বিচিকিৎসা। ভগবান কণাদ স্বরচিত দর্শনে "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" একটি সূত্র লিখিয়াছেন। আম্নায় শব্দে সংহিতা অবধি উপনিষদ্ পর্য্যন্ত নিখিলবেদ বোধক। উপনিষদ্ গুলি ব্রাহ্মণ ভাগেরই অন্তভাগ। ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র ভাগ লইয়াই বেদ। অতএব "মন্ত্র ব্রাহ্মণ সমষ্টি বেদঃ। ব্যাস, জৈমিনি, কনাদ, গোতম, বাৎস্যায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, পাতঞ্জলি ও পাণিনি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ নিচয়কে বেদ বলিয়া অভ্যাস করিলেন, শ্রবণ করাইলেন। দয়ানন্দ বলিলেন "ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বেদ নহে বা বেদবৎ প্রামাণ্য নহে। এই নূতন বিচিকিৎসায় আবার আধুনিক অনেকধীমান মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ শ্রুতি নহে, পরং পৌরুষেয়। তাহারই ফলে সম্প্রতি একটী ঘোষণা প্রচারিত হইল যে বেদে সগুণ উপাসনা বোধক শ্রুতি প্রদর্শন করিতে পারিবে সেপুরুষকৃত হইবে, এই ঘোষণায় আপাততঃ বুঝাযাইতেছে বেদে সগুণারাধনা নাই। ইহা কি বেদ অভ্যাসের ফল। না অনভ্যাসের ফল? বেদ বিজ্ঞান থাকিলে কদাপি এরূপ ঘোষণা ঘোষিত হইত না। ইহা কপট ভিক্ষুর বিচিকিৎসাময় উপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মনু বলিলেন "শ্রুতিস্তুবেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্ম শাস্ত্রং তুবৈস্মৃতিঃ"।

দ্বিজাতির কর্ত্তব্য চত্বারিংশৎ সংস্কার মধ্যে বেদ ব্রত গ্রহণ একটী প্রধান সংস্কার। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন বেদের মন্ত্রভাগ অভ্যাস করিতে হইবে তেমন উপনিষদ্ ব্রতও গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমং স্যাৎ মহানাম্নী দ্বিতীয়ঞ্চ মহাব্রতম্।
তৃতীয়ং স্যাৎ উপনিষদ্ গোদানঞ্চ ততঃ পরম্।

অশ্বলায়ন গৃহ্যকারিক।

"বিপ্রস্য জন্মতেস্ত্রয়োদশবর্ষে মহানাম্নী ব্রতম্,
চতুর্দশে মহাব্রতম্ পঞ্চদশে উপনিষদ্ব্রতম্" ইত্যাদি।

দশ লক্ষণকং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সন্ন্যসেদনৃণোদ্বিজঃ॥
মনু ৬ অং ৯৪ শ্লোক।

এ স্থলে বেদান্ত উপনিষৎ; কেবল ঈশোপনিষৎ নহে, তাহা হইলে পূর্ব্ব কথিত শ্লোকে বিবিধ পদ থাকিত না। কিন্তু সর্ব্ব ঋষি সেবিত ও অনুমত উপনিষৎ সকল অধুনা দয়ানন্দের ধর্ম্ম প্রচারে পৌরুষেয়, কেবল ঈশোপনিষদ্ শুক্ল যজুঃ সংহিতান্তর্গত বলিয়া অপৌরুষেয়। ধন্য প্রতিভা! ধন্য সাহস! এই মত আবার অনেকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কলিরোগে অনেকের অন্তরে বিচিকিৎসার বৃদ্ধি হইতেছে। কেহ বলিতেছেন এখন বৈদিক ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন হওয়া দুরূহ ব্যাপার, অতএব কেবল হরিনাম করিলেই চলিবে। আমরা হরি নামের বিপক্ষপাতী নহি কিন্তু বৈদিক ক্রিয়া চলিতে পারে না। ইহা স্বীকার করি না। পরাশরাদি ঋষিগণ কলিকর্ম্মে বৈদিক অনুষ্ঠানের বিধি দিয়াছেন কি জন্য? কাল ও যুগানুসারে আশ্রমোচিত ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করিতে হইবে নচেৎ উদ্ধার নাই।

"দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্য প্রয়োজনং।
উপপত্তি মবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥ যমঃ।

ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা ভাবি অবস্থা জানিয়াও কলিযুগে বেদানুষ্ঠান করিতে শাসন করিয়াছেন। অনেক লোক অদ্যাপিও বৈদিক পথে সংশিত ব্রত। তবে কেন বিচিকিৎসা বলে, বৈদিক ক্রিয়ার প্রতি অনাস্থা প্রবর্ত্তনার্থ এরূপ অসঙ্গত উক্তি।

আর একদল লোকের বিচিকিৎসা আরও চমৎকার। ইহারা ক্ষণে ধর্ম্মালাপ শ্রবণে লোলুপ, ক্ষণে চক্ষুঃ নিমীলিত দলে নিদ্রিত, আবার খৃষ্টানদের "এমেন" শুনিতেও প্রয়াসী। ফল কথা ইহাদের পুরুষকার কিছুই নাই, যখন যে আসে তখনই তাহার অনুগত হইয়া বচনামৃত পানে বিভোর হয়। আবার ইহাদের মধ্যে যাহারা দুই একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে সমর্থ, তাহারা মহিম্নস্তোত্রের একাংশ আবৃত্তি করিয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ব্রাহ্ম, নাস্তিক প্রভৃতি সকলকেই এক পথের পান্থ করিতে চাহেন, কেবল

পথের বিভিন্নতা মাত্র বলিয়া কৃতার্থ হন। মহিম্নঃস্তোত্রের সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যথেচ্ছ মীমাংসা কি বিচিকিৎসা নহে?

"ত্রয়ীসাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য কি, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক প্রভৃতির একপথ? কলি মাহাত্ম্যে বিচিকিৎসার বৃদ্ধি হইয়া ভ্রান্তি অজ্ঞান ও নাস্তিক্য প্রভৃতির বৃদ্ধি হইবে।

দেশ উৎসন্ন হওয়ার নিদান পাপাচারও বিচিকিৎসাই পূর্ব্বরূপ। ভারতে পাপাচার ও বিচিকিৎসা বড়ই প্রবল হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ বেদাচার পরিভ্রষ্ট হইয়া বেদবিরুদ্ধ কার্য্যে অনুরক্ত। আর উদাত্তাদি স্বর সংযোগ বেদবাণী শ্রুত হইতেছে না। যাগ যজ্ঞ কেবল উদর-পূরণ। ক্ষত্রিয়গণ বাহুবল শূন্য হইয়া ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণে দিনাতিপাত করিতেছে। বৈশ্যগণ পশু পালন ও পণ্যব্যবসায় পরিহার করিয়া বিলাস লোল হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রগণ উচ্ছৃঙ্খল। ভগবান রৌরবাদি পূর্ণ করিবার জন্যই যেন কৃত সঙ্কল্প হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার প্রতিবিধান করিতেছেন না। আহা! যে দেশের বানরগণ পর্য্যন্ত সংস্কৃত বাণী বলিতে সমর্থ হইত, আজ সে দেশের ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত সংস্কৃত বিস্মৃত হইতেছেন, যে দেশে সৌরভময় সুমনসে দেব চরণে শোভা পরিবর্দ্ধন করিত, আজ তাহা বিলাস চত্বরে সজ্জিত হইয়া প্রমোদ-সাধন করিতেছে। ধর্ম্মমৌখিক ও বিশেষণ-বিশিষ্ট হইতেছে। যাহা সনাতন ধর্ম্ম তাহা উপেক্ষিত, যাহা বিলাস সাধক ও স্বেচ্ছ সাধনানুকূল তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া ব্যপদিষ্ট হইতেছে।

রোগ নাশক ভাস্কর এখন ময়ূখমালা বিস্তার করিয়া যেন আয়ু হরণ করিতেছেন। পবনের শৈত্য গন্ধ্যাদিগুণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কেবল রৌদ্রভাব। গঙ্গা তরঙ্গ-রঙ্গে পারাবারে গমন করিতেছে, কিন্তু জ্ঞান-গঙ্গাস্রোতঃ নির্ব্বেগ। প্রস্রবণে জল স্রাব ঘটিতেছে কিন্তু ভক্তি প্রস্রবণ শুষ্ক। শশলাঞ্ছন বিমল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে কিন্তু মানবগণ ক্রমশঃ মোহ-বিলীন হইতেছে।

মানুষ যখন বিপন্ন হয় তখন প্রাচীনের পরামর্শ গ্রহণ করে, এখন সে পরামর্শ দেয় পরে, অর্ব্বাচিনে, লোকে শুনিতেও চায় পরের মুখে। আত্ম জনকে পর ভাবিয়া, পরকে যে আত্মভাবে দেখে সে অবশ্যই অল্লায়ু রোগগ্রস্ত। তাহারই ফলে পরম সুহৃৎ বেদ ও আচার্য্যবাক্যে অনাস্থা জন্মিয়া অশেষ বিচিকিৎসা প্রচয় হইতেছে। যাহাতে বিচিকিৎসা বিদূরিত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। নিঃসন্দেহে বেদ বিধি পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম তাহার বিরুদ্ধ কর্ম্মই অধর্ম্ম। বেদে বিচিকিৎসা হইলে অধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে।

জাতিয় বিদ্যালয়।

বিগত বর্ষে বৈশাখ মাসের বেদব্যাসে "একটি প্রস্তাব" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা বোধ করি পাঠকগণ অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। সেই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই বৎসরাধিক কাল আমরা বহু পরিশ্রম করিতেছিলাম। ভগবানের নিকট যাহা ঐকান্তিক ভাবে প্রার্থনা করা যায়, কল্পতরু হরি প্রার্থীর সেই প্রার্থনাই পূরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদেরও প্রার্থনা বৃথা যায় নাই। বিগত ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার উক্ত প্রবন্ধের প্রস্তাবত্রয় মধ্যে একটী প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

"এদেশে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সে শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণ বিজাতীয়, হিন্দু সন্তানের মতি গতি, রীতি নীতি, চিন্তাগতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাহাতে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়া বিষময় বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে। কালে হিন্দুসমাজের ধ্বংস হইয়া যে হিন্দুজাতির বিলোপ-সাধন হইবে, তাহারই উপক্রম হইয়া আসিয়াছে। অতএব সময় থাকিতে, এ প্রথার পরিবর্ত্তন না করিলে মঙ্গল নাই।

প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিবার একমাত্র উপায়—অর্থকরী রাজভাষা ইংরাজীবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় শাস্ত্র,

জাতীয় বিদ্যার অধ্যায়ন প্রথার প্রবর্ত্তন। ইংরাজ আমাদের রাজা, ইংরাজী বিদ্যা অর্থকরী-বিদ্যা, নানা কারণে সে বিদ্যা প্রাণপণে আমাদের শিখিতেই হইবে। ইংরাজী-শিক্ষা আমাদের একটি প্রধান লক্ষ্য থাকা আবশ্যক কিন্তু উহাই একমাত্র লক্ষ্য থাকিলে চলিবে না। ইংরাজীর সব শিখিব, ভাল মন্দ সব গ্রহণ করিব, আর স্বজাতির সব বিসর্জ্জন করিব, ইহা বড় বিষম রীতি। অথচ আজ এই শতাব্দী ধরিয়া এই রীতির অনুবর্ত্তন করিয়া আমরা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস,—আর আজকাল অনেকেই একথা অল্পে অল্পে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, হিন্দুর জ্ঞান, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর বিদ্যা, হিন্দুর বিজ্ঞান এ সকলের শিক্ষা ভিন্ন, হিন্দুসন্তানকে কখনই সুশিক্ষিত বলা যায় না। সে সুশিক্ষা না হইলে, সে শিক্ষা না থাকিলে, হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া চেনা যায় না। হিন্দুর হিন্দুত্ব না থাকিলে হিন্দুজাতির বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আজিকার দিনে, অধিক করিয়া আর একথা বুঝাইতে হইবে না। হিন্দুসন্তানকে ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে আর্যধর্ম্ম ও আর্য্যনীতির শিক্ষা দেওয়া একান্ত বিধেয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন না। ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগকে উদাসীন থাকিতেই হইবে। কাহারও ধর্ম্মে আঘাত, বা কাহারও ধর্ম্মের সহায়তা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। মহারাণীর ঘোষণা বাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করিবেন না। সুতরাং হিন্দুসন্তানের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার ভার হিন্দুর স্বহস্তে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই, না করিলে আমাদিগকে অনিষ্টভাগী, অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে। অনিষ্টের বিষয় আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। কোনরূপ ধর্ম্ম শিক্ষার অভাবে হিন্দুবালকেরা অনেকে নাস্তিক, অনেকে অধার্ম্মিক, অনেকে পরধর্ম্ম উপধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িতেছে, আর সমগ্র হিন্দুসমাজ ক্রমে ক্রমে অন্তরে বাহিরে ধ্বংস পথের অগ্রসর হইতেছে।

এ অনিষ্ট নিবারণের উদ্দেশে আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমরা একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা প্রদানার্থ বালকেরা যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, এবং সেই সঙ্গে জাতীয় বিদ্যা, জাতীয় ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা থাকিবে। যাঁহারা ইংরাজীতে সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত, অথচ হিন্দুধর্ম্মে হিন্দুশাস্ত্রে প্রগাঢ়

ভক্তিমান ও জ্ঞানবান, এমন সকল ব্যক্তির দ্বারা শিক্ষকতা কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকও অনেকটা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জাতীয়তা শিক্ষার ব্যাঘাত না হইয়া যাহাতে তাহার সহায়তা করে বাছিয়া বাছিয়া এমন সকল পুস্তক সঙ্কলন পূর্ব্বক পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। রত্নভাণ্ডার সংস্কৃত সাহিত্য হইতে, এবং ইংরাজী বাঙ্গালা যেখানে যেখানে উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে, তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। শিক্ষাবিভাগের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় এইরূপ কএকখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন. তদনুসারে অনেক কৃতবিদ্য হিন্দুসন্তান এবং সারদা বাবু ও আমাদের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ৪ঠা জুন ২৩ শে জ্যৈষ্ঠ শুভ দিন। ঐ দিনে আমাদের প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা পটলডাঙ্গা বেনিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের শিরোস্থানীয় অনেকেই আমাদের নবব্রতের সহায় হইয়াছেন। আপাততঃ নিম্নলিখিত কতিপয় কৃতবিদ্য মহোদয়ের নামোল্লেখ করা যাইতেছে, তাঁহারা প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্য্যপরিচালনে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার
,, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,, রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী
,, মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	,, সারদা চরণ মিত্র
,, চন্দ্র নাথ বসু	,, ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, নরেন্দ্র নাথ সেন	,, যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
,, শিশির কুমার ঘোষ	,, নীলকণ্ঠ মজুমদার
,, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, চন্দ্র শেখর বসু

নিম্নলিখিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ আপাততঃ স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন—

১। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তী, হেয়ারস্কুলের (ভূতপূর্ব্ব) সহঃ প্রধান শিক্ষক, (পরিদর্শক)

২। ,, রামদয়াল মজুমদার, এম, এ, মেদিনীপুর টাউন স্কুলের (ভূতপূর্ব্ব) প্রধান শিক্ষক ও ঢাকা কলেজের অধ্যাপক

৩। শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস মল্লিক এম্, এ,

৪। „ শ্যামাকান্ত চৌধুরী বি, এ,

৫। „ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, বি, এ. ভাগল্‌পুর মিশন স্কুলের (ভুতপূর্ব্ব) প্রধান শিক্ষক।

৬। „ শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, বি, এ,

৭। „ সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ,

৮। „ স্বরেন্দ্রনাথ রায়,

৯। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

১০। „ তুরীয়ানন্দ বন্দ্যোপাধায়, রাচি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের (ভুতপূর্ব্ব) শিক্ষক।

১১। „ পণ্ডিত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

১২। „ পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন,

১৩। „ পণ্ডিত রামমূর্ত্তি কাব্যালঙ্কার,

বর্ত্তমান সমাজের যাঁহারা শিরোভূষণ এবং বিশেষরূপ সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ, তাঁহারাই আমাদের পরিচালক। শিক্ষকগণও শিক্ষকতা কার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে আশা করিতে পারি যে বালকেরা এখানে অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্কুলের অপেক্ষা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন অংশে ম্লান হইবে না। অধিকাংশ স্কুলেই ছাত্রাধিক্য বশতঃ শিক্ষকেরা সকল ছাত্রের উপর সমান দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, এইজন্য অনেক ছাত্রকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই অসুবিধা নিরাকরনের জন্য আমরা স্বতন্ত্র শিক্ষকের বন্দবস্ত রাখিব। তাঁহারা সর্ব্বদা কেবল ছাত্র-দিগের পাঠের উন্নতির তত্ত্বাবধান করিবেন।

ইহা ভিন্ন, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, সময়ে সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ ও শাস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিবেন।

স্কুলের বেতন প্রথম তিন শ্রেণীর মাসিক ৩৲ টাকা, ৪র্থ. ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মাসিক ২৲ টাকা এবং অবশিষ্ট শ্রেণীর জন্য মাসিক ১৲ টাকা ধার্য্য হইল। স্কুলে প্রথম ভর্ত্তি হইতে হইলে, প্রথম তিন শ্রেণীতে ৩৲ টাকা ও অবশিষ্ট শ্রেণীতে ২৲ টাকা য়্যাড্‌মিশন ফি দিতে হইবে।

আবশ্যক হইলে, বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসও স্থাপন করা যাইবে

হিন্দুসন্তানেরা যাহাতে জাতিধর্ম্মানুসারে, স্বধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকিতে পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে।

এখন ভগবানের কৃপায় আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইলেই চরিতার্থ হইব। আমরা, ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র চেষ্টায়, মহাব্রতে হস্তক্ষেপ করিলাম। ভরসা আছে, হিন্দুসমাজের যাঁহারা শিরোভূষণ যাঁহারা জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, পুণ্যবান, পুণ্য প্রয়াসী, এবং যাঁহারা হিতৈষী, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য সাহায্য ও উৎসাহদানে, স্বজাতির ও স্বদেশের এই মঙ্গল সাধনে আমাদিগকে সমুৎসাহিত করিবেন।"

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক।

প্রথমে উপরি উক্ত মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। তৎপর মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, মহাশয় সেক্রেটারী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া যথা বিধানে কার্য্য চালাইতেছেন।

এখন হিন্দুমাত্রেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে প্রথম বৎসরেই প্রায় তিনশত ছাত্র ভর্ত্তি হইয়া রীতিমত অধ্যয়ন করিতেছেন। ভগবান করুন হিন্দুর সুমতি হউক এবং হিন্দুগণ নিজ সন্তানগণকে জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া অধঃপতনোন্মুখী সমাজকে রক্ষা করুন।

সাধুদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ফুলটি নষ্ট হইয়াছে কিন্তু উহা যে অপূর্ব্ব সৌরভ ছড়াইয়া গিয়াছে তাহা কখন নষ্ট হইবার নহে। উহা ত্যাগীর নিকট, সাধকের নিকট, ধার্ম্মিকের নিকট চিরকাল অমর থাকিবে। কিন্তু বিষয়ী সংসারাসক্ত মানব উহা অনৃত ও অগ্রাহ্য বোধে অবলীলাক্রমে দূরে নিক্ষেপ করিবে। সাংসারীর দৃষ্টি কেবল আপনার বিলাস ও ভোগ বাসনা লইয়া, কি উপায়ে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া আরাম লাভ করিবে তাহাই

চিন্তা করিতে থাকে। তাহার পক্ষে এরূপ নির্জ্জন প্রান্তরস্থ উদ্যানের পুষ্পচয়ন বড়ই বিড়ম্বনাময়। সুতরাং, সাধুজনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য লাভে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন?

কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

নিঃস্বভাবভবভাবনয়াস্তে সর্ব্বভৌমভবনং বনবাসঃ।
বালিশোহি বিষয়েন্দ্রিয়চৌরৈর্ম্মুষ্যতে স্বভবনেচ বনেচ॥

সতত সাংসারিক বিষয়ে চিন্তাশীলতাকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তাঁহার পক্ষে চক্রবর্ত্তী মহারাজের ভবনে বাস ও বনবাস তুল্য। কিন্তু যাহারা মোহে আচ্ছন্ন, তাহারা বিষয় ও ইন্দ্রিয় রূপ কর্ত্তৃক কি ভবন কি বন সর্ব্বত্রই সমান প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে।

১৮০৩ শক ৭ই অগ্রহায়ণে আমার জীবন গতির একটি যুগান্তর সংঘটিত হয়। এতদিন যাবৎ দুস্তর বিষয় সমুদ্রে ভাসিতেছিলাম, হঠাৎ যেন কোন এক অচিন্তনীয়পূর্ব্ব ঘটনাবর্ত্তে বাসনা তরি অকস্মাৎ ডুবিয়া গেল। তরি ডুবিল কিন্তু আমি ডুবিলাম না। কোথা হইতে কে যেন আসিয়া আমার অজ্ঞাতে আমায় তীর দেখাইয়া দিল। আমি অতি সন্তর্পনে ধীরে ধীরে তত্তীরাশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ইহা কল্পনা নহে, সত্য ঘটনা।

এই শুভক্ষণে পুণ্যধাম কাশী যাত্রা করিলাম। আকাঙ্ক্ষা পিপাসা মিটাইতে শান্তিবারি পান করিব। হৃদয় বিচিকিৎসায় পরিপূর্ণ, কেহ প্রত্যক্ষও অতলস্পর্শী শান্তি-বারি পূর্ণ-কুণ্ড দেখাইয়া দিলেও চিত্ত তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না, পানে প্রবৃত্তি জন্মে না। কাশী পৌঁছিয়াও সে ভীষণ বিচিকিৎসার নিবৃত্তি হইল না। সন্দেহ দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। দৈব বলে শান্তির আলয় পাইয়াও নিন্দিত সংস্কার প্রাচুর্য্যে তাহা ভোগ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যবলে সত্ত্বগুণ প্রধান, আনুষ্ঠানিক ও সাধুহৃদয় জনক লাভ করিয়াছিলাম ঈশ্বরপ্রতিম ঋষিগণের সমাধিক্ষেত্র কাশীধামে বসিয়া ক্রিয়াশীল ও সফলকাম পিতার বহুবিধ উপদেশ বারিতেও এ শুষ্কহৃদয় কমলতা প্রাপ্ত হইল না দিনের পর দিন যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল আমার হৃদয়ে যেন একটা অভাবরূপবহ্নি ক্রমে ক্রমে প্রধূমিত হইয়া সমুদয় স্থূল দেহ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সর্ব্বদাই হৃদয়ে অভাব বোধ—অশান্তিময়।

পিতা আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল ব্যাপিয়া আমার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন। এবং সাধুগণকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহাদের করুণা জাচ্ঞা করিতে উপদেশ দিলেন। অকস্মাৎ পিতার এই উপদেশটি আমার হৃদয়ে বড়ই সুন্দররূপে অঙ্কিত হইল। কার্য্যেও তাহার ফল বিকসিত হইল। প্রচণ্ড আতপতাপে পরিতাপিত প্রান্তরে হটাৎ অল্পে অল্পে গম্ভিরমূর্ত্তি জলধরের অভ্যুদয়ে ঘর্ম্মাক্তকলেবর কৃষকের প্রাণে যেমন মনোরম শীতলতা অনুভূত হয়, আমার হৃদয়ে আমার অজ্ঞাতসারে যেন তদ্রূপ আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। কারণ কিছুই বুঝিলাম না। তখন শ্রীশিহ্লন্ মিশ্রের মত,—

" নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি। ",

বলিয়া প্রারব্ধ ভোগাবসান কালের প্রতিক্ষা করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে একদিবস আহারান্তে বসিয়া আছি,—সময় প্রায় প্রহরত্রয় অতীত হইয়াছে। গৃহদ্বারে "নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ" এই শব্দ ক্রমে ক্রমে এবং ধীরে ধীরে তিনবার উচ্চারিত হইল। পিতা তখন আহারান্তে তন্দ্রাযুক্ত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তঠাৎ তন্দ্রোত্থিত হইয়া সশব্যস্তে বহির্দ্বারদেশে যাইয়া ক্ষণপরেই জনৈক গৈরিক বসনধারী দণ্ডীকে অতীব ভক্তিভাবে ও সসম্ভ্রমে লইয়া আসিলেন। কাশীতে দণ্ডীর অভাব নাই। আমি এই অল্পদিন মধ্যে বোধহয় সহস্র দণ্ডী দর্শন করিয়াছি। কোন দণ্ডী পুলিষ কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইতেছে, কেহবা কোন গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করিতে যাইয়া গৃহস্থের অসাবধানতার অবকাশ পাইয়া দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলাইতেছে, গৃহস্থও জানিতে পারিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে, কোথায়ও বা দণ্ডীভোজনে ভীষণমূর্ত্তি দণ্ডধারীগণ, ভক্তের হৃদয় ব্যথিত করিয়া, পংক্তিভোজনে কে অগ্রে গণ্ডুষগ্রহণ করিবে এই প্রশ্ন লইয়া মহা বিবাদ বাধাইয়াছে, অবশেষে হস্তাহস্তি ও রক্তারক্তি করিতেছে। এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমার দণ্ডীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি একবারেই বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু পিতার ইঁহার উপর অগাধ ভক্তি দেখিয়া আমার হৃদয় কথঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইল। পিতা আমার গুণগ্রাহী, তাঁহার নিকট ভণ্ড কদাচিৎ আশ্রয় পাইয়া থাকে। তাহার উপর স্বামীজীর আকৃতি আমায় আরও অধিক মুগ্ধ করিল। এরূপ সৌম্য

এবং প্রশান্ত মূর্ত্তি পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই। সে স্থির অথচ স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক নেত্রদ্বয়, সে বিশাল ললাট, সে হাসিমাখা অধর এখনও যেন আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত রহিয়াছে। উজ্জ্বল কাঞ্চনাভ গৌরাঙ্গ হইতে কি যেন একরূপ অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। আপাদ মস্তক যেন কেবল আনন্দেরই বিকাশ। দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে ইঁহার বাহক্রিয়া সমস্তই অন্তর্ম্মুখীন হইয়াছে। হৃদয় যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল তিনি যেন এজগতের লোক নহেন। সুতরাং আমার বিচিকিৎসা বৃত্তি কতক পরিমাণে প্রশমিত হইল। আমিও সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। দণ্ডীস্বামী অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার প্রতি অনিমিষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আমার সহোদরা জল আনিয়া পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অতঃপর দণ্ডীস্বামী আস্তে আস্তে সন্নিকটস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু সমস্তক্ষণই তাঁহার দৃষ্টি আমার প্রতিই রহিয়াছে। বোধ হইল যেন তিনি আমার অভ্যন্তরিন্ অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অনন্তর পিতা আমাকে দেখাইয়া বলিলেন " ইনিই আমার কণিষ্ঠ পুত্র।"

দণ্ডী। আনন্দম্।

পিতা। সাধু সঙ্গ লাভে ও প্রকৃত সাধু-উপদেশ শ্রবণে ইঁহার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে। কিন্তু চিত্ত সর্ব্বদাই সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত। অল্পে কিছুতেই বিশ্বাস স্থির হয় না। সুতরাং আমার কএকদিন হইতেই ইচ্ছা হইয়াছে আপনার সকাসে ইঁহাকে প্রেরণ করিব। ভগবানের মহিমা কে বুঝিবে! আপনি স্বয়ংই অদ্য আসিয়া উপস্থিত। উহারই অদৃষ্ট প্রসন্ন বলিতে হইবে।

দণ্ডি। বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সমস্ত সন্দেহই নষ্ট হইবে। স্থান মাহাত্ম্যে আপনি চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবদ্বাক্য অল্পেই হৃদয়ে স্থান পাইবে। অতএব আপনার কোন চিন্তার কারণ নাই। যাহ'তে উনি প্রত্যহ একবার প্রত্যুষে ও একবার সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণা মাইকে দর্শন করেন সেইরূপ বন্দবস্ত করিবেন। এবং বৈকালে নারায়ণের কুটিরে পাঠাইয়া দিবেন। নারায়ণের কৃপায় অন্তকরণ বৃত্তি সমূহ পরিশুদ্ধ হইলে হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইবে।"

এই বলিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন " বাবাজী কি বল " ?

আমি। আপনাদের কৃপা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

দণ্ডি। তুমি কুটিরে যাবেত?

আমি। আমার সৌভাগ্য যে আপনার পবিত্র আশ্রম স্পর্শ করিয়া নিজ অপবিত্র দেহ পবিত্র করিব।

আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে আমার ভগ্নি ভিক্ষা প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে বলিয়া বিলম্ব না করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিয়া গণ্ডূষ গ্রহণ করণান্তর যেমন অন্নগ্রহণ করিবেন, অমনি চকিত হইয়া উঠিলেন এবং আস্তে আস্তে "নারায়ণ" এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া আমার ভগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, মা! অদ্য ভিক্ষা হইল না।

ভগ্নি। (সশব্যস্তে) কেন?

দণ্ডি। নিবেদিত দ্রব্য নারায়ণকে দিয়াছ?

তিনি শ্রবণ মাত্র জিহ্বা কর্তন করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। দণ্ডিস্বামী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন; মা! কাঁদিতেছ কেন? আমাদের প্রায়ই এরূপ অনশন ঘটিয়া থাকে। তাহাতে আমাদের কোন কষ্ট নাই। তবে শাস্ত্রে বিধি আছে তাহাই একবার করিয়া তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকি।

আমিত স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে প্রদত্ত অন্ন সহ একটি নিবেদিত মিষ্টান্ন ভুলক্রমে দেওয়া হইয়াছিল। দণ্ডিদিগকে নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণে বিশেষ নিষেধ আছে। তাহাই তিনি প্রাপ্ত অন্ন পরিত্যাগ করিলেন। ঘটনা শ্রবণে আমাকে আরও আশ্চর্য্যান্বিত করিল। মনে গভীর প্রশ্ন উঠিল কি উপায়ে উনি জানিলেন যে এত দ্রব্যের মধ্যে কেবল ঐ একটি মাত্র নিবেদিত দ্রব্য?

ক্রমশঃ।

শিবাষ্টকং।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ গরলাভরণং।
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয় দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥১॥
গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং, তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুং।
বিধিবিষ্ণুশিরস্তব পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥২॥
শশলাঞ্ছিতরঞ্জিত সন্মুকুটং, কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটং।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৩॥
নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং, মুখপদ্মবিরাজিতকোটিবিধুং।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৪॥
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণধরং।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৫॥
মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গহরং, করিচর্ম্মগনাশবিবোধকরং।
বরদাভয় শূলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৬॥
জগদুদ্ভবপালননাশকরং, করুণৈব পুনস্ত্রয়রূপধরং।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৭॥
ন দেয়ং পুষ্পং সদা পাপচিত্তঃ, পুনর্জ্জন্মদুখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমিদ্ধহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং ॥৮॥

৩য় ভাগ। সন ১২৯২ সাল। ৯ম খণ্ড।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

শ্রুতি ও দর্শন দ্বারা দুইটী মাত্র পদার্থ, বা বস্তু প্রমাণীকৃত হইয়াছে। স্থাবর ও জঙ্গমভেদে নিখিল প্রকার প্রাণী, ক্ষিতি আদিভূত সকল, এবং তদপেক্ষায় ও সূক্ষ্ম যাহা কিছু দৃষ্ট, ঘ্রাত, আস্বাদিত, স্পৃষ্ট, অনুমিত, চিন্তিত ও শ্রুত হইয়া থাকে, সে সমস্তই দুইটি মাত্র পদার্থ বা বস্তু। সেই পদার্থদ্বয়ের একটির নাম "ক্রিয়া" বা "প্রকৃতি" বা "শক্তি" বা "মায়া" বা "প্রধান" ইত্যাদি। উক্তশক্তি বা ক্রিয়াকে অতি সূক্ষ্ম বিভাগ দ্বারা, শ্রুতি ও দর্শন সকল, তিন প্রকার মাত্র নিশ্চয় করিয়া তিনটিনাম রাখিয়াছেন;—রজঃ, তমঃ, ও সত্ত্ব। এই তিনটি নাম যোগার্থ যুক্ত। ঐ অর্থ প্রতিশব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে, ১ম আকর্ষণ, ২য় অপসারণ, ৩য় সংযমন (যাহাদ্বারা আকর্ষণ ও অপসারণ সংযত হইয়া থাকে তাহাকে সংযমন শক্তি বলে) বলা যাইতে পারে। ফলতঃ এই প্রতিশব্দ দ্বারা শক্তিত্রয়ের ভেদমাত্র [illegible]

পাদিত হইতে পারে। ইহাদ্বারা শক্তির স্বরূপ প্রতিপাদিত হওয়া দুঃসাধ্য বা অসম্ভব বলিলেও বাধা নাই; যে হেতু ঐ তিনটি শব্দের ব্যবহার বিষয়ে বোধ হয় অধিক সংখ্যক লোকের ভ্রান্তি আছে। তবে যদি কেহ ঐ শক্তি-ত্রয়ের অনুভব এরূপ ভাবে করিতে পারে যে, তুমি, বহির্দ্দেশস্থ রূপাদি কোন একটি ক্রিয়া অভ্যন্তরিত করিতে অধ্যবসায়ী হইলে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধি হইতে স্নায়ু পথ দ্বারা যে ক্রিয়াটি চক্ষুরাদি স্থানে আইসে, সেই ক্রিয়ার অনুভব কর, উহাই আকর্ষণ বা রজঃক্রিয়া; কোন বস্তু উৎক্ষেপাদি করিতে অধ্যবসায়ী হইলে, উক্ত প্রকারে করাগ্রাদিতে যে ক্রিয়া আইসে, তাহার যে অনুভব কর, উহাই অপসারণ বা তমঃ ক্রিয়া। এবং যখন তোমার ঐ উভয় ক্রিয়াতেই ঔদাসীন্য হয় তাহার অনুভব, সেই সংযমন বা সত্ব ক্রিয়া।

এই শক্তিত্রয়ের কোন প্রকারে উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। উহারা নিত্য অজর, ও অমরভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাদিগের কারণ আর কেহই নাই; উহারা অনন্তাধার, আধারের অপেক্ষা করে না। উহাদিগের প্রত্যে-কেরই কোনপ্রকার পরিচ্ছেদ বা ইয়ত্তা নাই; উহা অপরিসীম ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারা তিনটিই পরস্পর সম্মিলিত, এমন কি উহাদিগের অনির্ব্বচনীয় দৃঢ় মিলন প্রভাবে, একীভাবাপন্ন থাকে। হয়ত মনে করিতে পারেন যে, "যখন তিনটি শক্তি বলা হইয়াছে, তখন অবশ্যই উহাদের পরি-চ্ছেদ বা সীমাও স্বীকৃত হইয়াছে। দুইবস্তু একস্থানে থাকিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সুতরাং শক্তিত্রয়ের প্রত্যেকটিই যদি অপরিচ্ছিন্ন বা পরিব্যাপ্ত থাকিল, তখন একটি সত্তে আর একটির স্থান কোথায়? অতএব হয়, শক্তি-ত্রয়ের সীমা স্বীকার করিতে হইবে, না হয়, শক্তির ত্রৈবিধ্য পরিহার করিয়া একতাই অঙ্গীকার করিতে হইবে।" এই আপত্তি ভ্রান্তিমূলক সন্দেহ নাই। কারণ "দুইবস্তু একস্থানে থাকে না" এই সিদ্ধান্তটির তাৎপর্য্য অন্য বিষয়ক, উহা এস্থলকে লক্ষ্য করিতে পারে না। রূপ, রস, গন্ধ এই পৃথক্ জাতীয় পাঁচটিও এক স্থানে থাকিতেছে, যথা;—লবণ, অম্ল ইত্যাদি। এবং পৃথি-ব্যাদি সম্বন্ধীয় আকর্ষণ ও অপসারণাদি একদা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং, শক্তিত্রয়ের মধ্যে একশক্তির বিদ্যমানতা অপর শক্তি বিদ্যমানতার প্রতিবন্ধক হয় না। তিন শক্তিই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এক শক্তি দ্বারা অপর শক্তির সীমা বা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। শক্তিত্রয়ই সর্ব্বব্যাপক ও অপরিচ্ছিন্ন।

উক্ত শক্তিত্রয়ের বিবিধপ্রকার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধের তারতম্যে শক্তিত্রয়ের কাহারও দুর্ব্বলতা, কাহারও সবলতা, কাহারও বা সমবলতা ইত্যাদি অনন্তবিধ ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এই ইতর বিশেষ দ্বারা শক্তিত্রয় বা ক্রিয়াত্রয় অনন্ত প্রকারে বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে, যথা,—রূপক্রিয়া রসক্রিয়া, গন্ধক্রিয়া, স্পর্শক্রিয়া ও শব্দক্রিয়া ইত্যাদি, এবং মনঃক্রিয়া, অভিমানক্রিয়া ও বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বক্রিয়া ইত্যাদি। রূপাদিক্রিয়া যে, শক্তিত্রয়ের অতিরিক্ত নহে, তাহার প্রমাণ অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। তুমি যখন বাহিক রূপ ও রসাদি ক্রিয়াকে অন্তর্নিহিত করিতে অধ্যবসায়ী হও, তখন পূর্ব্বোক্ত মতে চক্ষু আদি পর্য্যন্ত একটি আকর্ষণ ক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়া থাকে। তৎকালীন চক্ষু আদি সংসৃষ্ট বাহিক রূপাদি ক্রিয়া উক্ত আকর্ষণের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিতে সমবেত হয়। এই একতা না হইলে তোমার কোন ক্রিয়ার উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা থাকিত না ; এই একতা নিবন্ধনই তুমি বাহিক ক্রিয়া সকল অনুভব করিতেছ, এবং বাহ্য ক্রিয়ার অভাব কালেও চিন্তা, স্মরণ বা স্বপ্ন রূপে ঠিক সেই ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতেছ। এক্ষণে মনে করিয়া দেখ যে, রূপাদি ক্রিয়া যখন তোমার শরীরীয় আকর্ষণের সহিত একতা প্রাপ্ত, বা এক হইল, তখন আর ঐ রূপাদি ক্রিয়া, আকর্ষণ ক্রিয়ার অতিরিক্ত বা ভিন্ন নহে। ভিন্ন হইলে কখনই এক হইতেই পারে না। এইরূপ অপসারণ ও সংযমনের সহিত ও রূপাদি ক্রিয়ার একতা জানিবে। অতএব ইহা নিশ্চয় যে ত্রিশক্তি ভিন্ন চতুর্থ শক্তি নাই। ত্রিশক্তিই পরস্পর সম্বন্ধের তারতম্যে নানাপ্রকারে আভাসমান হইতেছে।

এই প্রকারে যাবৎ পদার্থই ক্রিয়াত্মক, ক্রিয়া ভিন্ন কিছুই নহে। পাঠক কি মনে করিবেন যে, পৃথিব্যাদি বস্তুসকল কেবল ক্রিয়া নহে ? তাহা হইলে আমিও জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, আপনি কোন প্রমাণ দ্বারা পৃথিব্যাদিকে ক্রিয়ার অতিরিক্ত স্থির করিতেছেন ? জড়পদার্থ নির্ণয়ের নিমিত্ত দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, আভ্যন্তরিক-প্রত্যক্ষ ও যথার্থ অনুমান এই সমস্তই প্রমান হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কোনটিইত ক্রিয়া ভিন্ন বস্তুর প্রমাণ হইবে না! আমরা যে দীর্ঘ, হ্রস্ব ও নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র দেখিতে পাই, ইহা রূপ ভিন্ন কিছুই নহে। চক্ষু দ্বারা কেবল রূপেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। রূপ ক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত নহে। রূপ বহির্দেশ হইতে আমাদিগের চক্ষু প্রণালিকা দ্বারা অন্তর্গত করিয়া, মস্তিষ্কাদিতে বুদ্ধিতে

আঘাত করতঃ সমবেত হইয়া থাকে, সুতরাং উহা ক্রিয়া বলিতে আর সন্দেহ কি? এই প্রকার রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দও বাহ্যদেশ হইতে জিহ্বা, নাসিকাও শ্রবণ নালিকা দ্বারা অন্তর্গমন করিয়া বুদ্ধিকে আঘাত পূর্ব্বক সমবেত হয়, অতএব উহারাও ক্রিয়া মাত্র। পাঠক কি, এইরূপ, রস. গন্ধ, স্পর্শ, ও শব্দ ভিন্ন আর কিছু অনুভব করিতে পারেন? কখনই না। আমরা গমন করিবার কালীন, পদতলে কিছু (পৃথিবী) ঠেকিল বলিয়া পদদ্বারা অনুভব করি, উহা চরণীয় বিক্ষেপ শক্তির দুর্ব্বলতাকারী আকর্ষণ ক্রিয়া, এবং একটি স্পর্শ ক্রিয়ামাত্র। কর দ্বারা গ্রহণ কালীন, যে গুরুতা লঘুতাদির অনুভব করিয়া ছোট বড় মনে করি, উহাও ন্যূনাধিকতাদি অনুসারে আকর্ষণাদি শক্তির অনুভব করা হইয়া থাকে; শয়নাসনাদি সময়ে, পৃষ্ঠ, বক্ষ, পার্শ্ব ও নিতম্বাদি দ্বারা যাহা অনুভব করিয়া থাকি, তাহাও আকর্ষণাদি ও স্পর্শের অতিরিক্ত নহে। শরীরের মধ্যে যে কিছু অনুভব করি, তাহাও ক্রিয়া মাত্র। এই প্রকারে সমস্ত বিষয়ই যাহা আমরা অনুভব ও অনুমান করিতেছি কেবল ক্রিয়ামাত্র; সুতরাং নিখিল জগৎই শক্ত্যাত্মক তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ করা উচিত নহে। অতএব আমরা, যতপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া থাকি সে সমস্তই শক্তি-ত্রয়-সংসর্গজ-সহস্র-সহস্র বিধ-শক্তির নাম মাত্র। এই কারণেই আর্য্যভাষায় সংস্কৃত ভাষায়, যে সমস্ত নাম ব্যবহার হইয়া থাকে উহারা সকলেই ক্রিয়াবাচক শব্দ (ধাতু) হইতে উৎপন্ন। ক্রিয়া হইতে পৃথক অর্থের প্রতিপাদকত্বে আভাসমান যে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সামান্য সমবায়াদি সংজ্ঞা করা হইয়াছে, উহা কেবল মনুষ্যের ব্যবহার রক্ষার নিমিত্ত, ফলতঃ উহারাও ক্রিয়া প্রতিপাদক শব্দ হইতে (ধাতু হইতে) উৎপন্ন, এবং ক্রিয়ারই প্রতিপাদক। অধিক কি, 'ভাষা বিজ্ঞান' দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, ক্রিয়া ভিন্ন, শব্দের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। যে ভাষারই হউক না কেন, একটি শব্দের উচ্চারণ করিলে, তাহা দ্বারা ক্রিয়াই বুঝাইবে; এবং 'মনোবিজ্ঞানের' অন্তর্গত 'জ্ঞান বিজ্ঞান' দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ক্রিয়া ভিন্ন কিছুই অনুভব হইতে পারে না। বহির্দেশ হইতে মস্তিষ্কস্থ বুদ্ধিতে সমবেত হওয়া পর্য্যন্ত অনুভব হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন অনুভব হইবার উপায়ান্তর নাই। অতএব সর্ব্বপ্রমাণ দ্বারা ইহা নিশ্চিত যে, জগন্মাত্রই ক্রিয়া স্বরূপ। ইহার মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কিছুই নাই সকলই একপ্রকার [illegible] সমস্তই সূক্ষ্ম বলিতে পার, আর হয় সকলই স্থূল বলিতে পার।

স্থলতঃ স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা, বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব নাই। আমাদিগের ব্যবহার রক্ষার নিমিত্ত কেবল ছোট বড়, স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি। প্রকৃতি বিষয়ে এই মাত্রই বলিলাম, ইহা সবিস্তারে বলিতে হইলে প্রকৃত বিষয়ের আর অবকাশ থাকে না।

এক্ষণে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই জগৎকে যদি ঈশ্বরের শরীর বলি. তাহা হইলে কি "জড় জড়" "সৃষ্ট সৃষ্ট" "পুত্তলী পুত্তলী" বলিয়া চমকিত হইয়া উঠিবেন? যদি চমৎকৃত হয়েন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে আমার বর্ণিত বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও সার আপনার হৃদয়স্থ হয় নাই এবং আমারও ঈদৃশ বাগ্‌জাল বিস্তার প্রয়াস নিরর্থক হইল। স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণি সকল, ক্ষিতি ও জল প্রভৃতি ভূত সকল যদি ক্রিয়া বা শক্তিমাত্র বলিয়া উত্তম রূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তবে আর আমাদিগের শরীরের ন্যায় এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকেও ঈশ্বরের শক্তি বা আকার বা তনু বা রূপ বা স্বরূপ বলিলে অশ্রদ্ধা হইবার কারণ কি? "জড়" বলিলেই সাধারণের মনে যেরূপ ভাব হইয়া থাকে, সেরূপ বস্তুত অপ্রসিদ্ধ! পাষাণ, মৃত্তিকা ও তৃণ প্রভৃতি যাহাকে কতকগুলি মাতৃ গর্ভস্থ শিশুর বাক্য দ্বারা মুগ্ধ হইয়া "মোটা মোটা" "ভার ভার" অনুভব করতঃ "জড়" "পুত্তলী" বলিয়া অনেকে নাসিকা কুঞ্চন ও ভ্রূবক্রতা করিয়া থাকেন, সে সমস্তই ত ক্রিয়া বা শক্তি স্বরূপ! আর্য্যেরা এই ক্রিয়া শক্তিকেই "জড়" নামে অভিহিত করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শক্তিত্রয়ের উৎপত্তি বিনাশের কোন কারণ নাই; সুতরাং উহা সর্ব্বদা অজর অমর ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন আর "সৃষ্ট সৃষ্ট" বলিয়া বিস্ময়ের বিষয় কি? জগতে কোন বস্তুই সৃষ্ট বা বিনাশিত হয় না। কেবল মাত্র শক্তিত্রয়ের সম্বন্ধের তারতম্যেই উহারা নানা প্রকারে আভাসমান হইয়া থাকে, এবং তদনুসারে আমরা উৎপন্ন ও বিনষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ কাহারও 'পুত্রবতী বন্ধ্যার' ন্যায় নূতন উৎপত্তি, বা 'গগন কুসুমের' ন্যায় অভাব হয় না। ভুক্ত ও পীত অন্ন পানীয়াদি শোণিত মাংসাদি রূপে পরিণত হয় বলিয়া, অন্নাদিকে অসৎ রূপে বিনষ্ট ও শোণিতাদিকে অসৎরূপে উৎপন্ন বলা যায় না। মনুষ্যাদির শরীর মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইলে সেই স্থান হইতে আবার সেই অন্নাদি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাদ্বারা পাঠকের অগ্রসর হইবার [illegible]

ঈশ্বর বিষয়ে অনুসূচনা মাত্র করিলাম, দ্বিতীয় পদার্থের বর্ণনার পর ইহা বিস্তারিত রূপে বলিব।

দ্বিতীয় পদার্থটির বাস্তবিক কোন নাম নাই; কারণ, শব্দ মাত্রেই এক একটি ক্রিয়া স্বরূপ, এবং এক একটি ক্রিয়ার প্রতিপাদক। যথা;—"ব্রহ্ম" [ব্যাপকতা ক্রিয়া বা তদ্বিশিষ্ট (ক্রিয়া ও ক্রিয়া বিশিষ্টের ইতর বিশেষ নাই।], "আনন্দ" (সন্তোষ, আহ্লাদ বা সুখ স্বরূপ ক্রিয়া), "চৈতন্য" (উপলব্ধি ক্রিয়া), "প্রকাশ" বা "স্বপ্রকাশ" (আপনা হইতেই প্রকাশিত হইবার শক্তি বা ক্রিয়া বা ক্রিয়া বিশিষ্ট) "আত্মা" (সতত বর্ত্তমানতা ক্রিয়া বা তদ্বিশিষ্ট), "ঈশ্বর" (সৃষ্টাদি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা, প্রযত্ন ও চেষ্টাদি ক্রিয়া বা তদ্‌যুক্ত), "প্রাণী" (প্রাণন ক্রিয়া বা তদ্‌বিশিষ্ট), "স্থাবর" (স্থিতি ক্রিয়া বা তদ্বিশিষ্ট) "জঙ্গম" (গমন ক্রিয়া বা তদ্‌যুক্ত) ইত্যাদি। এই প্রকার নিখিল শব্দই ক্রিয়ার বাচক, কারণ ইহারা কণ্ঠ, রসনিকা (আল্‌জিহ্বা) ও বায়ু আদির ক্রিয়া বিশেষ; সুতরাং ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু প্রতিপাদন করাইতে সমর্থ হইবে না। যাঁহার উত্তম রূপে ভাষা বিজ্ঞানে জ্ঞান আছে, তিনি ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব কোন্ নাম দ্বারা সেই পদার্থটি পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইব? যদি বলি যে যাঁহাদ্বারা জগতের প্রকাশক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাই ঐ পদার্থ, ইহাও অসঙ্গত। কারণ, "যাঁহাদ্বারা প্রকাশক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়" এই কথাটির অর্থও "প্রকাশন নিষ্পাদকতা ক্রিয়া"। তবে কি বলিব? সত্তামাত্র বা অস্তিত্ব মাত্র বলি? না; সত্তা বা অস্তিত্ব শব্দের অর্থ বিদ্যমান ক্রিয়া—প্রকৃতি বা ক্রিয়া ভিন্ন যে পদার্থ তাহাই; ইহা বলিলেও সঙ্গত হয় না। "ক্রিয়া ভিন্ন পদার্থ" এই কথাটি কাঁটালের আম সত্ত্বের ন্যায়; ফলতঃ ইহার অর্থের সংগা হয় না! কারণ, "ভিন্ন" বলিলে ভেদ ক্রিয়া বা তদ্‌যুক্ত (অর্থাৎ আর এক প্রকার ক্রিয়া বা তদ্‌যুক্ত) বুঝায়। 'রাম হইতে শ্যাম ভিন্ন', ইহা বলিলে এই বুঝা গেল, যে রামের দর্শনাদি ক্রিয়া এক প্রকার, আর শ্যামের দর্শনাদি ক্রিয়া এক প্রকার। পদার্থ বলিলেও দুইটি শব্দ বুঝায় আর অর্থ শব্দের অর্থবাচ্য বা প্রতিপাদ্য এই উভয় একত্রিত হইয়া বুঝাইল যে, শব্দের প্রতিপাদ্যতা ক্রিয়া বা তদ্বিশিষ্ট। এরূপে "ক্রিয়া ভিন্ন পদার্থ" এই কথাটির অর্থ যোজনা কিরূপে হইবে? [illegible] জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এই অর্থ দ্বারা "পদার্থ" শব্দও

ক্রিয়াই বুঝাইল এবং যদি কোন পদের (শব্দের) অর্থই (প্রতিপাদ্য) ক্রিয়া ভিন্ন কিছু না হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত "দুইটি পদার্থ" কি প্রকারে কথিত হইয়াছে? এইটি অতি সুকঠিন আপত্তি। আমি ইহার যথা শাস্ত্র উত্তর করিতে চেষ্টা করিব, অবহিত হউন।

কতক গুলি শব্দ, এই ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যে উহার বাস্তবিক অর্থ যোজনা হয় না; অর্থাৎ বিশেষরূপে ধরিয়া লইলে উহা দ্বারা বক্তার অভিমত অর্থ সংস্থিত হয় না, অথচ ঐ সকল শব্দ শ্রবণে, শ্রোতার মনে একপ্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ঐ ভাবটি যে প্রমাণ (ঠিক সত্য) বা ভ্রান্তি (এক বস্তুতেই আর এক প্রকার বোধ) তাহাও নহে। পাতঞ্জল দর্শনে ঐ ভাবটিকে বিকল্প বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। 'শব্দ সম্পাতী বস্তু শূন্যো বিকল্পঃ।" ইহার প্রকৃত উদাহরণ গুলি, অনেকের পক্ষে অতীব দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে, এজন্য তাহা লিখিতে ক্ষান্ত থাকিলাম, কথঞ্চিৎ উদাহরণের যোগ্য দুই একটি স্থল দেখাইতেছি। যথা;—"উপল খণ্ডের শরীর দেখ," ইহা শুনিলে শ্রোতার মনে একপ্রকার বৃত্তি হইয়া উপল খণ্ডের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ হইবে। কিন্তু এই শব্দটির বস্তুতঃ অর্থ যোজনা হয় না; যেহেতু "উপলখণ্ডের শরীর" বলিলেই "শ্যামের ধনের" ন্যায় উপলখণ্ড হইতে শরীরকে পৃথক্ ও ভিন্ন ভাবে নির্দ্দেশ করা হইল; ফলতঃ উপলখণ্ড হইতে তাহার শরীর পৃথক ও ভিন্ন নহে। উপলখণ্ডও যে বস্তু, তাহার শরীরও সেই বস্তু. অণুমাত্রও পার্থক্য নাই। সুতরাং 'উপলখণ্ডের শরীর" বলিলে শ্রোতার মনে যে ভাবটি হইল. উহা প্রমাণ বৃত্তি নহে; যেহেতু, উহাতে অর্থের সত্যতা নাই। ভ্রমও নহে; যেহেতু, উহা বৃক্ষে মনুষ্য বোধের ন্যায়, একবস্তুতে অন্যবস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে না; এবং জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারই নাম বিকল্প বৃত্তি। ২য় উদাহরণ "শূন্য বা কিছুই না" এই শব্দটি বলিলে কোন না কোন একটি অর্থের লক্ষ্যে শ্রোতার মনে একটি ভাব বা বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তদ্বিষয়ে একটি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পাঠক! এক্ষণে মনে করিয়া দেখুন! যে, শ্রোতার যখন, কোন না কোন একটি অর্থ গোচর মনোবৃত্তি ও জ্ঞান জন্মিল, তখন ঐ অর্থটি "কিছুর" মধ্যেই পতিত হইল; সুতরাং "কিছুই না" হইল না, বা শূন্যও হইল না, অথচ শ্রোতার মনোভাবটি ভ্রমও হইল না, কারণ, উহা মনুষ্যো লুক বোধের ন্যায় একক অপর বলিয়া বোধ হইল না; আবার [illegible]

হইলক্ষ্য, কারণ, উহা মনুষ্যে মনুষ্য বোধের ন্যায় যথার্থ বোধ হইল না। কিন্তু যদিচ "শূন্য বা কিছুই না শব্দ" অন্যান্য শব্দের ন্যায় নিজের অর্থ বুঝাইতে সমর্থ হইল না, অর্থাৎ যে প্রকার "জল" ক্ষিতি" ইত্যাদি শব্দ "শূন্য বা কিছুই না" অর্থ বুঝাইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ "শূন্য বা কিছুই না" শব্দও "শূন্য বা কিছুই না" অর্থ বুঝাইতে সমর্থ হইল না। তথাপি "শূন্য বা কিছুই না" বুঝাইবার নিমিত্ত "জল ক্ষিতি" ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "শূন্য বা কিছুই না" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া থাকে। ঈদৃশী মনোবৃত্তিকে বিকল্প বৃত্তি বলে।

এইরূপ পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্যও "জল" "বায়ু" প্রভৃতি শব্দের ন্যায় "ব্রহ্ম" চৈতন্য" "আত্মা" "পরমাত্মা" "পুরুষ" "শিব" "পুদগল" প্রভৃতি পদ বা শব্দ সম্পূর্ণ অসমর্থ। কিন্তু তথাপি পরমাত্মার প্রতিপাদন করাইতে হইলে "তেজঃ" "ক্ষিতি" প্রভৃতি শব্দ না করিয়া শ্রোতার বিকল্প বৃত্তি হইবার নিমিত্ত "ব্রহ্ম" "চৈতন্য" "পরমাত্মা ইত্যাদি পদ বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সংসুত উক্ত নিয়মেই ব্রহ্মকে "পদের অর্থ" বা "পদার্থ" বলা যাইতে পারে। ফলতঃ ঐ সকল শব্দ বা অন্য কোন প্রকার শব্দই তাঁহাকে প্রতিপাদন করাইতে সমর্থ নহে।

পাঠক যদি এক্ষণে জিজ্ঞাসা করেন যে "যাঁহার কোন প্রকারে অনুমান ও চিন্তাদি দ্বারা বিষয় বা লক্ষ্য করা অসাধ্য হেতুক একটি নাম বা বাচক শব্দও নাই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এবং তাঁহাদ্বারা আমাদিগের প্রয়োজনই বা কি?" তাহা হইলে বিষয়টি ভাল বুঝা হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শব্দ মাত্রেই ক্রিয়া এবং শব্দার্থ মাত্রও ক্রিয়া। ক্রিয়াদ্বারাই ক্রিয়ার সম্বন্ধ, অনুকুলতা ও প্রতিকুলতাদি হইয়া থাকে, এবং ক্রিয়া মাত্রেই নিরাধার (উহার কেহই আধার নাই)। তখন তাঁহার অস্তিত্ব ক্রিয়ার সম্ভাবনা কি? নাস্তিত্ব ক্রিয়ারই বা সম্ভাবনা কি? প্রমাণ বৃত্তির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? অপ্রমাণ বৃত্তির সহিতই বা সম্বন্ধ কি? আর তাঁহাদ্বারা কিছু হইবারই বা সম্ভাবনা কি? না হইবারই বা সম্ভাবনা কি? তবে কি পাঠক তাঁহাকে শূন্য বা কিছুই না মনে করিলেন? তাহা হইলেও ভ্রান্তি হইল। কারণ "শূন্য বা কিছুই না" শব্দও ক্রিয়া স্বরূপ, এবং যাহা ভাবিয়া ইহার প্রয়োগ করা যায়, আর প্রয়োগ করিলে শ্রোতা যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহা এ ক্রিয়া। অতএব ব্রহ্মকে "শূন্য বা কিছুই না" কি প্রকারে বলিবেন? ব্রহ্ম ও ক্রিয়া

রহেন। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এই মাত্রই বলিলাম। এ সম্বন্ধে যতই কথা বিস্তার করিব ততই দুর্নিরীক্ষ্য অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সে অগ্নিকে সকলে লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইবে না। এক্ষণে ইহাই বক্তব্য যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার শক্তি বা প্রকৃতি, যাঁহার সহিত মিলিত থাকা প্রযুক্ত প্রকাশিত হইয়া নানা প্রকার পরিণামে সমর্থ হইতেছে, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ থাকা হেতু ইহারা (শক্তিত্রয়) আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, এবং যাঁহার সহিত যুক্ত থাকায় নিখিল ভোগ্য, ভোক্তৃ ব্যবহার হইতেছে, তিনিই সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন-নিত্য শুদ্ধ চিতিমাত্র ব্রহ্ম। পরন্তু এই সকল বাক্য দ্বারাও শ্রোতার উক্ত বিধ বিকল্প বৃত্তিই জন্মিবে। বস্তুতঃ কোন প্রমাণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অন্যের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায় না। প্রচুররূপে অধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের চিন্তা ও বিকল্পবৃত্তি জনক মহাবাক্য সকল শ্রবণ করিতে করিতে সত্ত্ব শুদ্ধি হইলে, নিজে তাঁহকে বুঝিতে পারে। (যে প্রকারে বুঝিতে পারা যায় তাহা পরে প্রকাশিত হইবে)। এস্থলে এরূপ ভ্রান্তি না হয় যে, ইহা দ্বারা ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরত্বকে অনির্ব্বচনীয় বলা হইতেছে,—আমি ব্রহ্মকেই অনির্ব্বচনীয় বলিয়াছি। এই চিৎস্বরূপ আত্মা অনেক নহেন; প্রকৃতি যেরূপ এক হইয়াও ত্রৈবিধ্যাপন্ন, আত্মা তদ্রূপ নহেন। আত্মা একমাত্র, সর্ব্বব্যাপক ও অখণ্ড। এই সর্ব্বব্যাপক আত্মা আর পূর্ব্বোক্ত-অপরিচ্ছিন্ন-সর্ব্বব্যাপক-শক্তি, এতদুভয় বিভিন্ন পদার্থ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে ইহাঁরা পরস্পর সম্বন্ধ দ্বারা একতা বন্ধনে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। প্রকৃতি চৈতন্যে অধ্যস্তা হইতেছেন এবং চৈতন্যও প্রকৃতিতে অধ্যস্ত হইতেছেন। এই অধ্যাসের নাম 'একতাবন্ধন'। এই একতা বন্ধন দ্বারা শক্তি ও চৈতন্য দুই হইয়াও এক। অনুভব কর, তোমার শরীর-শক্তি এবং চৈতন্য এতদুভয় পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহারা পরস্পর বিভিন্ন বস্তু সন্দেহ নাই; তথাপি পরস্পর অধ্যাস দ্বারা এক হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; স্থিরচিত্তে ক্ষণকাল ভাবিলেই অনুভূত হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর যে উক্ত প্রকার একতা অনুভবের আকার কি? তাহা হইলে এই মাত্র বলিতে পারি যে "অহং—আমি" ইহাই ঐ অনুভবের আকার। "আমি" এই অনুভবই শক্তি চৈতন্যের উক্ত প্রকারের একতা বিষয়ক। তোমার মনে যে সর্ব্বদাই "আমি" ইত্যাকার সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্দ্বারাই নিশ্চয় [illegible]

যে চৈতন্য ও শক্তি এই উভয় পরস্পর অধ্যাস দ্বারা এক হইয়া তুমি "আমি" হইয়াছ।

এক্ষণে যদি মনে কর যে "আমার শরীর-শক্তির সহিত শরীরীয় চৈতন্যের যথোক্ত অধ্যাস দ্বারা একতার অনুভব করিলাম, ইহা দ্বারা সর্ব ব্যাপক-অপরিচ্ছিন্ন শক্তির ও চৈতন্যের একতা কিরূপে অবগত হইব? আমাদের ক্ষুদ্র-শক্তির ন্যায় যে অনন্ত শক্তি ও চৈতন্য হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই।" এইরূপ বোধ হইলে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি হইয়াছে। আমি তোমার শক্তি চৈতন্যের একতাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করি নাই, উহা লক্ষ্য স্বরূপই দেখাইতেছি। তুল্য স্থান ভিন্ন নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। "রামদাস, রামদাসের ন্যায়" এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; "রামদাস শ্যামদাসের ন্যায়" এইরূপ বলিলে দৃষ্টান্ত হয়। আর যদি "রামদাস শুভ্রবর্ণ,—ঐ শরীর দেখ, জানিতে পারিবে" এই বলিয়া রামদাসের শরীর দিকে অঙ্গুলী প্রসারণ করিলে, তবে রামদাসকে লক্ষ্যই করা হয়। বস্তুতঃ আমিও চিৎশক্তির একতা দেখাইতে গিয়া তোমাকে যে অনুভব করিতে বলিতেছি, উহা সেই চিৎশক্তিই লক্ষ্য করিয়া। চৈতন্য ও প্রকৃতি এই উভয়েই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন. তখন সেই শক্তি ও চৈতন্য হইতে তোমার শক্তি ও চৈতন্যকে কিরূপে অংশ করিবে? শক্তি ও চৈতন্যের যদি অংশ বা ভাগ বা অবয়ব থাকিত, তাহা হইলে, তুমি একটি ক্ষুদ্র অংশ হইতে পারিতে; কিন্তু তাহা নহে। আমরা যে জগতের কোন বস্তুর অংশ ও অংশাংশ বলিয়া থাকি, বাস্তবিক উহা ঘোরতর ভ্রান্তিমূলক কেবল ব্যবহার রক্ষার নিমিত্ত; যথার্থতঃ উহা সম্ভব পর নহে। মনে কর যখন ত্রিশক্তি ভিন্ন পদার্থ নাই, তখন তুমি কিরূপে তাহার অংশ বা খণ্ড করিতে অবকাশ পাইবে? তোমার শরীর যে প্রকার আকর্ষণ, অপসারণ ও সংযমনাত্মক, সেই প্রকার তোমার শরীর-বহিস্থ বায়ু, অগ্নি, জলাদিও ঐ ত্রিশক্ত্যাত্মক। এক্ষণে দেখ! তোমার শরীর শক্তি ও বায়্বাদি শক্তি, ইহার মধ্যে কি আকর্ষণাদির অভাব স্বরূপ অবকাশ আছে? যদ্দ্বারা তোমার শরীরকে পৃথক্ একখণ্ড শক্তি বলিবে? তাহা কখনই নহে। ত্রিশক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অখণ্ডভাবে বিদ্যমানা রহিয়াছে। কেবল মাত্র সম্বন্ধের তারতম্যে যে উহারা নানাপ্রকারে আভাসমান হইতেছে, তদ্দ্বারাই ত্রিশক্তির খণ্ড বা অংশাদি ব্যবহার হইতেছে। তোমার শরীর বলিয়া যে স্থানে

ব্যবহার করিতেছ, সেই স্থানে ত্রিশক্তি যেরূপ সম্বন্ধাপন্ন, আমার শরীর ব্যবহার স্থানে ত্রিশক্তি আর এক প্রকার সম্বন্ধাপন্ন। এই জন্য তোমার আমাকে, এবং আমার তোমাকে ভিন্ন বলিয়া ভ্রান্তি হইতেছে। এই প্রকার স্থাবর জঙ্গম ভেদে নিখিল প্রাণীতে, এবং বায়্বাদি ভূত সকলে পরস্পর আপন হইতে ভিন্ন বলিয়া ভ্রান্তি হইতেছে; পরমার্থতঃ এক, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ! তুমি যে শক্তি ও চৈতন্যের একতা অনুভব করিতেছ, উহাই সর্ব্বব্যাপক-অখণ্ড-অনন্ত-শক্তি ও চৈতন্যের একতার অনুভব করিতেছ। সুতরাং তোমার ঐ একতা অনুভবই অপরিচ্ছিন্ন শক্তি চৈতন্যের একতার প্রমাণ ও লক্ষ্য হইল। এই প্রকারে পরস্পর অধ্যাস দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত বা এক অনন্ত অখণ্ড-অজর-অমর-নিত্য-শক্তি-চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছেন "একমেব" "একই,—দুই হইলেও একই।" শক্তি এবং চৈতন্য ইঁহারা উভয়েই অজর অমর ও সনাতন, সুতরাং উঁহাদিগের এই অধ্যাসও সনাতন। অতএব ইঁহারা পরমার্থে বিভিন্ন বস্তু হইলেও কখনই ঐ একতার ভঙ্গ নাই, বা উৎপত্তি নাই, সর্ব্বদাই দুই হইয়াও এক। অপরিচ্ছিন্না শক্তির যখন কোনাপ্রকারেও অংশ বা খণ্ড নাই, অনন্তকোটি জগৎই অখণ্ড-অপরিচ্ছিন্ন-একতাপন্ন-শক্তি-চৈতন্য স্বরূপ, তখন আর ব্যবহারিক-ভ্রান্তিমূলক-ভেদাপন্ন কোন বস্তুই ঐ 'একের' দ্বিতীয় নহে,—সমস্তই সেই 'এক'। অতএব শ্রুতি বলিলেন 'অদ্বিতীয়ম'!

ত্রিব্রহ্মদর্শন।

অরুণির পৌত্র শ্বেতকেতু বড় চঞ্চল স্বভাবের বালক। তাহার পিতা উদ্দালক সর্ব্বদা প্রবাসে থাকেন স্বয়ং পুত্রের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়া তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করাইতে পারেন না। কাজেই শ্বেতকেতুর বয়স দ্বাদশবৎসর হইয়া আসিল, তথাপি তাহার উপনয়ন হইল না, সেও আপনার মনে খেলিয়া বেড়ায়। একদিন উদ্দালক পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন "শ্বেতকেতো, গুরুকুলে গমন কর সেখানে ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক বেদা-

ধ্যয়ন কর, সৌম্য! আমাদের কুলে কেহই অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় হইয়া থাকে না অতএব গুরুকুলে গমন কর"।

শ্বেতকেতু পিতার আদেশানুসারে গুরুকুলে গমন করিলেন। সেখানে উপনীত হইয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া নিতান্ত গর্ব্বিত, পণ্ডিতম্মন্য ও অপ্রণত স্বভাব হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পিতা উদ্দালক পুত্রকে এরূপ অহঙ্কৃত দেখিয়া একদিন বলিলেন 'শ্বেত-কেতো, সৌম্য! অল্পদিনের মধ্যে সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদাধ্যয়ন করিয়াছ বলিয়া আপনাকে অত্যন্ত মহামনা ও অতি পণ্ডিত মনে কর, গর্ব্বে কাহার ও নিকট মস্তক অবনত কর না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি তোমার আচার্য্যের নিকট সেই আদেশ (উপদেশ. বিদ্যা) জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাহা জানিলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা জানিলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অতর্কিত বিষয় তর্কিত হয় ও অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়?' শ্বেতকেতু কহিলেন "ভগবন্! সে আদেশ কি প্রকার?" উদ্দা-লক বলিলেন "সৌম্য! যেমন একটী মৃতপিণ্ডের বিষয় অবগত হইলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুর রহস্য অবগত হওয়া যায়, ঘট মঠ ইত্যাদি কেবল বাচা-রম্ভন (বাক্যগত অস্তিত্ব বিশিষ্ট) মাত্র, বাস্তবিকই সমস্তই মৃত্তিকা; যেমন সৌম্য! একটী সুবর্ণ পিণ্ডের বিষয় অবগত হইলে সমস্ত সুবর্ণময় বস্তুর বিষয় অবগত হওয়া যায়, কটক, মুকুট. কেয়ুর প্রভৃতি কেবল বাচা-রম্ভণ মাত্র. পরমার্থতঃ সমস্তই সুবর্ণ; যেমন সৌম্য! নিতান্ত ক্ষুদ্র একটী লৌহ পিণ্ডের বিষয় অবগত হইলে সমস্ত লৌহ বিকারের বিষয় অবগত হওয়া যায়, নানা লৌহ বিকার ভেদ কেবল বাচারম্ভণ মাত্র, এইরূপই সেই আদেশ যাহা জানিলে ব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ হয় জগতে কিছুই অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত থাকে না।" শ্বেতকেতু আচার্য্যের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু পাছে আবার এই বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য পুনর্ব্বার আচার্য্যকুলে গমন করিতে হয়, এই ভয়ে পিতাকে বলিলেন "নিশ্চয়ই আমার পূজনীয় আচার্য্যবর্গ এ বিদ্যার বিষয় অবগত নহেন, তাঁহারা যদি ইহা জানিতেন তবে আমার মত ভক্ত ও অনুগত শিষ্যকে অবশ্যই তাহা শিক্ষা দিতেন। অতএব ভগবন্! আপনিই আমাকে সেই বিদ্যার বিষয় উপদেশ করুন" উদ্দালক 'তথাস্তু' বলিয়া পুত্রকে সেই বিদ্যার বিষয় উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

"সৌম্য! এই বিচিত্রনামরূপ বিশিষ্ট দৃশ্যমান্ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব নিরঞ্জন চৈতন্য স্বরূপ, সূক্ষ্ম সৎপদার্থ (সত্তামাত্র) ছিল * যাহা হইতে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ (বৈনাশিকেরা) বলিয়া থাকে জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অসৎ পদার্থ (অনস্তিতা, শূন্য) মাত্র ছিল যাহা হইতে এই অস্তিতাবিশিষ্ট বিচিত্র জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সৌম! তাহা কখনও হইতে পারে না, অসৎ পদার্থ (শূন্য) হইতে সৎ (অস্তিতা বিশিষ্ট) পদার্থের উৎপত্তি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র এক অদ্বিতীয় (যাহা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না) সূক্ষ্ম চৈতন্য পদার্থ মাত্র ছিল। সেই সৎ (সদাখ্য দেবতা, চৈতন্য) ইচ্ছা করিল বহু হইয়া উৎপন্ন হই" এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তেজের সৃষ্টি করিল। অনন্তর সেই তেজোরূপ সংস্থিত সদাখ্য দেবতা ইচ্ছা করিল 'বহু হইয়া উৎপন্ন হই' এবং ইচ্ছা করিয়া অপের (জলের) সৃষ্টি করিল। এই জন্যই কোন পুরুষের দেহ সন্তপ্ত হইলেই সেই তেজের কার্য্য ঘর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তখন সেই জলরূপে সংস্থিত সদাখ্য দেবতা ইচ্ছা করিল 'বহু হইয়া উৎপন্ন হই' ও ইচ্ছানন্তর অন্ন (পৃথিবী লক্ষণ) সৃষ্টি করিল। এই জন্যই কোন প্রদেশে কোন স্থানে বৃষ্টি হইলেই অধিক অন্ন (ব্রীহি যবাদি) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সমস্ত ভূতের (পক্ষ্যাদির) আণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ বীজ হইয়া থাকে। সেই সদাখ্য দেবতার এখনও সৃষ্টিদিদৃক্ষার শেষ হয় নাই; তিনি ইচ্ছা করিলেন "পূর্ব্ব সৃষ্ট্যনুযায়ী এই ত্রিবিধ (আণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিদ) জীব রূপে আমি এই তিন দেবতার (তেজঃ অপ, ও অন্ন) মধ্যে অনু প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল জগৎকে নাম ও রূপ দ্বারা বিস্পষ্ট করি"। †

এইরূপ ইচ্ছা করিয়া সেই সদাখ্য দেবতা সেই তিন দেবতার (তেজঃ

---

* সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্।

† অর্থাৎ নাম ও রূপদ্বারা বিস্পষ্ট করিয়া নিখিল জগতের সৃষ্টি করি। এই নিখিল জগৎ সেই একমাত্র সৎপদার্থ হইতে ভিন্ন নহে, সেই সৎ পদার্থের বিশেষ রূপ অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে, শ্রুতি পূর্ব্বাপর ইহাই দেখাইয়াছেন।

অপ্‌ ও অন্নের) মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ইচ্ছা করিলেন আমি ইহাদের (তেজঃ অপ্‌ অন্নের) প্রত্যেক টীকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্রিত্ব বিশিষ্ট) করি। এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তিনি তেজঃ অপ্‌ ও অন্নের প্রত্যেকটীকে ত্রিবৃৎ করিলেন *। হে সৌম্য! যেরূপে এই তিন দেবতার প্রত্যেকে ত্রিবৃৎকৃতা হইল তাহা শুন।

অগ্নির (স্থূল অগ্নির) যে লোহিত রূপ তাহা তেজের, অগ্নির যে শুক্লরূপ তাহা অপের, অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের। তাহা হইলে দেখ অগ্নির 'অগ্নি' বলিয়া পৃথক্‌ সংজ্ঞা তাহা অপগত হইল বাস্তবিকই তিন রূপই সত্য হইয়া দাঁড়াইল অর্থাৎ এই তিনরূপেরই সত্ত্বা ব্যতীত অগ্নির আর পৃথক্‌ সত্ত্বা নাই, সুতরাং 'অগ্নি' এই পৃথগ্‌ বুদ্ধি ভ্রমকল্পিত মাত্র, এই ভ্রম বুদ্ধি কেবল 'অগ্নি' এই পৃথক্‌ নামের উপর নির্ভর করিতেছে বাস্তবিক এই তিন রূপই (তেজঃ, অপ্‌ অন্ন) সত্য। †

আদিত্যের যে লোহিতরূপ তাহা তেজের, আদিত্যের যে শুক্লরূপ তাহা অপের, আদিত্যের যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের, এইরূপে আদিত্যের আদিত্যত্ব (আদিত্য এই সংজ্ঞা ও বুদ্ধি) অপগত হইল। আদিত্য এই বুদ্ধি ভ্রান্তিমাত্র কেবল নামমাত্রকল্পিত বাস্তবিকই সেই তেজঃ অপ্‌ ও অন্ন এই তিনরূপই সত্য।

চন্দ্রমার যে লোহিত রূপ তাহা তেজের, যে শুক্লরূপ তাহা অপের, যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের, এইরূপে চন্দ্রের চন্দ্রত্ব অপগত হইল, 'চন্দ্র' এই বুদ্ধি

---

* অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্‌।

† ত্রিবৃৎকরণ ত্রিত্ববিশিষ্টকরণ, যেমন এক গাছি সূত্রে আর দুই গাছি সূত্র একত্র করিলে সেই প্রথম সূত্রগাছি ত্রিবৃৎকৃত হইল। স্থূল তেজঃ, স্থূল অপ্‌ ও স্থূল অন্ন এইরূপ ত্রিবৃৎকৃত, অর্থাৎ সূক্ষ্ম তেজ সূক্ষ্ম অপ্‌ ও সূক্ষ্ম অন্ন মিশ্রিত করিয়া স্থূল তেজ হইয়াছে, এইরূপ সূক্ষ্ম অপে সূক্ষ্ম তেজ ও সূক্ষ্ম অন্ন মিশ্রিত করিয়া স্থূল অপ্‌ হইয়াছে এইরূপ সূক্ষ্ম অন্নে সূক্ষ্ম তেজ ও সূক্ষ্ম অপ্‌ মিশ্রিত করিয়া স্থূল অন্ন হইয়াছে। প্রত্যেকটিতেই তিনটি আছে কিন্তু যেটীতে যাহার পরিমাণ অধিক তদনুসারে তাহার নাম হইয়াছে। স্থূল তেজে তেজের ভাগ অধিক বলিয়া উঁহার নাম তেজঃ হইয়াছে এইরূপ অন্যত্র। অন্ন এই স্থানে পূর্ব্বাপর "পৃথিবী" বুঝাইতেছে। আমরা যে অন্ন (ব্রীহি যবাদি) ভক্ষণ করি পৃথিবীরই বিকার, এই জন্য পৃথিবীকে অন্ন বলা হইতেছে।

ভ্রান্তি মাত্র কেবল নাম মাত্র কল্পিত, বাস্তবিক সেই তেজ অপ্ ও অন্ন এই তিন রূপই সত্য। বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ তাহা তেজের, যে শুক্লরূপ তাহা অপের, যে কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের, এইরূপে বিদ্যুতের বিদ্যুত্ত্ব অপগত হইল। 'বিদ্যুৎ' এই বুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র, কেবল নাম মাত্র কল্পিত বাস্তবিক সেই তেজ অপ্ অন্ন এই তিন রূপই সত্য।

তেজোবিকার অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম অপের ও অন্নের বিকার সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে এইরূপে জগতের সমস্ত বিকার জাতই কেবল নামমাত্রকল্পিত সেই তেজ অপ্ ও অন্ন এই তিন রূপই সত্য। তাহা হইলে সেই তিন দেবতার রহস্য জানিলেই নিখিল জগতের রহস্য জানিতে পারা যায়।

পূর্ব্বে মহা গৃহস্থ ও মহা শ্রোত্রীয়েরা এই রহস্য জানিতে পারিয়া ছিলেন। জানিতে পারিয়া তাঁহারা এই কথা কহিয়াছিলেন "অদ্য আমাদিগকে কেহ আর অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত বিষয়ের কথা বলিতে পারিবে না"। কেন না, জগতের যাহা কিছু লোহিত তাহা তাঁহারা তেজের রূপ বলিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন, এইরূপে যাহা কিছু শুক্ল তাহা অপের ও যাহা কিছু কৃষ্ণ তাহা অন্নের * রূপ বলিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন। এইরূপে যাহা কিছু তাহাদের নিকট অবিজ্ঞাত থাকিত তাহা তাঁহারা এই তিন দেবতার সমষ্টি স্বরূপে অবধারণ করিতেন।

হে সৌম্য! এইরূপে সমস্ত বাহ্য বস্তু কি রূপে ত্রিবৃৎকৃত হইয়াছে তাহা শুনিলে, এক্ষণে এই তিন দেবতা (তেজঃ, অপ্, অন্ন) কিরূপে পুরুষের দেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিবৃৎকৃতা হইল তাহা বলিতেছি শুন।

অন্ন অশিত হইলে জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া ত্রিভাগে বিভক্ত হয়। সেই অন্নের যে স্থূলতম অংশ তাহা পুরীষে পরিণত হয়, যে মধ্যম অংশ তাহা মাংসে পরিণত হয় ও যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মনঃ-স্বরূপে পরিণত হয়। অপ্ পীত হইলে তাহা ও ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার যে স্থূলতম অংশ তাহা মূত্র, যে মধ্যম অংশ তাহা রক্ত ও সূক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণ স্বরূপে পরিণত হয়। তেজঃ (তেজোবিকার তৈল ঘৃতাদি) অশিত হইলে

---

* পূর্ব্বাপর অন্ন শব্দে ক্ষিতি কে বুঝাইতেছে। আমরা যে অন্ন ভক্ষণ করি তাহা ক্ষিতি-রই পারি ণাম।

তাহাও ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া তাহার যে স্থূলতম অংশ তাহা অস্থি, যে মধ্যম অংশ তাহা মজ্জা, যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা বাক্ রূপে পরিণত হয়। হে সৌম্য! পুরুষের মন অন্নেরই বিকৃতিমাত্র, পুরুষের প্রাণ অপেরই বিকৃতি মাত্র ও পুরুষের বাক্ তেজেরই বিকৃতি মাত্র।

শ্বেতকেতু এইরূপে প্রত্যায়িত হইয়া ও কিরূপে ভুক্ত অন্নাদি মনঃ প্রভৃতিতে পরিণত হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না ও কহিলেন "ভগবন্! দৃষ্টান্তের দ্বারা পুনর্ব্বার আমাকে বুঝাইয়া দিন"। উদ্দালক 'তথাস্তু' বলিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

"হে সৌম্য! যেমন দধিকে মন্থন করিলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ঘৃতরূপে পরিণত হয় এইরূপই ভুক্ত অন্ন জাঠরাগ্নিতে পচ্যমান হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা ঊর্দ্ধে হৃদয় দেশে উঠিয়া তথাকার 'হিত' নামক সূক্ষ্ম নাড়ী বিশেষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বাক্ আদি করণ (ইন্দ্রিয়) সমূহের স্থিতির কারণ হয় ও এইরূপে মনের অবয়ব স্বরূপে * পরিণত হইয়া তাহারই (মনেরই) উপচয় বিধান করে। হে সৌম্য এই দধি ঘৃত দৃষ্টান্তের মতই পীত অপের যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া প্রাণ স্বরূপে পরিণত হয় এইরূপই ভুক্ত তেজের যাহা অনুতম অংশ তাহা ও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বাক্ রূপে পরিণত হয়। হে সৌম্য পুরুষের মন অন্নময়, প্রাণ তেজোময় ও বাক্ তেজোময়ী।

শ্বেতকেতু কহিলেন ভগবন্! যাহা কহিলেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না, মনঃই যে অন্নের বিকার অপ্ বা তেজের নহে এইরূপ প্রাণ যে অপের বিকার অন্য দুইটির নহে, এইরূপ বাক্ই যে তেজের বিকার অন্য কিছুর নহে, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। অতএব ভগবন্ অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিন।"

উদ্দালক তথাস্তু বলিয়া কহিলেন "হে সৌম্য! পুরুষ ষোড়শকলা-বিশিষ্ট (কেন না তাহার মন ষোড়শ ভাগে বিভক্ত) অতএব পঞ্চদশ দিবস উপবাস করিয়া থাক, কিন্তু ইচ্ছামত জলপান করিও—পুরুষের প্রাণ অপের বিকার বলিয়া এতদিন উপবাসেও তোমার প্রাণের বিয়োগ হইবে না।"

---

* কেননা মনই বাক্ আদি করণ সমূহের স্থিতির কারণ স্বরূপ।

শ্বেতকেতু পিতার আদেশ অনুসারে পঞ্চদশদিন অনাহারে থাকিলেন। ষোড়শ দিনে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "আমাকে এক্ষণে কি বলিতে হইবে?" উদ্দালক কহিলেন "বৎস! গুরুর নিকট যে ঋক্ সাম ও যজুঃ বারম্বার অভ্যাস করিয়াছ তাহারই এক্ষণে আবৃত্তি কর।" শ্বেতকেতু কহিলেন "আমার কিছুই মনে আসিতেছে না।"

অনন্তর উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কহিলেন "বৎস! যেমন এক প্রকাণ্ড প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির সমস্ত নিবিয়া এক কণামাত্র (খদ্যোত পরিমাণ) অঙ্গার অবশিষ্ট থাকিলে তাহা দ্বারা যেমন বহুপরিমাণ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না সেইরূপ তোমার অতি প্রখরধীশক্তি সম্পন্ন মনের পঞ্চদশ কলা অতীত হইয়া গিয়াছে এক্ষণে একটী কলামাত্র অবশিষ্ট আছে সেই জন্য ভূয়োভূয়ঃ অভ্যস্ত বেদ ভাগ ও তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে না। এক্ষণে আহার করিয়া পুনর্ব্বার আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা কর।" শ্বেতকেতু আহার করিয়া পিতার নিকট আসিলে তখন পিতা তাঁহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন শ্বেতকেতু অনায়াসে সে সকলের উত্তর প্রদান করিলেন। তখন উদ্দালক তাহাকে বলিলেন "বৎস! মহদগ্নিপিণ্ডের সেই কণামাত্রাবশিষ্ট অঙ্গারে তৃণ মুষ্টি প্রদান করিলে সে যেমন পূর্ব্ববৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বহুকাষ্ঠ দহনে সমর্থ হয় সেইরূপ অন্নের বিকার তোমার এই ষোড়শকল মনের অবশিষ্ট কলা পুনর্ব্বার অন্ন সংযোগে বল-সমাধান করিয়া অধীত নিখিল বেদের স্মরণে সমর্থ হইতেছে অতএব দেখ পুরুষের মন অন্নেরই কার্য্য, অন্নেরই রূপান্তর। মনঃ সম্বন্ধে অন্ন যেমন প্রাণ ও বাক্-সম্বন্ধে সেইরূপ অপ ও তেজ জানিবে। তাহা হইলে দেখ পুরুষও তেজঃ অপ্ ও অন্নের বিকার; 'পুরুষ' এই বুদ্ধি ভ্রান্তিমাত্র সেই তিন দেবতাই (তেজঃ অপ্ ও অন্ন) সত্য। বৎস! এইরূপে জগতের যাহা কিছু বিকারজাত তৎ সমস্তই সেই সূক্ষ্ম তেজঃ অপ্ ও অন্ন এই তিন দেবতার রূপান্তর মাত্র। আবার সেই তিন দেবতা ও সেই সদাখ্য দেবতার রূপান্তর মাত্র অতএব সেই সদাখ্য দেবতার বিষয় জানিতে পারিলে জগতের কিছুই অশ্রুত, অবিজ্ঞাত ও অমত থাকে না, এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি?" শ্বেতকেতু কহিলেন "হাঁ এক্ষণে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি।"

এইরূপে পিতা উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুর নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত

রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন। এই উপাখ্যান হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মাত্র এক ও অদ্বিতীয় সত্ত্বার পরিণাম মাত্র। জগতের যাহা কিছু পদার্থ,—ঘট পট, মঠ, মনুষ্য পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্ত বস্তু বিভাগ,—কেবল কল্পিতনামরূপভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। বাস্তবিক জগৎ সংসার সেই একমাত্র সৎ পদার্থ হইতে আর কিছুই নহে। আমরা যাহা কিছু দেখি শুনি অনুভব করি তৎ সমস্তই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত (অবিদ্যা কল্পিত)। কিরূপে সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া প্রকৃত সদাখ্য দেবতার সহিত অভেদ জ্ঞানের প্রকাশ হয় উদ্দালক তাহা ও শ্বেতকেতুকে বলিয়া ছিলেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব। ইতি। শান্তিঃশান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

সাধারণের প্রতি নিবেদন।

আমি, মনে নানারূপ অশান্তি হয় বলিয়া, সকলরূপ বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি। অতএব এখন হইতে চাটর্যিব্রাদার্স নামক পুস্তকালয়ের, বেদব্যাস যন্ত্রের এবং ধর্ম্মপুস্তক-প্রকাশ-রূপ কার্য্যেয় ন্যাসান্যাল ইনিষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের কিম্বা অন্যকোন কার্য্যের কার্য্য-ব্যবস্থা সহিত আমার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঐ সমস্ত কার্য্যের সুবন্দবস্ত অথবা বেবন্দ-বস্তের জন্য তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষগণই দায়ী। সেইরূপ আমার কোন ত্রুটির জন্য (যদি কখন হয়) আমি দায়ী. উঁহারা তজ্জন্য দায়ী নহেন। উক্ত সমস্ত কার্য্যের আর্থিক অথবা অন্য কোনরূপ বিষয়ের গোলযোগের জন্য কার্য্যধ্যক্ষগণই ব্যবস্থা করিবেন। অতএব ঐ সমস্ত কার্য্যের কার্য্য ত্রুটির জন্য আমাকে কেহ যেন না লেখেন, সাধারণের নিকট বারম্বার আমার এই অনুরোধ। যদি বেদব্যাসের সম্পাদক ভাবে আমার কোন ত্রুটি দেখেন তবে তজ্জন্য আমি অবশ্য দায়ী। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত ব্যাপারের জন্য কার্য্যধ্যক্ষই দায়ী। কিমধিকমতি।

বিনয়াবনত

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বর্ষ।

১২৯৪ সাল।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৪ নং রেনেটোলা পটলডাঙ্গা " বেদব্যাস যন্ত্রে '
শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার দ্বারা
মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ১০ম খণ্ড।

মায়াবাদ। *

কোন এক বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে আর একটি বিজাতীয় (বিধর্ম্মী) বস্তু আবশ্যক করে, সেই বিধর্ম্মী বস্তুটী অবলম্বন (অর্থাৎ তাহার সহিত সাম্য) করিয়া বস্তু মাত্রেরই স্বরূপ (ধর্ম্ম) জানা যায়। যেমন একমাত্র অন্ধকার আশ্রয় করিয়া আলোক জানা যায়, এইরূপ বস্তু সকলের বিরুদ্ধ ধর্ম্মই স্ব স্ব ভাব প্রকাশের কারণ; এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মের স্বরূপ (অজড়) জানিবার জন্যই এই সৃষ্টি (জড় জগৎ)। এক্ষণে দেখা উচিত যে ব্রহ্মের স্বজাতি, স্বগত ও বিজাতি কোন আছে কি? অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন নিত্যসত্তা আছে কি?—তাহা নাই। ইহার অনেক ন্যায়, যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণ আছে। স্বরূপতঃই, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের (আপনাকে আপনি জানিবার) জন্যই সৃষ্টি (জড় জগৎ)। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তাঁহার স্বজাতি, স্বগত ও বিজাতি নাই, তাহা হইলে কি হইতে সৃষ্টি (জড় জগৎ) হইল? অবিদ্যা (অজ্ঞান)

* এই প্রস্তাবে মায়া যে অজ্ঞান ভিন্ন আর কোন দ্বৈত সত্ত্বা নহে, তাহাই বিচার্য্য। মায়াকে শ্রুতি ব্রহ্মের অনাদি অজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও একটি বিষয়ে আমাদের মত সূক্ষ্মদর্শীর সংশয় আছে, সেই সংশয় এই, যে, ব্রহ্মের (পূর্ণ জ্ঞান মতে) অনাদি অজ্ঞান আছে কেন?—এতদুত্তরে একটি জিজ্ঞাস্য যে, কি বিষয়ে ব্রহ্মের অজ্ঞান আছে? আপনার স্বভাব (স্বরূপ) বিষয়ে অজ্ঞান। কেন স্বরূপে অজ্ঞান আছে? এইখানে

তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই এই বিচিত্র সৃষ্টি (জড় জগৎ) কল্পনা করিয়াছে; অর্থাৎ যেরূপ এক আলোকের অপ্রকাশই অন্ধকারাখ্যাত, (বস্তুত অন্ধকার কোন পদার্থ নহে, আলোকের অভাব মাত্র) সেইরূপ পুরুষের যে "অজ্ঞান" (ভ্রান্তি জ্ঞান) তাহাই সৃষ্টি (জড় জগৎ) আখ্যাত হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য যে, পূর্ণজ্ঞানময় পুরুষকে "অজ্ঞান" আশ্রয় করা কি সম্ভব হয়?—"অজ্ঞান" ও "জ্ঞান"; অজ্ঞানে পুরুষের জ্ঞান অভাব (অপ্রকাশ) বা বিবৃত হয় না, স্বভাবেই থাকে; তবে শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় "স্বভাবে" (অজড়ে) "অভাব" (জড় জগৎ) ভ্রম হয়, এই ভ্রম বা ভ্রান্তিজ্ঞানই "অ-বিদ্যা"। এই অবিদ্যার পরিণাম "মহতত্ত্ব", এই মহতত্ত্ব হইতে "বুদ্ধি ও অহঙ্কার", বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে মনের বিকাশ, এই মন হইতে বিচিত্র সৃষ্টি (জড় জগৎ) পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "ভ্রান্তি জ্ঞান" (অবিদ্যা) ও মহতত্ত্ব (বুদ্ধি ও অহঙ্কার) কেন?—"বুদ্ধি ও অহঙ্কার" না হইলে "আপনাকে আপনি অর্থাৎ স্বভাব (পুরুষ পূর্ণজ্ঞানময়) জানা যায় না"। ব্রহ্ম যে "নিত্য জ্ঞানময় এবং সুখস্বরূপ", কে ঐ স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছে?—বিদ্যা (জ্ঞান)। ভাল, বল দেখি যে, "বিদ্যা" (জ্ঞান) কি "অবিদ্যার পরিণাম মহত্তত্ত্বের (নিশ্চয়াত্মক সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও সাত্ত্বিক

জিজ্ঞাস্য যে, জীবের স্বরূপে ও বস্তু বিষয়ে অজ্ঞান থাকে কেন?—জীবের অল্পজ্ঞতা, বহুবস্তু ও বস্তুতে বস্তু সাদৃশ্যই বস্তুগত এবং জীবের স্বভাবের অজ্ঞানের কারণ। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানময়, কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে, জীবের মত তাঁহার স্বভাবে অজ্ঞান থাকে?—কিন্তু বলুন দেখি যে, দ্বিতীয় বা বহু বস্তু না হইলে কি পূর্ণ জ্ঞান ও এক বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান (অর্থাৎ অজ্ঞান নাশ) হয়? অর্থাৎ এইটি স্বতঃসিদ্ধ যে দুই বা ততোধিক বস্তু থাকাতেই পূর্ণ জ্ঞান এবং প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞানময় হইলেও কি হইবে?—দুই বা বহু বস্তু (দ্বৈতসত্ত্বা) না থাকাতেই ব্রহ্মের "স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞান (মায়া) আছে, আর ব্রহ্ম যত দিন, অজ্ঞানও ততদিন। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি, সুতরাং অজ্ঞানও অনাদি। বস্তুতঃই ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞানময় হইলেও দ্বৈতসত্ত্বা না থাকাই অনাদি অজ্ঞানের (মায়ার) হেতু। এই যুক্তি কতদূর সত্য, পাঠক, আপনি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করুন, তাহা হইলেই উপলব্ধি হইবে। এই খানে আর একটি আশঙ্কা যে, অনাদি অজ্ঞান স্বীকার করিলে পূর্ণ জ্ঞান-ময়ত্বের বাধা হইতে পারে কি না। তাহা হয় না। এই প্রস্তাবে ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে তাহাও নিরাকৃত হইয়াছে,।

অহঙ্কারের) অন্তর্গত নহে? কতদিন হইল জ্ঞান পুরুষের ঐ স্বরূপতত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছে? বেদ ও মহাবাক্য সকল ("অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" "সর্ব্বমে অস্মাৎ" ইত্যাদি) যতদিন? অবিদ্যার (অজ্ঞানের) পূর্ব্বে কি পরে?—চিন্তাস্রোতে মন ঢালিয়া দেও, দেখিবে যে, অগ্রে অবিদ্যার পরিণাম মহতত্ত্ব (তামস ও রাজস বুদ্ধি ও অহঙ্কার), "ইদং" (জড় জগৎ) কল্পনা করিলে, পরে ঐ অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মক সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও অহঙ্কার, বিদ্যা (জ্ঞান), শ্রুতি এবং মহাবাক্য সকল (অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ) নিশ্চয় করিয়াছেন। যদি বল যে, অবিদ্যার পূর্ব্ব হইতে শ্রুতি ও মহাবাক্য সকল (অর্থাৎ বিদ্যা) আছে। তাহাই মানিলাম, কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কোন একটী বিজাতি (দ্বৈত) বস্তু না হইলে তাহার সহিত সাম্যে একের (অদ্বয়) স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় না; অতএব পূর্ব্বে অবিদ্যা (দ্বৈত) আছে বলিয়াই পরে পুরুষ (অদ্বৈত) নিশ্চয় হইয়াছেন। অর্থাৎ অন্য কোন নিত্যবস্তু অভাব (অসত্তা) হেতু পুরুষ আপনাতেই দ্বৈত (অবিদ্যা) কল্পনা করিয়া স্বরূপ (অদ্বৈত) তত্ত্ব (সৎ, চিৎ, আনন্দ) আপনি নিশ্চয় বা উপলব্ধি করেন। "আপনাকে আপনি না জানিলে" স্বরূপে অবস্থিতি (মোক্ষ বা অপবর্গ) হয় না; এবং আর একটি বিজাতি (দ্বৈত) না থাকিলেও (তাহার সহিত সাম্যে) স্বভাব জানা যায় না; কিন্তু একমাত্র পুরুষ ভিন্ন আর বিজাতি (দ্বৈত) নিত্য সত্তা নাই, সুতরাং সেই পুরুষই (অদ্বৈত) আপনাতেই অবিদ্যা (ভ্রান্তিজ্ঞান) কল্পনা করিয়া তাহার সহিত সাম্যে আপনার "স্বরূপ তত্ত্ব" (মোক্ষ বা অপবর্গ) অবগত বা প্রাপ্ত হন। এবং এইজন্যই সাংখ্যকার নিরীশ্বর হইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যে, এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যই মোক্ষ ("স্বরূপ অবস্থিতি") ও প্রকৃতির ধর্ম্মই পুরুষের উপকারে আইসে; অতএব বেদান্তের অবিদ্যা বা মায়াবাদের সহিত সাংখ্যের ঐক্য আছে।

এক্ষণে বলিতে পার যে, তাহা হইলে অনাদি অবিদ্যা কল্পনা করিতে হয়; আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সাংখ্যের অনাদি প্রকৃতি স্বীকারে দোষ কি?—প্রকৃতি যে অনাদি নহে, তাহা নিরাশ করা যাইতেছে। যে বস্তু "অনাদি" তাহার অন্ত নাই, যাহার অন্ত নাই, তাহাই "নিত্য", যাহা "নিত্য" আবার তাহাই "নিরাকার", কারণ সাকার মাত্রেই ক্ষয়শীল (অসত্ত্ব)। সুতরাং অনাদি বলিলেই প্রকৃতিকে নিত্য ও নিরাকার বলিতে হইবে, নচেৎ

বাধ হইবে ; অর্থাৎ "নিরাকার" বস্তুই অক্ষয় (সত্তা বা আদ্যন্তহীন), যাহা অক্ষয় তাহাই অনাদি, নিত্য ও নিরাকার, অতএব অবশ্য "অনন্ত" হইবে। এক্ষণে প্রকৃতি অনাদি বলিলে, প্রকৃতি ও পুরুষ একই ধর্ম্মী (অর্থাৎ অনাদি, নিত্য, নিরাকার এবং অনন্ত) হয়, দুইবস্তু একধর্ম্মী হইলে দুইই একবস্তু, হইবে। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি ও পুরুষ যে একধর্ম্মী নহে সাংখ্যই তাহার বিশেষ প্রমাণ, অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম্ম জড় ও পুরুষের ধর্ম্ম "অজড়", জড় ও অজড় এতদুভয়ই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্বভাব। বস্তুর মজ্জাগত গুণ পৃথক হইলে কোন প্রকার বস্তুগত ঐক্য থাকিবে না, সুতরাং প্রকৃতি অনাদি নহে। তৃতীয়তঃ সাংখ্যকারই বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের নিকট প্রকৃতি (মহত্তত্ত্ব) থাকে না, লয় হয়—"লয়" আর "অভাব" একই কথা। অতএব প্রকৃতিকে কেমন করিয়া অনাদি বলিতে পার ? যদি "লয়" শব্দে এরূপ অর্থ কর যে, প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মুক্তপুরুষ প্রকৃতিকে আর গ্রহণ করে না ; তাহাও বলিতে পার না, কারণ সাংখ্যকারই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির স্বভাবই পুরুষকে বন্ধন করা, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের "অয়স্কান্তমণিবৎ সম্বন্ধ হইতেই পুরুষের বন্ধন"। অয়স্কান্তমণি ও লৌহ যদি সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার থাকে, তাহা হইলে লৌহ ঐ মণি হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না, সংশ্লিষ্টই থাকে। লৌহকে বিশ্লিষ্ট (মোক্ষ বা স্বরূপে অবস্থিতি) করিতে হইলে, হয় লৌহ, না হয় ঐ মণি পৃথক অর্থাৎ অভাব করিতে হয় ; সেইরূপ পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক (বিশ্লিষ্ট অর্থাৎ মোক্ষ বা স্বরূপে অবস্থিতি) করিতে হইলে একটির লয় বা অভাব অবশ্য করিতে হয় ; এক্ষণে বিচার্য্য যে কাহার "লয়" বা অভাব হয় ? সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিরই "লয়" হয়, অতএব পুরুষ মুক্ত হইলে যে প্রকৃতির লয় (থাকে না অর্থাৎ অভাব) হয়, তাহাই প্রমাণিত হইল। প্রকৃতি যে অনাদি নহে তাহার আর একটি বিশেষ প্রমাণ,—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে বস্তু অনাদি তাহা নিত্য, যেহেতু যাহার আদি নাই (ন + আদি — অনাদি) তাহার অন্তও নাই—অর্থাৎ আদ্যন্ত হীন বস্তুই "অনাদি"। আর আদ্যন্তবিহীন বস্তুই "নিত্য" (সৎ)। একটি বস্তুকে "সৎ" বলিলেই তাহা অবশ্য "নিরাকার" হইবে ; কারণ সাকার (সান্ত) বস্তু মাত্রেই ক্ষয় (অন্ত বিশিষ্ট), আর যে বস্তু অক্ষয় (অনন্ত) তাহাই "নিরাকার"। নিরাকার হইলেই সর্ব্বব্যাপী, অতএব কোন একবস্তু নিরাকার না হইলে, তাহা অনাদি হইতে পারে না ; এবং সেই অনাদি বস্তুই "নিত্য"

(সৎ) "অক্ষর" (অনন্ত) ও সর্ব্বব্যাপী হইবে। ভাল বল দেখি যে, যে অয়স্কান্তমণি প্রভাবে লৌহ চালিত হয়, সেই মণি যদি "অনাদি" হয়, (অর্থাৎ যে বস্তু অনাদি, তাহাই নিত্য, অনন্ত ও নিরাকার এবং সর্ব্বব্যাপী হইবে) তাহা হইলে কি কোন কালে লৌহ উক্ত মণির আকর্ষণ হইতে বিশ্লিষ্ট (মুক্ত) হইতে পারে ? কারণ পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনাদি বাচ্য বস্তুই নিত্য অনন্ত ও নিরাকার, আর নিরাকার হইলেই তাহা সর্ব্ব দেশে সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকিবে, সুতরাং লৌহ ঐ মণির প্রভাব (আকর্ষণ) হইতে যেখানে যাউক না কেন, কখনও মুক্ত—অর্থাৎ ঐ মণি—হইতে পারিবে না। উক্ত মণি সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে লৌহের সাক্ষাৎকার (যেহেতু "অনাদি বাচ্য, আর অনাদি বস্তু মাত্রেই নিত্য ও অনন্ত, অনন্ত হইলেই তাহা নিরাকার, এবং নিরাকার বস্তু মাত্রেই সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী) * থাকিয়া লৌহকে আবদ্ধ রাখিবে, মুক্ত হইতে দিবে না। সেইরূপ প্রকৃতিকে যদি অনাদি বল, তাহা হইলে প্রকৃতি অবশ্যই নিত্য ও অনন্ত, অনন্ত বস্তু মাত্রেই নিরবয়ব, যাহা নিরবয়ব তাহাই সর্ব্বকালে সর্ব্ব দেশে সমভাব পরিব্যাপ্ত থাকিবে। সুতরাং পুরুষ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে প্রকৃতির অয়স্কান্তমণিবৎ সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ থাকিবে, মুক্ত হইতে পারিবে না; তাহা হইলে সাংখ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হইতেছে। অতএব প্রকৃতি অনাদি বলিতে পার না।

এক্ষণে অবিদ্যা যে অনাদি নহে, সাংখ্যের এই আশঙ্কা নিরাস করা যাইতেছে। পুরুষ হইতে অবিদ্যার বিকাশ হয়, এবং সেই অবিদ্যার কার্য্য মহতত্ত্বাদি (জড় জগৎ), কিন্তু আবার পুরুষের বিদ্যা (জ্ঞান) হইলেই সেই অবিদ্যা (অজ্ঞান) নাশ হয়। অবিদ্যা নাশই মহতত্ত্বাদি (জড় জগৎ) লয়, (অভাব) অর্থাৎ অবিদ্যা (অজ্ঞান) কে কোন নিত্য দ্বৈত সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পার না; কারণ অবিদ্যাও জ্ঞানের (ভ্রান্তি জ্ঞানের) কার্য্য। অর্থাৎ একই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া উহা কল্পিত হয়, অতএব অবিদ্যা আর কৈ অনাদি হইতেছে ? আবার অবিদ্যা (অজ্ঞান) সাদিও বলিতে পার না, কারণ একই পুরুষকে (অজ্ঞানময়কে) আশ্রয় করিয়া যাহার বিকাশ (অর্থাৎ পুরুষের ভ্রান্তিজ্ঞান) ও নাশ (অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান) তাহা সৎ (নিত্য)ও নহে, এবং অসৎ (অনিত্য)ও নহে। এই জন্য শ্রুতিতে

---

* আবশ্যক বিধায় পুনরুক্তি ঘটিল।

এই অবিদ্যাকে ব্রহ্মের অনিবার্য্য মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এক্ষণে বলিতে পার যে, যেরূপ সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্মের মজ্জাগত ধর্ম্ম (স্বভাব) এই অবিদ্যাও কি সেইরূপ তাঁহার ধর্ম্ম (মজ্জাগত স্বভাব)?—না। কেন?—এটি সতঃসিদ্ধ যে, যাহা পদার্থের ধর্ম্ম হয়, তাহা অভাব (নাশ) হইলেই সে পদার্থটি অভাব হয়; যেমন দীপের ধর্ম্ম প্রকাশ (আলোক), এই আলোক অভাব হইলেই দীপ অভাব জানা যায়; তেমনই অবিদ্যা (ভ্রান্তিজ্ঞান) অভাব হইলেই ব্রহ্ম (সৎ, চিৎ আনন্দ) অভাব হইতেন; কিন্তু তাহা না হইয়া তিনি প্রকাশ পান; অতএব অবিদ্যা তাঁহার ধর্ম্ম (স্বভাব) নহে।

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, যেরূপ এক বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে অন্য বিজাতি বস্তু অর্থাৎ দুইটী বস্তু আবশ্যক করে; কিন্তু এক অদ্বয় অজড় ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা অভাব হেতু সেই অদ্বয় চৈতন্য আপনি আপনাতে অবিদ্যা আশ্রয় করত দ্বৈত সত্তা (মহত্তত্ত্বাদি অনাত্ম জগৎ) কল্পনা করিয়া সৃষ্ট বস্তুর প্রকাণ্ড ভাগকে "ইদং" মহত্তত্ত্বাদিকে "অহং" অদ্বয় এবং অজড়কে "তৎ" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মোক্ষ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করেন; এবং ইহাই অবিদ্যা বা মায়াময় (ভ্রান্তি জ্ঞানের) মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জান। এক্ষণে বলিতে পার যে, অবিদ্যাকে "ভ্রান্তি জ্ঞান" বলে কেন? তাহার কারণ এই যে অবিদ্যা হইতে মহত্তত্ত্বের বিকাশ হইলে, সেই মহত্তত্ত্ব একই "অদ্বয় অজড়-কেই" ত্বং (তুমি) ও তৎ (তিনি) এইরূপ পৃথক নিশ্চয় করে বলিয়াই অর্থাৎ স্ব ত্বং ও তৎ পদের আদ্যন্তার্থ জানে না বলিয়াই ভ্রান্তিজ্ঞান বলে।

এই আমাদের জাগ্রদবস্থা কেমন করিয়া আমরা জানিতে পারি?—ইহার উত্তরে কি বলিবে না যে, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি জীবের এই তিন পৃথক অবস্থা আছে বলিয়াই জাগ্রদবস্থাদি জানা যায়। যেমন জীবের স্বপ্ন ও সুষুপ্তি না থাকিলে মহত্তত্ত্বান্তর্গত নিশ্চয়াত্মক সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও অহঙ্কার জাগ্রদ-বস্থায় নিশ্চয় থাকিতে পারিত না, তেমনই ব্রাহ্ম অবিদ্যা কল্পনা না হইলে ব্রহ্মের স্বভাব (সৎ, চিৎ, আনন্দ) অর্থাৎ আপনি আপনার তত্ত্ব জানিতেন না, এই আত্মতত্ত্বাবগত হওয়াই মোক্ষ বাচ্য হয়।

আলোক প্রকাশিত থাকে বলিয়াই অন্ধকারের সহিত সাম্যে তাহার প্রকাশ বুঝিতে পারি; অবিদ্যার সহিত সাম্যে ব্রহ্মের সেরূপ প্রকাশ হয় না। কারণ ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ, তাঁহার অপ্রকাশ হয় না, যাহা প্রকাশ তাহার

আবার প্রকাশ কি? অবিদ্যার সহিত সাম্যে ব্রহ্মের কিরূপ প্রকাশ বুঝিতে হইবে?—এখানে প্রকাশের (জ্ঞানময়ের) প্রকাশ (জ্ঞান) অর্থাৎ, আপনি আপনার তত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) অবগত হওয়া (মোক্ষ) বুঝিতে হইবে।

যেরূপ জীবাত্মা জ্ঞানময় হইয়াও আপনাকে জানে না, আপনাকে জানে না বলিয়াই অনাত্ম বিষয়ে "আমি আমার" সম্বন্ধ পাতাইয়া উহাতেই সুখান্বেষণ করে, যদি আপনার তত্ত্ব (স্বভাব) জানিত তাহা হইলে অনাত্ম শরীরাদিতে আমি ও আমার ও জ্ঞান হইত না, এবং বিষয়ে সুখ (সুখ আত্মারই ধর্ম্ম) অন্বেষণ করিত না। এই অনাত্ম দেহে আমি (অহং) জ্ঞান ও বিষয়ে সুখ লাভই অজ্ঞান ("অনিত্যা শুচি দুঃখানাত্মাম্ নিত্য শুচি সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা"); অর্থাৎ আপনাকে আপনি (আত্মতত্ত্ব) জ্ঞাত নহে। এই আত্মতত্ত্ব (আপনাকে আপনি) জ্ঞাত হওয়াই অজ্ঞান নাশ, এই অজ্ঞান নাশই প্রকাশ, অর্থাৎ যেরূপ আলোক অপ্রকাশ থাকে বলিয়া অন্ধকারের সহিত সাম্যে আলোকের প্রকাশ বুঝা যায়, সেইরূপ আত্মা প্রকাশময় (জ্ঞানময়) হইলেও অবিদ্যার (ভ্রান্তি জ্ঞানের) সহিত সাম্যে তাঁহার প্রকাশ অর্থাৎ আপনি আপনার তত্ত্বানুভব করেন; আত্মজ্ঞানই আত্মার প্রকাশ জানিবে।

ব্রহ্ম অবিদ্যাশ্রয় না হইলে ব্রহ্ম আপনাকে আপনি (আত্মতত্ত্ব) জ্ঞাত হইতে পারেন না। এই অবিদ্যা হইতেই ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি (অপবর্গ) হয়; অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যা প্রভাবে স্বয়ংই "জ্ঞান", "জ্ঞাতা", এবং "জ্ঞেয়" (ত্রিপুটী) হইয়া মোক্ষলাভ (স্বরূপে অবস্থিতি) করেন। সাংখ্যের সৃষ্টির মুখ্যফলের সহিত অবিদ্যার মুখ্যফলের ঐক্য আছে, অতএব সাংখ্যবাদীর প্রকৃতির সহিত বেদান্তের অবিদ্যার আমরা কোন অনৈক্য দেখিতেছি না। ঐ অবিদ্যা সাংখ্যে প্রকৃতি শব্দে খ্যাত জানা গেল। ব্যবহার ক্ষেত্রে যত বস্তু আছে, স্থূল দৃষ্টিতে তাহাদের ধর্ম্ম ও আখ্যা পৃথক২ বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ সকলই একধর্ম্মী, অর্থাৎ যেরূপ তাড়িত (Electricity) তাপ (Heat) এবং আলোক (Light) একই বস্তু, এক ইথারের (Ether ভূতাকাশের) পৃথক২ প্রকাশ (Different vibration of atoms) মাত্র; সেইরূপ যাবদীয় পদার্থই একই পদার্থের পৃথক২ প্রকাশ মাত্র। ঐ আকাশও আবার ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার একটী পৃথক প্রকাশ, আর একটু তলাইয়া দেখিলে, ঐ অবিদ্যাও নাই (অভাব), কেবল মাত্র একটী নিত্য বিদ্যমানতা আছে, সেই বিদ্যমানতাই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই ঐন্দ্রজালিক, আর অবিদ্যা তাঁহার ইন্দ্র-

জাল; ঐন্দ্রজালিকই সত্য, ইন্দ্রজাল মিথ্যা; যাহা মিথ্যা, তাহা সেই অভাব, অতএব মায়া অভাব মাত্র জানিবে।

যেরূপ স্বপ্নকালে স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বেশ বুঝা যায় যে, স্বপ্ন মিথ্যা (অভাব); সেইরূপ মায়াকালে মায়া সত্য বলিয়া পরিবোধ হয়, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি (আত্মজ্ঞান) হইলে মায়া মিথ্যা (অভাব) জানিবে। ইতি।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর লিখিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে শারীরিক অসুস্থতাদি নানাবিধ কারণ বশতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপন অনেক দিন অবধি প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং পূর্ব্বে যে কি কথা হইয়াছে তাহা হয়ত অনেকের স্মৃতিপথ অতিক্রম করিয়াছে। এমন স্থলে আমি নিজের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর লিখিলাম বটে, হয়ত অনেক পাঠক তাহাতে অন্ধকার দেখিবেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহারই একটু সংক্ষেপ করিয়া দিতেছি।

নানা প্রকার মনুষ্যসঙ্কীর্ণ কোন একটি সভায় ধর্ম্মনির্ণয়ের প্রসঙ্গে একজন নাস্তিক এবং একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত বাদ প্রতিবাদ হই-তেছে। নাস্তিক বাদ করিতেছেন, পণ্ডিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। প্রথমে পরমেশ্বর লইয়া কথা হইতেছে। পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? এই কথা নাস্তিক জিজ্ঞাসা করিলে, পণ্ডিত বলি-লেন এই সচরাচর বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব এবং অদৃষ্টের সহকারিতা ব্যতীত এই জগৎ কখনই এইরূপ সুশৃঙ্খলভাবে দৃষ্ট হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া নাস্তিক বলিল কেন পরমাণুপুঞ্জ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সমষ্টি এবং ব্যষ্টি (পৃথক্ পৃথক্) ভাবে পরমাণুই জগতের কারণ। ঈশ্বর কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই। পরমাণুর সংযোগ বিশেষেই জগতের

বৈচিত্র্য। উহাদের সংযোগের স্থায়িতার সহিত জগতের স্থিতি এবং উহাদের সংযোগের বিশ্লেষেই জগতের ধ্বংস হয়। পণ্ডিত বলিলেন সকলই স্বীকার করিলাম, কিন্তু দুই একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম। তুমি যে পরমাণুর কথা বলিতেছ সে পরমাণু গুলি নিত্য, কি জন্য? যদি জন্য হয় তবে নিজেই উৎপন্ন হইয়াছে অথবা অন্য কেহ তাহাদের উৎপাদন করিয়াছে? যদি নিজে উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে কোন্ সময় তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে? এবং তাহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বেই বা কি অবস্থা ছিল? যদি অন্য কেহ তাহাদিগকে উৎপন্ন করিয়া থাকে তবে সে লোকটা কে? আর যদি পরমাণু নিত্য হয় তবে তাহারা কি অন্য দ্বারা চালিত হয়? অথবা নিজে নিজেই কর্ত্তা? যদি অন্য দ্বারা চালিত হয় তবে এই সৃষ্টি কার্য্যে কে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছে? আর যদি নিজে নিজেই কর্ত্তা হয় তবে তাহারা চেতন বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ অচেতনেরা কখনই এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে শৃঙ্খলতা রাখিতে সক্ষম হয় না। এবং সেই পরমাণুপুঞ্জময় নিখিল বিশ্বেরই অচেতনতাপত্তি হইয়া উঠে। অতএব তাহারা চেতন। কিরূপ চেতন? সকল পরমাণুই চেতন বা পরমাণু বিশেষ চেতন? যদি সকল পরমাণুই চেতন হয় তবে গাছপালা পর্ব্বত ইহাদের চৈতন্য নাই কেন? যদি পরমাণু বিশেষেরই চৈতন্য স্বীকার কর, তবে যে পরমাণু বিশেষের সংযোগে চেতন মনুষ্যাদি জীব নিচয় উৎপন্ন হয় সেই পরমাণু বিশেষের সেইরূপ সংযোগ দৃশ্যমান থাকিতে মৃতদেহে চৈতন্য থাকে না কেন?। একটু বিবেচনা করিয়া আমার এই কথা গুলির সদুত্তর প্রদান কর এবং ইহাও ভাবিয়া দেখ।

কুম্ভকার যেমন যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেইখানে সেইরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া ঘটাদিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী করে, সেইরূপ এই বিশ্বমণ্ডলকে যেখানে যেটি আবশ্যক সেখানে সেটি দিয়া কে নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং কোন বৃহৎ পক্ষীর নখ বা চঞ্চুপুট দ্বারা আবদ্ধ কাষ্ঠ যেমন শূন্যোপরি স্থিতি করে সেইরূপ কার শক্তি দ্বারা ধৃত হইয়া এই বিশ্বমণ্ডল শূন্যোপরি বিরাজ করিতেছে।

আর এই জগতের প্রত্যেক কার্য্যেই যে একটি নিয়মাধীনতা দেখিতেছি সে নিয়মই বা কোথা হইতে কিরূপে কাহাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? কে এমন প্রবলবান যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়ম সকল মস্তকে মালার মত বহন করি-

তেছে। এই জগতের কবে সৃষ্টি হইয়াছে, কবে লয় হইবে, এবং অবস্থিতিই বা কতদিন? ইহাই বা ঠিক্ ঠিক্ কে জানিতে সক্ষম হয়? কিন্তু সমুদয় বিশ্বকার্য্যের তত্ত্বাভিজ্ঞ একজন কর্ত্তা স্বীকার করিলে আর কোন গোলযোগই থাকে না। এই কথা শুনিয়া নাস্তিক একটু হাস্য করিয়া বলিল এই বিশ্ব কার্য্যেত আদৌ কিছু গোলযোগ দেখিতে পাই না।

দেখ যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ লতাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া পুষ্প ধারণ করে, সেই পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয় সেই ফল হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হইয়া এইরূপ বৃক্ষাদি সৃজন করে, ক্রমাগত যেমন এই বীজাঙ্কুর দ্বারা অবিশ্রান্ত ভাবে সৃজন কার্য্য চলিতেছে, সেরূপ পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ এবং বিশ্লেষ নিবন্ধন বারম্বার এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্পাদিত হইতেছে, তবে যে তুমি চৈতন্যের কথা বলিতেছ, তাহা দ্বিতীয় পরমাণু বিশেষের সংযোগ বিশেষকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিব। যেমন পোড়া সম্বুকে জলক্ষেপ করিলেই আপনা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শিরা শোনিতাকারে পরিণত পরমাণু পুঞ্জের সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া যতকাল অবধি সেই সংযোগ সেই ভাবে থাকে ততকাল চৈতন্য থাকে তাহার পর আপনিই লীন হয়।

পণ্ডিত বলিলেন। ভাল. স্বীকার করিলাম শিরাশোণিত সংযোগ বিশেষে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু একটি কথা আছে, শিরাশোণিত সংযোগওত ক্ষণেক্ষণে নূতন নূতন প্রকার হইয়া থাকে, কারণ আমাদের শরীরাভ্যন্তরে ভোজ্য ও পেয় বস্তুর সার হইতে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন শোণিতের উৎপত্তি হইতেছে। সেই নূতন শোণিতের সহিত শিরার সংযোগেতে ও নূতন রূপ ধারণ করে; কাজেই তাহা হইতে চৈতন্যেরও প্রতিক্ষণে নূতনতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এখন বিবেচনা কর প্রতিক্ষণে যদি নূতন চৈতন্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে পূর্ব্বক্ষণে দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত বস্তুর পরক্ষণেই স্মরণ হওয়া কি উচিত হয়? বাল্যাবস্থায় অনুভূত বস্তুর যৌবনে স্মরণ করার কথাত দূরে রহিল। আরও দেখ, শোণিত যেমন নানা প্রকার শোণিত হইতে উৎপন্ন, চৈতন্যেও নানা প্রকার হওয়া উচিত; তাহা হইলে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না কেন! ফলতঃ এক বস্তু ত সকল সময় একই প্রকার দেখায়। এই বস্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অনুভবই তোমার মতের খণ্ডন করিতেছে। আরও দেখ—

আত্মা নিত্য চৈতন্যময়, উহা শরীরের গুণ নয়; কারণ বাল্যে অভ্যস্ত বিদ্যা বৃদ্ধে শারিরিক বৃত্তি ক্ষীণ হইলেও তাহার জ্ঞানের কোন রূপ হ্রাস হয় না। ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে একই আত্মা বাল্য যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থার অনুসরণ করে। তবে উহার দেহের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় কখন কখন দেহের গুণ সকলকে নিজের গুণ বলিয়া ভ্রম করে। আর ও দেখ সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গের উত্থান হয়, সেই রূপ চৈতন্যের সমুদ্রস্বরূপ আত্মা হইতে সঙ্কল্প, অহঙ্কার স্মরণ, বিজ্ঞাপন, নিশ্চিতি, স্পর্শ এবং নানাবিধ অনুভব রূপ চৈতন্যের উদয় হয়। সেই মূল চৈতন্য আত্মা যদি জন্য হয় এবং অন্য জড় বস্তুর সংযোগে তাহার উৎপত্তি হয়, তবে মৃতদেহে চৈতন্য উৎপাদনের জন্য সেই সকল জড় বস্তুর সংযোগ করনা কেন ?

পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া নাস্তিক বলিল আচ্ছা চৈতন্যময় একটী জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলাম, ঈশ্বর কিন্তু স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই।

পণ্ডিত। যেমন কান টানিলে মাথা আসে সেইরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই সেই সঙ্গে ঐ জীবের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সাকারোপাসনা।

ঈশ্বরের সাকারত্ব, সাধকদিগের কল্পিত নহে, কিম্বা সাধকদিগের নিমিত্ত যে ঈশ্বর সাকার হইয়াছেন, তাহাও নহে। ঈশ্বর সর্ব্বদাই সাকার, তাঁহার সাকারত্ব নৈমিত্তিক নহে। তিনিও নিত্য, তাঁহার সাকারত্বও নিত্য। সত্বাদি ত্রিশক্তিই ঈশ্বরের আকার বা মূর্ত্তি বা শরীর বা দেহ। তোমার মনে যদি আকার শব্দার্থ—চক্ষুগ্রাহ্যরূপ ক্রিয়া মাত্র, বা রসনাগ্রাহ্য রসক্রিয়া মাত্র, বা নাসিকাগ্রাহ্য গন্ধক্রিয়া মাত্র বা ত্বক্‌গ্রাহ্য স্পর্শক্রিয়া অথবা শ্রবণ গ্রাহ্য শব্দক্রিয়া মাত্র বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহাতেও কোন হানি নাই। রূপাদি ক্রিয়াও অখণ্ডরূপ দণ্ডায়মান ত্রিশক্তিরই স্বরূপ। তুমি আকার বলিয়া যাহা মনে করিবে তাহাই ঈশ্বরের অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড আকার। আকার শব্দে যদি তুমি সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত শরীর মনে কর, কিম্বা তোমার চিন্তা বিষ-

তাপর দ্বিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি মূর্ত্তি মনে কর, তাহাও ভগবানের অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড মূর্ত্তি। তুমি চিন্তাকালীন যে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি রূপাদি ক্রিয়ার অনুভব করিতেছ, উহা মিথ্যা বা কিছুইনা নহে। মিথ্যা বা কিছুইনা হইলে তুমি কিরূপে অনুভব করিতেছ? ফলতঃ উহাও সেই ত্রিশক্তি, সুতরাং ভগবানের মূর্ত্তিই হইল। আর্য্যেরা যে পাষাণ মৃত্তিকাদি দ্বারা মূর্ত্তি রচনা করিয়া থাকেন, তাহাও পরমেশ্বরের অপরিচ্ছিন্ন-অখণ্ড-মূর্ত্তি বা শরীর। মাতৃগর্ভস্থ কতকগুলি শিশু, যে ঐসকল মূর্ত্তি দেখিয়া "ক্ষুদ্র২" "স্থূল২" "জড়২" "সৃষ্ট২" মনে করতঃ খেলার উপযুক্ত পুত্তলিকা বিবেচনায় আহ্লাদের সহিত দলে দলে করতালি দিতেছে, তাহাতেতুমি বিরক্ত বা মুগ্ধ হইও না। বালকেরা যদি একটি কালমান (ঘড়ি) যন্ত্র কি একটি তড়িদ্ভু (ব্যাটারি) যন্ত্র দেখিতে পায়, তবে তাহাকে খেলার বস্তু মনে করিয়া আহ্লাদের সহিত করতালিকাদি করিয়া থাকে; এ নিমিত্ত কি যিনি, অগাধ চিন্তাসাগর সমুৎপন্ন রত্নস্বরূপ ঐসকল বস্তুর প্রকৃত-মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, তিনিও বালকদিগের সহিত মুগ্ধ হইয়া উহাকে খেলনা মনে করিবেন? বালকেরা কোন বস্তুর মর্ম্ম জ্ঞাত নহে, তাহাদিগের ক্রীড়াই মর্ম্ম, ক্রীড়াই ধর্ম্ম, যাহা দেখিতে পায়, তাহাই বালকদিগের ক্রীড়ার উপকরণ; কিন্তু জ্ঞানবানদিগের স্বভাব, তাহার বিপরীত। পাঠক! যদি "পুতুল পুতুল" বাদীদিগের শিশুতার পরিচয়, চাও, তবে অবধান কর। "পুতুল পুতুল" বাদীরা পরমেশ্বরকে জ্ঞান, ইচ্ছা, শান্তি ও সন্তোষাদি যুক্ত বলেন; অথচ মৃৎপাষাণাদি মূর্ত্তি দেখিলে "পুতুল" বলিয়া থাকেন। কিন্তু পরমার্থতঃ ইচ্ছাদিযুক্ত বলা, আর সাকার বা সশরীর বা মৃৎপাষাণাদি মূর্ত্তি স্বরূপ বলা, একই কথা। ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্তই শক্তি বা ক্রিয়া, মৃৎপাষাণাদি মূর্ত্তিও সেই ক্রিয়া, তবে আর এক হইবে না কেন? ইচ্ছাদির ক্রিয়াত্বে যদি সন্দেহ হয়, তবে নিজ শরীরেই অনুভব দ্বারা নিশ্চয় কর। মনে কর! তুমি হস্ত কিম্বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি কোন একটি ক্রিয়া গ্রহণ করিতেছ, ইহাতে তোমার প্রথমে ইচ্ছা হইয়াছিল, তৎপরে কৃতি বা যত্ন, তাহার পর চেষ্টা হইয়াছিল, সর্ব্বশেষে এই ফল হইতেছে; তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই? এক্ষণে নিশ্চয় কর, তোমার মস্তিষ্কস্থিত ত্রিশক্তি স্বরূপা বুদ্ধি, বহিঃস্থ ক্রিয়া সকলের নিমিত্ত আকর্ষণ-প্রবলা হইয়াছে; ঐ আকর্ষণ-প্রবলতা তোমার মস্তিষ্ক হইতে করাঙ্গুলি বা চক্ষুরাদির গোলকাদি পর্য্যন্ত হইলে, বহিঃস্থ রূপাদি ক্রিয়ার সহিত একতা

হইল, এই একতাকেই গ্রহণ করা বা গ্রহণ বলাযায়। উক্ত আকর্ষণ-প্রবলতা যে সময়ে বুদ্ধিতেই অবস্থিতি করে, তখন ঐ আকর্ষণ বা রজঃ ক্রিয়াকে ইচ্ছা, এবং মস্তিষ্কের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অবস্থিতি কালীন কৃতি বা যত্ন বলা যায়। আর মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ু পথদ্বারা অঙ্গুলি বা চক্ষু আদি সীমাপর্য্যন্ত অবস্থিতি কালীন চেষ্টা বলা যায়। এই প্রকার কোন বস্তুকে উৎক্ষিপ্ত, অবক্ষিপ্ত, পরিত্যক্ত বা অপসৃত করা কালীন অপসারণ বা তমঃ ক্রিয়াই ইচ্ছা, কৃতি ও চেষ্টা নামে অভিহিত হয়। এবং উভয় ক্রিয়াকে সংযত করাকালীন সংযমন বা সত্ব ক্রিয়াই ইচ্ছাদিনামে কথিত হয়। জ্ঞান ও সন্তোষাদিও ক্রিয়া মাত্র, তাহা প্রতিপাদনের আর আবশ্যক নাই। রূপাদিও শক্ত্যাত্মক, (পূর্ব্বেই ইহার প্রতিপাদন করিয়াছি)। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাদি যুক্ত হইলে, রূপাদি আকার বা শরীরবান্ না হইলেন কেন? শক্তি ও চৈতন্য এই উভয়েরই যখন অংশ, খণ্ড ও পরিচ্ছেদ বা সীমা নাই, তখন ইচ্ছাদি হইতে রূপাদিকে এবং রূপাদিযুক্ত চৈতন্য হইতে ইচ্ছাদিযুক্ত চৈতন্যকে খণ্ড করিবার আর উপায় কি? যাহা তুমি ইচ্ছাদি বলিয়া স্থির করিতেছ, তাহাইত রূপ! কেবল মাত্র অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন শক্তিত্রয়ের সম্বন্ধের তারতম্যে নানাপ্রকার আভাসমান হইতেছে।

যেপ্রকার অন্নাদি নামক রূপ স্পর্শাদি ক্রিয়া সম্বন্ধ তারতম্যে মনুষ্য, বিড়াল ও কুক্কুরাদি আকার রূপ স্পর্শাদি ক্রিয়া দেখিতেছ, এবং স্পর্শাদি (বায়ু আদি) ক্রিয়ার সম্বন্ধ তারতম্যে রূপাদি (অগ্নি আদি) ক্রিয়া দেখিতেছ, সেইরূপ এই ত্রিশক্তি বা ত্রিক্রিয়ারও সম্বন্ধ তারতম্যে নানাপ্রকার দেখিতে পাও। সম্বন্ধ বিশেষে ত্রিশক্তি একস্থানকে রূপাদি ক্রিয়া বলিয়া ব্যবহার করিতেছ, অপর সম্বন্ধ বিশেষে ত্রিশক্তিরই স্থানান্তরকে ইচ্ছাদি বলিয়া ব্যবহার করিতেছ। কখনও বা ত্রিশক্তির একস্থানকেই সম্বন্ধ বিশেষে একবার রূপাদি ও একবার ইচ্ছাদি বলিয়া ব্যবহার হইতেছে। মনেকর, তুমি রামদাসকে দেখিতে ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা করিলে, তৎপরে তাহাকে দেখিতে পাইলে, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, তুমি পূর্ব্বক্ষণে যে আকর্ষণ প্রবলা ত্রিশক্তি পর্ব্বকে ইচ্ছাদিভাবে অনুভব করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই ইচ্ছাদি নামক ত্রিশক্তি পর্ব্বকেই রামদাসীয় রূপাকার ত্রিশক্তি পর্ব্বের আকার প্রাপ্ত হওয়ায় রূপাকারে অনুভব করিতেছ। এইরূপ স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ চিন্তাদিতেও বলিতে হইবে। স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ চিন্তাদিতে

বাহ্য রূপাদির অভাব স্বত্বেও আমাদিগের ইচ্ছাদি নামক ত্রিশক্তি পর্ব্ব পরস্পরের সম্বন্ধ বিশেষে রূপাদি আকারে আভাসিত হইতে থাকে। এই প্রকারে অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড শক্তিত্রয়ই পরস্পর সম্বন্ধের তারতম্যে, নানা-ভাবে আভাসমান হইতেছে। সম্বন্ধের ইতর বিশেষে ত্রিশক্তিই ইচ্ছা, ত্রিশক্তিই যত্ন ও চেষ্টাদি এবং ত্রিশক্তিই রূপক্রিয়া, রসক্রিয়া, গন্ধক্রিয়া, স্পর্শক্রিয়া ও শব্দক্রিয়াদি রূপে অনুভূত হইতেছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বরকে ইচ্ছাদিযুক্ত বলিলে রূপাদিযুক্ত বলা হইল কিনা এবং পুতুল পুতুল-বাদী দিগের বালকত্ব প্রকাশ হইল কিনা। যদি বল, ঈশ্বরের ইচ্ছাদি এই ত্রিশক্তি স্বরূপ নহে, তাঁহার ইচ্ছাদি ত্রিশক্তির অতিরিক্ত। তাহাহইলে আমরা নিঃশঙ্ক ও অকপট চিত্তে বলিতেছি যে ঈশ্বরের তাদৃশ ইচ্ছাদি দ্বারা আমাদের বা জগতের কোনই প্রয়োজন নাই। তিনি সেই ইচ্ছাদি লইয়া তাঁহার জন্মান্ধ বালকগুলির সহিত জগতের বাহিরে থাকুন। জগৎ শক্তি স্বরূপ; শক্তির সম্বন্ধ তারতম্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি নানাপ্রকার অনুভব হইতেছে। এই শক্তিই সম্বন্ধ বিশেষে ভগবানের ইচ্ছা, রূপ ও শরীরাদি। শ্রুতি এই শক্তি ও চৈতন্যের একতাকে ঈশ্বরত্ব বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া-ছেন। পরস্পর অধ্যাস দ্বারা একতাপন্ন এই শক্তি-চৈতন্য হইতে জগতের সকল প্রকার অবস্থা (সৃষ্টি ইত্যাদি) হইতেছে, এনিমিত্ত ইহাঁকেই শ্রুতি ও দর্শন সকল ঈশ্বর বলিয়াছেন। এই একতাপন্ন শক্তি পুরুষকে (চৈতন্যের এক নাম পুরুষ) কখন চৈতন্য প্রাধান্যে, কখনও শক্তিপ্রাধান্যে লক্ষ্য করিয়াছেন। যখন চৈতন্য বা পুরুষ প্রাধান্যে লক্ষ্য করা হয়, তখন শক্তি বিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া লক্ষিত হয়; এনিমিত্ত তখন ঈশ্বর এই পুংলিঙ্গে নির্দ্দেশ করা হয়। যখন শক্তি প্রাধান্যে লক্ষ্য করা হয়, তখন চৈতন্য বা পুরুষ বিশিষ্ট শক্তি বলিয়া লক্ষিত হয়, এনিমিত্ত তখন ঈশ্বরা এই স্ত্রীলিঙ্গে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর বলুন আর ঈশ্বরাই বলুন সাকার ভিন্ন আর সম্ভাবনা কি?

ঈশ্বর নিত্যই সাকার, নিত্যই শরীরী, কখনই নিরাকার বা অশরীরী হয়েন না। শ্রুতির যে কখন কখন ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই;—"সাকার" বলিলে যে আকার যুক্ত বা আকারবান এই অর্থের প্রতীতি হয়, ইহাতে দুই প্রকার তাৎপর্য্য আছে। এক,—আপনাতে আপনার ভেদ কল্পনা পূর্ব্বক আপনাতেই আপনার সম্বন্ধ, ২য়—অপরে

অপরের সম্বন্ধ। আমরা যখন প্রাসাদাদিকে সাকার বলিয়া থাকি, তখন প্রথম তাৎপর্য্য গৃহীত হয়, আর যখন আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তোমাকে আমাকে সাকার বলিয়া থাকি, তাহাতে দ্বিতীয় তাৎপর্য্য গৃহীত হয়। মনে কর; প্রাসাদ হইতে প্রাসাদের আকার বিভিন্ন নহে, ফলতঃ প্রাসাদও যাহা প্রাসাদের আকারও তাহাই, অথচ আমরা বলিতেছি "প্রাসাদ সাকার বা আকার বিশিষ্ট।" কিন্তু প্রাসাদ নিজেই নিজ বিশিষ্ট কিরূপে হইবে? সুতরাং প্রাসাদেই প্রাসাদের ভেদ কল্পনা করিয়া প্রাসাদেই প্রাসাদের সম্বন্ধ বুঝাইল। এইমতে "প্রাসাদ সাকার" ইহার সারার্থ এই হইল যে, প্রাসাদ আকার হইতে অভিন্ন। তোমাকে আমাকে যে সাকার বলিতেছি, ইহা তদ্রূপ নহে। তুমি কিম্বা আমি বলিলে যখন চৈতন্যকে লক্ষ্য করা হয়, তখন তুমি আমি আর শরীর বা আকার বিভিন্ন বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সুতরাং তোমাকে বা আমাকে সাকার বা সশরীর ও আকার বিশিষ্ট বলিলে অপরের সম্বন্ধ বুঝায়। "ঈশ্বর" শব্দ দ্বারাও তিন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১ম,—একতাপন্ন শক্তি চৈতন্য, ২য়,—কেবল চৈতন্য, ৩য়,—কেবল শক্তি। পরন্তু প্রশ্ন কর্ত্তার যেন এই আশঙ্কা না হয় যে, ইহা দ্বারা তিনজন ঈশ্বর অবধারিত হইল, কারণ শক্তি ও চৈতন্যের প্রত্যেক হইতে কোন কার্য্য নিষ্পত্তি হইতে পারে না, একতাপন্ন শক্তি চৈতন্য হইতেই যাবৎ কার্য্যের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। একতাপন্ন শক্তি চৈতন্যই চৈতন্যাংশে নিমিত্ত কারণ, আর শক্ত্যাংশে উপাদান কারণ। এই উপাদানতা, আর নিমিত্ততা এতদুভয়, কেবল শক্তিতে বা কেবল চৈতন্যে সম্ভবে না। কারণ দ্বয়ের মধ্যেও কেবল একতর কারণ দ্বারা কোন কার্য্য নিষ্পত্তি হইতে পারে না; সুতরাং কেবল চৈতন্যের বা কেবল শক্তির সম্পূর্ণ সামর্থ থাকিল না। কিন্তু আংশিক সামর্থ উভয়েরই আছে। অতএব এই আংশিক সামর্থ গ্রহণ করিয়া কেবল প্রকৃতি বা কেবল চৈতন্য ও ঈশ্বর শব্দের বিষয় হইতে পারে। আর যখন সম্পূর্ণ সামর্থ গ্রহণে প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন ঈশ্বর শব্দে একতাপন্ন শক্তি চৈতন্যই লক্ষিত হইয়াছে। অতএব তিনজন ঈশ্বর প্রতিপাদন করা হয় নাই। অতি সুনিপুণ ভাবে অনুভব করিতে পারিলে, নিজ শরীরই ইহার প্রমাণ পাইবে। যদি না পার, তবে লূতাকীটাদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। লূতাকীটাদি [illegible] নিজ শরীর শক্তিকে তন্তু [illegible] রূপে পরিণত করিতেছে, তাহা[illegible]ককই (একতাপন্ন শক্তি চৈতন্য)

নিমিত্ত ও উপাদান ; তাহাতে বিশেষ এই যে চৈতন্যাংশে নিমিত্ততা, আর শক্ত্যাংশে উপাদানতা।

এই সাকারের অর্থদ্বয় মধ্যে শ্রুতি ও দর্শন যখন প্রথম অর্থ এবং ঈশ্বরাদি শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আত্মাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"— (আত্মা, শব্দক্রিয়া বা স্পর্শক্রিয়া বা রূপাদিক্রিয়া হইতে অভিন্ন নহেন, তিনি শক্তিরূপ আকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন) ইত্যাদি বলিয়াছেন। আবার যখন সাকারের এবং ঈশ্বরের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আত্মাকে "যঃ পৃথিব্যা অন্তরোযস্য পৃথিবী শরীরং"— (যিনি জগৎ নামক শক্তি হইতে বিভিন্ন বস্তু, জগৎ নামক শক্তি যাঁহার শরীর) ইত্যাদি শত শত স্থানে বলিয়াছেন। এবং সাকার ও ঈশ্বর এতদুভয়েরই প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া, "ভূস্তে আদির্মধ্যংভুবঃ, স্বস্তেশীর্ষং বিশ্বরূপোঽসিব্রহ্ম। একস্ত্বং দ্বিধা—" (ভগবন্! এই ত্রিভুবনই আপনার আকার বা শরীর বা রূপ, ইহার ভূলোক আপনার প্রথম অংশ (পাদভাগ) এবং মধ্যভাগ ভুবোলোক আর শীর্ষভাগ স্বলোক। সদাশিব! আপনি একাকীই, (শক্তিচৈতন্যভেদে) দুই প্রকার) ইত্যাদি বলিয়াছেন। কখন বা সাকারের প্রথম অর্থ এবং ঈশ্বরের তৃতীয়ার্থ গ্রহণ করিয়া "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।"— (স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ স্বরূপা এবং আপনা হইতে অভিন্ন নিখিল প্রজার প্রসব কর্ত্রী একশক্তিকে) ইত্যাদি বলিয়াছেন। আমি সাকার শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্থ এবং ঈশ্বর শব্দেরও প্রথম ও দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করিয়া বলিলাম, ঈশ্বর সর্ব্বদাই সাকার, অর্থাৎ রামদাস শ্যামদাসকে সাকার বলিলে যে প্রকার প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রতিপাদিত করিলাম। রামদাস কি শ্যামদাস বলিলে যে, সেই সেই রূপে আভাসমান-একতাপন্নশক্তি চৈতন্যকে বুঝায়, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ নাই; কারণ সাধারণতঃ ইহাই ব্যবহার হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি সাকারের প্রথম অর্থ আর রামদাস শব্দে তাদৃশ একতাপন্ন শক্তি চৈতন্যকে গ্রহণ কর, তাহাতেও রামদাস সাকার ভিন্ন নিরাকার নহে; আর যদি সাকার শব্দের দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করিয়া, রামদাসের চৈতন্য মাত্র লক্ষ্য কর, তাহাতেও রামদাস সাকার। পরন্তু যদি সাকারের প্রথমার্থ ও রামদাসের চৈতনার্থ গ্রহণ কর, কিম্বা [illegible] দ্বিতীয়ার্থ ও রামদাসের শক্ত্যার্থ [illegible] গ্রহণ কর তাহাহইলে রা[illegible]স তুমি ও আমি সকলই নিরা-

কার। ঈশ্বরেরও যদি দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করিয়া সাকারের প্রথমার্থ গ্রহণ কর, কিম্বা ঈশ্বরের তৃতীয়ার্থ লক্ষ্য করিয়া সাকারের দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ কর তবে ঈশ্বরও নিরাকার।

ঈশ্বরের সাকারত্ব সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলাম। পরন্তু যদি কেবল কৈলাসপতি বা বৈকুণ্ঠনাথ বা ব্রহ্ম-লোকনাথকে লক্ষ্য করিয়া সন্দেহ হয়, তাহা হইলে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ভগবান্ সেই রজতগিরি-নিভ-চারুচন্দ্রশেখরাদি রূপে, কৈলাসাদি স্থানে আছেন কি না, তাহার বিচার এস্থলে আমাদিগের সর্ব্বথা নিস্প্রয়োজন। (প্রবন্ধান্তরে তাহা বুঝান যাইবে) কারণ তদ্দারা আমাদিগের উপস্থিত প্রবন্ধের বোধসুগমার্থে কোনই উপকার বা অপকার নাই। উপাসনা যখন নিজ হৃদয়ের সম্বন্ধ, তখন আমরা আপন হৃদয়কে কৈলাস বা বৈকুণ্ঠাদি করিয়া, যদি রজতগিরিনিভাদির রূপে দেবদেবকে স্থাপিত করিতে পারি, তবেই কৃতকার্য্য হইলাম। উপাসনার উদ্দেশ্যও তাহাই। আর যদি হৃৎকৈলাস শূন্য থাকে তবে কৈলাস পর্ব্বতে কেন, গৃহমধ্যবর্ত্তী হইয়াও ভগবান্ উপাসকের উপকারাপকারের কেহই নহেন। উপাসক যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক অচল-চিত্ত-কৈলাসে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমদ্-গুঞ্জন-মধুকর-নিকর-ক্ষণ চুম্বিত-ক্ষণ লম্বিত-প্রচ্ছুরিত-মনোহর-সৌরভাগার মালতি-যূতী-বকুল-পাটল-লবঙ্গ প্রমুখ-সর্ব্বর্ত্তু-সম্ভব-কুসুম-শোভিত-লতা-পাদপ-কদম্ব সমাকীর্ণ উদ্যানোদরে, চিত্তোন্মাদক আমোদপ্রভব-পুষ্প-স্তবকিনী-বল্লীকৃত. বেষ্টন দেব-দারু-তরু-নিকর-তলে, সমতল-বিশদ-মসৃণ-পাষাণ-প্রাঙ্গণে, কুঞ্জ কুটীরে, সুরম্য বেদিকোপরি, শার্দ্দূল-চর্ম্মাসনে, পদ্মাসনাসীন ভগবান্ সদাশিবকে নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করিতে পারে; তখন কৈলাস নামক পর্ব্বতে তদাকারে ভগবান্ থাকা এবং না থাকার সহিত উপাসকের হানি কি? যদি, বল যে "ভগবান্ তত্তদাকারে কৈলাসাদি স্থানে না থাকিলে আমাদিগের মিথ্যা কল্পিত আকার চিন্তার ফল কি?" তাহা হইলে এই বলিতেছি, ভগবান্ কৈলাসাদি স্থানে না থাকিলেও চিত্তস্থিত তাঁহার ত্রিলোচনাদি আকার, মিথ্যা হইতে পারে না; এবং তাহার ফলও অবশ্যই হইবে। সম্বন্ধ বিশেষে ত্রিগুণাত্মক চিত্তের আকার বিশেষের নাম চিন্তা (পূর্ব্বোক্ত সকল মনেকর), সুতরাং সেই আকার মিথ্যা নহে। অতএব সেই ত্রিলোচনাকার চিত্তকে ঈশ্বর ভাবে লক্ষ্য করিলেই ঈশ্বরোপাসনা হইল; এবং ত্রিশক্তিই যখন ভগবানের

আকার, তখন উহাও ভগবানের আকার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর ত্রিলোচনাদিরূপে কৈলাসাদি স্থানে থাকিলেও সেস্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া চিন্তাকালীন তোমার হৃদয়ে আসীন হইবেন না, তখন তোমার চিত্তই তদাকার হইবে। তদ্দ্বারাই সর্ব্বসাক্ষী ভগবানের আরাধনা হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে "ভগবান, ত্রিলোচনাদি আকারে কৈলাসাদি স্থানে না থাকিলেও যদি উপাসকের চিত্তে ত্রিলোচনাদি আকারিত হইলেই ঈশ্বরারাধনা হয়, তবে যথেচ্ছকল্পিত বিকটাকার ভূত প্রেতাদির চিন্তা বা দৃশ্য রামদাস শ্যামদাসাদির চিন্তাতেও ঈশ্বরোপাসনা হইবে না কেন? সে চিন্তাও মিথ্যা নহে, উহা চিত্তেরই অবস্থা বিশেষ এবং সর্ব্বাকার ঈশ্বরের অবান্তর আকার হইয়াছে।" ইহার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বেও ইঙ্গিত হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। পরমার্থতঃ ভূত প্রেতাদির এবং রামদাসাদির চিন্তাও যাঁহার চিন্তা, ত্রিলোচনাদির চিন্তাও তাঁহারই চিন্তা। কিন্তু চিন্তকের ভাবের পার্থক্যবশতঃ ভূতাদি চিন্তা এবং ঈশ্বরচিন্তা হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌বিধ ফলদায়ক হইয়াছে। পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অনন্ত জগৎ একমাত্র ঈশ্বরাত্মক, অতএব পরমার্থতঃ ভূতের চিন্তাও ঈশ্বরের চিন্তা, ঈশ্বরের চিন্তাও ভূতাদির চিন্তা, অথচ তুমি ভূতভাবে লক্ষ্য করিলে ভূতেরই চিন্তার ফল (ভয় মোহাদি) তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইবে; আবার ঈশ্বর ভাবে লক্ষ্য করিলে ঈশ্বর চিন্তার ফল (মহা কলুষ বিনাশানন্তর অগাধ শান্তি) পাইবে। অতএব কৈলাস পর্ব্বতাদিতে ভগবানের থাকা না থাকায় কোন উপকার বা হানি নাই; সুতরাং তাহার বিচারেরও এ প্রবন্ধে প্রয়োজন নাই।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" এই বচনটি যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে। কিন্তু "সাধকানাং হিতার্থায়" এরূপ পাঠ নহে।— চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥" ইহার অর্থ এই— আত্মা চিৎ স্বরূপ, এক (অনেক নহে), অখণ্ড এবং শরীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, উপাসনার অধিকারী লোকেরা উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইহাঁকে আকৃতি বা শক্তির সহিত অভেদ কল্পনা করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই— আত্মা ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং তাঁহার উপাসনা (চিন্তা) হইতে পারে না। মানসিক জ্ঞানকে উপাসনা বলে। জ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায় যে জ্ঞান ক্রিয়ামাত্রকেই বিষয় করিতে পারে। ত্রিশক্ত্যাত্মক চিত্তের বিবিধ প্রকারে আভাসমান হওয়াকে জ্ঞান

বলাযায়, এবং চিত্ত যে যে ভাবে আভাসমান হয়, সেই সেই প্রকারকে জ্ঞান বিষয় বা জ্ঞেয় কহে। মনে কর, তুমি রামদাসকে চিন্তা করিতেছ, এক্ষণে বলিতে হইবে যে যাদৃশ সম্বন্ধবিশেষে ত্রিশক্তি রামদাসীয় রূপাকারে পরিণত হইয়াছে, তোমার চিত্তাকার ত্রিশক্তিও তাদৃশ সম্বন্ধে রামদাসীয় রূপাকারে পরিণত হইয়া আভাসমানা হইতেছে। এই প্রকার রসগন্ধাদি সমস্ত ক্রিয়ারই চিন্তা বা প্রত্যক্ষও বলিতে হইবে।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, আত্মা যখন ত্রিশক্তির অন্য বস্তু, তখন আর কোন প্রকারেও ত্রিশক্ত্যাত্মক চিত্তের আত্মাকারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে কিপ্রকারে আত্মার চিন্তা হইবে? পরমাত্মার চিন্তা আর "কাঁটালের আমসত্ব" এক প্রকারই হইবে। কিন্তু অধ্যাস দ্বারা শক্তির সহিত একতাপন্ন ভাবে চিন্তা করিলে, আকাশ ও দিগাদির ন্যায় তটস্থরূপে (অন্যের সাহায্যে যাহার অনুভব হয় তাহাকে তটস্থ বলে) আত্মা লক্ষিত হইতে পারে। আকাশ ও দিগাদি যেরূপ নিজ হইতে অনুভূত হয় না, মেঘ, নক্ষত্র, পক্ষী, গ্রাম, নগর, ও বৃক্ষাদির সাহায্যে অনুভূত হইয়া থাকে; সেই প্রকার আত্মারও শক্তির সাহায্যে অনুভব হইয়া থাকে। (এস্থলে কেবল তটস্থের উদাহরণের নিমিত্ত আকাশাদির উল্লেখ করা হইল, বস্তুতঃ উহা আত্মানুভবের ঠিক তুল্য দৃষ্টান্ত নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন বস্তু প্রকৃতরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে না। পাঠক! অতি সুনিপুণ ভাবে "অহং আমি" এই অনুভব করা কালীনই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার শরীরাকার শক্তির সাহায্যে চৈতন্যের অনুভব করিতেছ।) অতএব চিন্তকেরা অধ্যাস দ্বারা শক্তির সহিত একতাপন্ন চৈতন্যকে প্রকৃতির সহিতই চিন্তা করিবে। এই আধ্যাসিক একতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার নাশও নাই, উৎপত্তিও নাই, সুতরাং উহা নূতন করিয়া কল্পনার নিমিত্ত উপদেশ দেন নাই। সনাতন যে প্রকৃতি পুরুষের আধ্যাসিক অভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারই অনুসরণ করিবে; এই তাৎপর্য্যে "কল্পনা করিবে" বলিয়াছেন।

উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলাম, এক্ষণে অবসর প্রার্থনা করিতেছি। বোধ হয় আলোচিত বিষয় সকলের মধ্যে অনেক কথাতে পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে, কারণ অনেক বিষয়ই অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এবিষয়, যদি আংশিক কথা সকলের সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ ভাবে লিখিতে হয়, তাহা হইলে বৃহদাকার একখানি দর্শন গ্রন্থ

হইয়া উঠে। সুতরাং তাহা এইভাবে লিখিত হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে অবসৃত হইলাম। ওঁ শিবঃ ওঁ।

সাধু-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বামীজীর আর সে দিবস ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল না। অনশনে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। সুতরাং আমাদের দুঃখের ঈয়ত্তা রহিল না। যদিও তিনি যাইবার সময় আমাদের নানারূপে বুঝাইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি সে দিবস আমরা সকলে বিহ্বল অবস্থায় দিনাতিপাত করিয়াছিলাম। আমি কথায় কথায় শুনিলাম যে এইরূপ আরও একদিন স্বামীজীকে অনশনে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সে দিবসের ঘটনা আরও বিস্ময়কর। ভ্রমক্রমে অশৌচাবস্থায় আমার সহোদরা অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, স্বামীজী অন্নস্পর্শ মাত্র অশুচি অন্ন বলিয়া এইরূপ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সাধকদিগের প্রতিভাবলে অসাধ্য সংসাধিত হয়, সুতরাং এরূপ ঘটনা তাঁহাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। এই সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া আমার আপাদমস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া চিত্ত একবারেই তাঁহার গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তদুপরি আবার এই সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে আনন্দে হৃদয় উৎফুল্লিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই আমি চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে তাঁহার আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় যাহা দেখিলাম তাহা প্রকৃতই মনোমুগ্ধকর। ইতিপূর্ব্বে পুরণাদি শাস্ত্রে কেবলমাত্র যাহা পাঠ করিয়াছি স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া অপার সুখসাগর উথলিয়া উঠিল। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রবক্ষ স্ফীত হইলে যেমন পার্শ্বস্থ জলরাশি সঙ্কোচভাব ধারণ করে, তদ্রূপ আশ্রমের পরিমলশোভা সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হওয়ায় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন আমি সেই অবস্থায় তথায় বসিয়া পড়িলাম। তিনি আমার তদবস্থা দেখিয়া মধুর সম্ভাষণে আমায় বড়ই আপ্যায়িত ও উৎসাহিত করিলেন। আমার

নয়ন কিন্তু তখনও আশ্রম শোভা দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করে নাই। চারিদিক অতি যত্নে অবলোকন করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিক স্বভাবসুন্দর নয়নতৃপ্তিকর লতাপুঞ্জ পরিশোভিত, মধ্যে একটি দ্বিতল ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহ আড়ম্বরশূন্য; কিন্তু অতীব সুপরিস্কৃত। কোনরূপ আবর্জ্জনার লেশমাত্রও নাই। শয্যার মধ্যে এক খানি মৃগচর্ম্ম কষায় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, তদুপরি স্বামীজী আসীন। সম্মুখে রাশিকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ। স্বামীজীকে বেষ্টন করিয়া কতকগুলি আগন্তুক উপবিষ্ট আছেন। সকলেরই হস্তে এক এক খানি করিয়া গ্রন্থ আছে। ইহাঁদের মধ্যে কেহ মাহারাষ্ট্রদেশীয়, কেহ ত্রৈলঙ্গী, কেহ হিন্দুস্থানী, কেহ বা দ্রাবিড়ী, দুই একজন বাঙ্গালীও ছিলেন। আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন একজন মহারাষ্ট্রীয় পাঠ চাহিতেছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বুঝাইতেছিলেন। পরক্ষণই দেখিলাম ত্রৈলঙ্গীকে তেলেগু ভাষায়, হিন্দুস্থানীকে হিন্দি ভাষায় এইরূপ উপস্থিত সকলকেই তাঁহাদের জাতীয় ভাষায় শাস্ত্রার্থ উপদেশ দিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটা ইংরাজী কথাও শুনিলাম। আমি তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই একাধারে অবলীলাক্রমে সকলকে সমান ওজনে উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রায় চারি দণ্ড কাল আমি বসিয়া বসিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনা শুনিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাঁহাদের পাঠ সমাপ্তি হইল। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "কি বাবু বিরক্তি লাগিতেছে ?"

আমি। আজ্ঞে না। আমার আজ আনন্দের সীমা নাই।

স্বামী। আমি বিদ্যার্থীদের পাঠ দিতে বড়ই নিমগ্ন ছিলাম। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা দেখি নাই। যাহা হউক অদ্য তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে ?

আমি। আপনি যে এইমাত্র উহাঁদের পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন ঐ বিষয়টা আর একটু শুনিতে আমার মনের বড়ই ব্যগ্রতা জন্মিয়াছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া এ দীনকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন তবে কৃতার্থ হইব। *

---

* স্বামী যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল তাহাই এখানে সন্নিবেশিত হইল। সাধু-দর্শনে সাধুদিগের সমস্ত

স্বামী। তুমিত কতকটা শুনিয়াছ। ঐ যে আমি বাসনার কথা বলিতে ছিলাম; ঐ বাসনাই পুনর্জ্জন্মের কারণ। জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কার দ্বারা বাসনার ন্যূনাধিক্য জন্মে। যেরূপ সংস্কার সঞ্চিত হইবে, বাসনাও তদনুযায়ী হইবে। সংস্কার সমষ্টি লইয়াই এই স্থূল দেহ গঠিত। প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিবিধ সংস্কার রাশির অভিব্যক্তি মাত্র। এই সংস্কার আবার দুই ভাগে বিভক্ত। একটি সু, অপরটি কু। সুতরাং সুতে এবং কুতে মিশিয়া এই দেহাদি সংগঠিত হইয়াছে। যাঁহার কুসংস্কারের আধিক্য আছে তাঁহার তৎশক্তি পরিচালনোপযোগী যন্ত্র সকলও পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাঁহার সেই সমস্ত সংস্কার ক্রমশঃ এত দৃঢ় হইয়া যায়, যে অবশেষে কেবল মৌখিক উপদেশ অথবা সামান্য কয়েক দিবসের অনুষ্ঠানে তাহার ধ্বংশ সাধন হয় না। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যগণ তাহা ত একবারও চিন্তা করেন না। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে অসদনুষ্ঠান দ্বারা নিজ প্রকৃতি সহ দেহযন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া বৃদ্ধাবস্থায় চিত্তস্থিরাদির জন্য হয় ত কখন ২ কঠিন অনুষ্ঠান করিতে যান। তাহাতে আবার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। তখন তাহাদের বহির্মুখীন শক্তি এতই প্রবল বেগে ক্রিয়াশীলা হইয়া পড়ে যে হটাৎ সে গতি রোধ করিতে যাইলে শারীরযন্ত্র সকল বিকল হইয়া অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করে। সুতরাং অকালমৃত্যু আদি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা লইয়া যখন আমরা মৃত্যশয্যায় শায়িত হই তখন আমাদের মানসিক অবস্থা কি তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। এসময় সকলে তাঁহাকে ঈশ্বর নাম শ্রবণ মননাদি করাইতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার মন কদাচ সেদিকে ধাবিত হইতে পারে না। কারণ, তখন তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারানুগত দেহযন্ত্রাদি সহ মনটি গঠিত হইয়াছে। তদুপরি সেই মহা মূর্চ্ছার সময়ে মনের বিকলতাহেতু যখন সমস্ত বিষয়ের উপরই আমার আধিপত্য একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন কাহার বলে আমি আমার সেই বহির্মুখীন প্রবল গতিকে পুনরায় ঠিক বিপরীত পথ ধরাইয়া অন্তর্মুখীন করিতে সক্ষম হইব? সুতরাং সে সময়ে মনুষ্যের সকল চেষ্টাই বৃথা হয়। সে সময় সংস্কারানুকুল বাসনা রাশিই তাহার উপর আধিপত্য করে। স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির মায়ায় আকুলিত হইয়া পড়ে। কিছুতেই এ সংসার ছাড়িয়া

উপদেশই এই ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের "প্রত্যেক কথাই" আমাদের অবশ্য স্মরণ নাই।

খাইতে তাহার মন চাহে না। তখন তাহার ঐকান্তিকী বাসনা হয় যে কত দিনে আবার আমি আমার ঐ সমস্ত বাসনা চরিতার্থের বিষয় সমস্ত লাভ করিব। মৃত্যুর পরে যখন জীবাত্মা দেহহারা হন তখন ঐ বাসনা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

এই যে ঐকান্তিকী পুনর্দেহ লাভজনিত বাসনা ইহা দ্বারাই মনুষ্য জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমি। আচ্ছা, জীবাত্মা বাসনার সাহায্যে কি করিয়া শুক্র শোণিতের সংশ্রব প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়টি জানিতে ইচ্ছা করি। অতএব কৃপা করিয়া আমার জন্য আর একটু শ্রম স্বীকার করিতে হইবে।

"বেদসার-শিবস্তব।"

পশূনাং পতিং পাশনাশং পরেশং
গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজুটমধ্যেস্ফুরদ্গাঙ্গ বারিং
মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিং॥ ১
মহেশং সুরেশং সুরারাতি নাশং
বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষং।
বিরূপাক্ষ মিন্দ্বর্ক-বহ্নি-ত্রিনেত্রং।
সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্তং॥ ২
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং
গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপং।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং
ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্তং॥ ৩
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে!
মহেশান শূলিন্ জটাজুটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥ ৪
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কার বেদ্যং।

যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বং ॥ ৫
ন ভূমি র্নচাপো ন বহ্নি র্নবায়ু
র্নচাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতো ন দেশো ন বেশো
ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে ॥ ৬
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং।
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনং ॥ ৭
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞান গম্য ॥ ৮
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্য নমান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকং
ত্বংহিংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোসি ॥ ১০
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকো হর চরাচর বিশ্বরূপিন্ ॥ ১১

৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ১১শ খণ্ড।

সদনুষ্ঠান।

বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট পবিত্র সলিলা ভবভয় নিস্তারিণী ভাগিরথী তীরে দাঁইহাট নামক এক খানি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। এখানে বহুতর ভদ্র ও কুলীন বংশজ ধনী সন্তান বাস করেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের মধ্যে কুলে, মানে, ধনে, সৌজন্যে এক-জন বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধার্ম্মিক লোক। তাঁহারই যত্নে প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল উক্ত গ্রামে একটী হরিসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি সাম্বাৎসরিক অধিবেশনে উক্ত সভা অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিগত ১লা ফাল্গুণ উক্ত সভার সাম্বাৎসরিক উৎসবে একটি বিশেষ সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। নবদ্বীপ সমাজান্তর্গত প্রায় যাবতীয় অধ্যাপক মণ্ডলী সমবেত হইয়া যে প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করিলাম, প্রবন্ধান্তরে আমাদের মন্তব্য সহ সভার উদ্দেশ্য ও বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রতিজ্ঞাপত্র যথা,—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্।

শকাব্দা ১৮১০। ৩রা ফাল্গুন।

দাঁইহাট হরিসভা।

অস্যাং সভায়ামুপস্থিতানামস্মাকং প্রতিজ্ঞেয়ম্।

অদ্য প্রভৃতি সমাজহিতার্থং সমাজহিতানামনুষ্ঠানার্থিনাং

উপদেশার্থং স্বধর্ম্মরক্ষার্থঞ্চ সজ্জনানাং সর্ব্বদৈব যথাশাস্ত্রোপদেশান্ দাস্যামঃ। অবসরে চ প্রাপ্তে সমাজ-রক্ষণায় যদ্ যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বমেব সমালোচয়িষ্যামঃ। ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মণাম পূর্ব্বস্থলী। শ্রীউমাশঙ্কর তর্কচূড়ামণী নারায়ণপুর।
শ্রীশ্রীরাম দেবশর্ম্মণাম্ নাকুরিয়া। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মণাম মুরুন্দিগ্রাম।
শ্রীকৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ৺কালীঘাট। শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মণাম্ সিঙ্গিগ্রাম।
শ্রীরামগোপাল ন্যায়রত্ন হাঁপানিয়া। শ্রীরামতারণ বিদ্যালঙ্কার পাতাইহাট।
শ্রীবীরেশ্বর বিদ্যালঙ্কার দাঁইহাট। শ্রীঈশানচন্দ্র তর্কপঞ্চানন কাষ্ঠশালী।
শ্রীগয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ গাঁফুলিয়া। শ্রীরাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কালিকাপুর।
শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য মুস্থলী। শ্রীসাতকড়ি শর্ম্মণাম মুরুন্দী।
শ্রীবিশ্বদাস তর্করত্ন সিঙ্গিগ্রাম; শ্রীশিবদাস বাচস্পতি সিঙ্গিগ্রাম।
শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণাম্ সিঙ্গিগ্রাম। শ্রীমথুরেশ তর্কতীর্থ বিষ্ণুপুর।
শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণাম্ শ্রীখণ্ড। শ্রীপ্রসন্নকুমার শিরোমণি পাঁচুন্দীগ্রাম।
শ্রীরামতারণ দেবশর্ম্মণাম কান্দি। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন হাঁপানিয়া গ্রাম
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভাগবতভূষণ খেঁড়ুয়া। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাসিন্ধু ঐ
শ্রীদেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ বিল্বপুষ্করিণী। শ্রীনন্দলাল দেবশর্ম্মণাম্ কা গ্রাম।
শ্রীসুরেশচন্দ্র শিরোরত্ন আঠাকী। শ্রীচণ্ডিচরণ ন্যায়রত্ন নলহাটী।
শ্রীরামরত্ন বিদ্যাভূষণ অগ্রদ্বীপ। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন পাতাইহাট।
শ্রীকৃষ্ণরত্ন বিদ্যাবাগীশ অগ্রদ্বীপ। শ্রীহরিমোহন স্মৃতিরত্ন নলহাটী।
শ্রীনীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন অগ্রদ্বীপ। শ্রীবক্রেনাথ শর্ম্মণাম্ ত্রৈপুড়।
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণাম্ বিল্বপুষ্করিণী। শ্রীতিনকড়ি বিদ্যাভূষণ রাওদী।
শ্রীশ্রীনাথ শর্ম্মণাম্ বিল্বপুষ্করিণী। শ্রীবিপ্রদাস বিদ্যারত্ন পাঁচন্দী।
শ্রীসতীপ্রসন্ন স্মৃতিতীর্থ বিল্বপুষ্করিণী। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ শর্ম্মণাম্ বনওয়ারি আবাদ।
শ্রীকালীশরণ তর্কবাগীশ পাটলীগ্রাম। শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যানিধি মাঝিগ্রাম
শ্রীপূর্ণচন্দ্র তর্করত্ন কুমারীগ্রাম। শ্রীগঙ্গেশ চিন্তামণি ঐ
শ্রীতারাপ্রসন্ন শর্ম্মণাম্ ঐ

শকাব্দা ১৮১০। ৩রা ফাল্গুন।

ভাইহাট হরিসভা।

অত্রে পণ্ডিতানামস্মাকং প্রতিজ্ঞেয়ম্।

অদ্য প্রভৃতি যথেচ্ছাচারিণামস্মৎ সমাজান্তঃ প্রতিমাং বিহিত-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনায় সজ্জনানাঞ্চ স্বধর্ম্ম-রক্ষণায় চ যথাশাস্ত্রং যথাসম্ভবঞ্চ তান্ উপদেক্ষ্যামঃ। অবসরে চ প্রাপ্তে স্বধর্ম্ম-রক্ষায়ৈ যদ্ যৎ কর্ত্তব্যং তৎসর্ব্বং সমালোচয়িষ্যামঃ। ইতি

বাগ্দেবস্য শ্রীভুবনমোহন বিদ্যারত্নস্য।

শ্রীমথুরানাথ পদরত্নস্য শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণঃ শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মণঃ
শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ শ্রীলালমোহন শর্ম্মণঃ শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

সংস্কৃত চর্চ্চা।*

ভারতের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত, যে দেশে যাই, যে নগরে যাই, যে পল্লীতে যাই, সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান শতাব্দীর আর্য্য সন্তানগণকে "উচ্চ-শিক্ষা" "উচ্চশিক্ষা" রবে গগন ভেদ করিতে দেখিতে পাই। ভারত-বর্ষে অসংখ্য বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা ইহাকেই উচ্চশিক্ষা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করেন। কালের কুটিলচক্রে জগৎ পূজিত আর্য্যশাস্ত্র এক্ষণে লুপ্ত প্রায়। সুতরাং উহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী-কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐ শিক্ষার প্রভাবেই যে ভার-তের চিরগৌরব রবি অস্তমিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা কেহই

---

* এই প্রবন্ধটি আমরা অনেক দিন হইল পাইয়াছি। প্রবন্ধ লেখক বড়ই স্বধর্ম্মানুরাগী ও উদ্যমশীল, এবং প্রবন্ধের বিষয় ও অতীব গুরুতর, সুতরাং প্রবন্ধটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য আমরা উহা প্রকাশ করিলাম। বিষয়টী পাঠকগণের মনোযোগাকর্ষণ করিয়া আরও বিশেষ আলোচনা হওয়ারই সম্ভব। দেশে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত চর্চ্চা হয় ইহা কোন হিন্দু সন্তান না কামনা করিবেন? বেঃ সং।

ভাবিয়া দেখেন না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রথানুসারে আর্য্য সন্তানগণ কতদূর শিক্ষিত হইতেছেন এবং মাতৃভূমির কতদূর উন্নতি সাধন করিতেছেন একবার দেখা যাউক।

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বালকের যথা রীতি "হাতে খড়ি" দিয়া প্রথম ভাগ ধরান হইল। দুই একখানি বাঙ্গালা পুস্তক পরিসমাপ্তি হইতে না হইতেই ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করান হইল। বালক একেবারে দুই-ভাষায় উন্নতি সাধন করিতেছে দেখিয়া পিতা মাতা ও পরিজনবর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। বঙ্গভাষার উন্নতি মাইনর পরীক্ষার সহিত সমাপ্ত হইল। যদি কেহ আরও কিছু বেশী পড়িলেন, তবে সে "প্রবেশিকা" পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা কিছু হইল, কিন্তু তাহা যৎসামান্য, তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠ পর্য্যন্ত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শতকরা ৮০ জন "সায়েন্স কোর্স" লইলেন। তাঁহাদের সহিত সংস্কৃতের কোন সংস্রবই রহিল না। অবশিষ্ট ২০ জন যাঁহারা সংস্কৃত লইলেন, পরীক্ষার খাতিরে দুই চারি খানি কাব্য নাটকাদি পাঠ করিয়া সংস্কৃতের নিকট চিরতরে বিদায় লইলেন।

তাহার পর দেখা যাউক, ইংরাজী শিক্ষা কিরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে আমাদের বর্ণোচ্চারণ শক্তি সম্যক্ হইতে না হইতেই ইংরাজী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকি ও দারুণ অধ্যবসায়ের সহিত উক্ত শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এই অধ্যবসায়টী পরীক্ষা পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। নির্দ্দিষ্ট পুস্তক গুলি অভ্যাস করিয়া এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যদি একটী চাকুরী হস্তগত করিতে পারিলাম, তাহা হইলেই আমাদের সকল শ্রম সফল হইল। কিন্তু ইয়ুরোপে ত এ প্রথা নাই! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তিনি সেই বিষয়েরই উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেরূপ লোক কয় জন আছেন? আমরা নিজ নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজী শিক্ষায় যেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকি, তাহা ইউরোপীয়দিগের সহিত তুলনা করিলেও অতি সামান্য বোধ হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক এরূপ শিক্ষার পরিণাম কি? বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত ইংরাজী চর্চ্চা করায় আমাদের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে পাশ্চাত্য ভাব প্রবাহিত হয়। এইরূপ

বিজাতীয় কুসংস্কারাপন্ন হইয়া আমরা আর্য্যভূমির সকলই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের দ্বারা পবিত্র ভারতভূমির কিছু-মাত্র উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন অবনতি প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। আমরা আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া অল্প বিদ্যাহেতু পদে পদে তাহারই দোষ বাহির করিয়া খ্যাত নামা হইতে চেষ্টা করি এবং তদ্দ্বারা অপর সাধারণকেও বিচলিত করিয়া সমাজের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকি। এই সকল ও অন্যান্য কারণ বশতঃ পূজনীয় আর্য্যদিগের অমূল্য রত্ন বেদ, দর্শন ইত্যাদি দিনে দিনে লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

তাই বলিয়াই যে আমরা ইংরাজী শিক্ষা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি তাহা নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ইংরাজী শিক্ষার নিতান্তই বিদ্বেষী নহি। কেননা ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে আমরা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছি। বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা ব্যতিরেকে আজ কাল আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। আমাদের বক্তব্য এই যে এমত কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহা উক্ত শিক্ষার হেতু কুসংস্কার সমূহের প্রতি ষেধকতা কার্য্য করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে ঐ সকল দোষ কখনই নিরাকৃত হইতে পারিবেনা। যে হেতু বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও বিজাতীয় ভাষা দ্বারা পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক কদাচ দেখা যায়, যাহা পাশ্চাত্য ভাবে পরিপূর্ণ নহে। যিনি বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন ইংরাজী ভাবাপন্ন দুই চারি খানি নাটক কিম্বা নভেল লিখিয়া সকলের প্রশংসা ভাজন হইলেন। এক্ষণে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বঙ্গভাষা ইংরাজী শিক্ষাজনিত কুসংস্কার দূরীভূত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এ স্থলে সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষাকে এরূপ গুরুতর কার্য্যে ব্রতী করিতে পারা যায় না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত ভাষা যে পৃথিবীর সকল ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সকল জাতিই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে আর কি প্রমাণ আবশ্যক? কর্ম্মাণজাতি ইয়ুরোপে সভ্যতার আদর্শ স্বরূপ; তাঁহারা যেরূপ উৎসাহের সহিত সংস্কৃত আলোচনা করিতেছেন তাহা দেখিয়াও আমাদের অজ্ঞান রাশি নিরাকৃত হইতেছে না। আমরা

বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে আপনিই বড় জ্ঞান করিতেছি। বিজাতীয়দিগের মধ্যেও মোক্ষমূলর, কোলব্রুক, উইলসন, অলকট মহোদয়গণের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও ঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছি। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা না করিয়া অভিনব ধর্ম্মনেতা হইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতেছি।

পূর্ব্বে, বিদ্যালয়ে সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ হয়, সংক্ষেপে বর্ণনা করা গিয়াছে, এক্ষণে সমগ্র বঙ্গভূমিতে সংস্কৃতের উন্নতি কিরূপ হইয়াছে দেখা যাউক। বেদ ও উপনিষৎ আর্য্যশাস্ত্রের মূল ও স্কন্ধ স্বরূপ; ইহার রীতিমত অনুশীলন বাঙ্গলায় যে কিছু মাত্র নাই ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। যে দুই চারি জন বেদজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালায় আছেন তাঁহারা কাশীক্ষেত্রে গিয়া বেদ শিক্ষা করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গে কএক জন খ্যাত নামা পণ্ডিত ব্যতীত এরূপ পণ্ডিত অতি বিরল যাঁহারা দশটী সংস্কৃত কথা একত্রে যোগাইয়া কহিতে পারেন। সুতরাং এরূপ পণ্ডিতাভিমানীগণ বিদ্বজ্জন তাহা সংস্কৃত ভাষার কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন, জগৎ দেখিতেছে, অধিক সমালোচনা করিবার আবশ্যক নাই। অনার্য্য শিক্ষায় ভারত ভূমি প্লাবিত হইতেছে, কিন্তু পাঠক! এখনও একবার দাক্ষি- ণাত্য প্রদেশে যাইয়া দেখুন। সেখানে এখনও যেরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে সংস্কৃত চর্চ্চা হইতেছে দেখিলে হৃদয় পুলকিত হইবে। আবার কখনও যে লুপ্ত আর্য্য শাস্ত্র ও আর্য্যধর্ম্ম প্রচার হইবে এ দুরাশাও হৃদয়ে স্থান পায়। সেখানকার নারীজাতির মধ্যেও এরূপ শত শত আছেন যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় উন্নতি দেখিলে "উন্নত" বাঙ্গালীরও মস্তক অবনত হয়। তাহাদিগের মধ্যে এরূপ অনেক গুপ্ত সভা আছে, যেখানে স্ত্রীলোকেরা সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা ও বাদানুবাদ করিয়া থাকে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লাঞ্ছনা আর কি হইতে পারে? সংস্কৃত শিক্ষায় অন্তর্জ্জগতের (আধ্যাত্মিক) উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় ইহা ম্লেচ্ছ জাতি পর্য্যন্তও স্বীকার করেন। শিক্ষিত যুবক! মিল, স্পেন্সের, হক্সলি, কি কেবল তোমরাই পাঠ করিয়াছ? জর্ম্মানির ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কি উহার অনুশীলন কিছুমাত্র হয় নাই, না উহার গূঢ়মর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই। তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শ্রমসহকারে ঐ সকল গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন ও তাহাতে আত্মার প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না

দেবগণই আমাদের অমূল্যরত্ন অপহরণ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিতেছেন। এখনও যদি আমাদের চৈতন্য হয়, তবে আমরা ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

এক্ষণে দেখা যাউক, সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপে করা আবশ্যক। সংস্কৃত শাস্ত্র অনন্ত। তথাপি বাল্যকাল হইতে উহার চর্চ্চা আরম্ভ করিলে অনেক বিষয়ে শিক্ষিত হওয়া যাইতে পারে ও বিজাতীয় কুসংস্কার আমাদিগের হৃদয়ে কিছুতেই দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে না। অতএব বাল্যকালে সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়া সংস্কৃত আরম্ভ করান বোধ হয় কাহারও মতে দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইবে না। পরন্তু ইহাতে বঙ্গভাষার উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইবে না। মাতৃস্তন্যে পরিবর্দ্ধিত হইলে বঙ্গভাষার সমধিক উন্নতি হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আজ কাল বিদ্যালয়ে যেরূপ সংস্কৃত চর্চ্চা হইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর চর্চ্চা যাহাতে হয় সে বিষয়ে প্রত্যেক আর্য্য সন্তানের সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট কি অভিসন্ধিতে "সায়েন্স কোর্স" হইতে সংস্কৃত একেবারে উঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। যাহাতে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাধারণের পাঠ্য হয়, গবর্ণমেণ্টের নিকট সমবেত হইয়া আবেদন করা উচিত। কিন্তু সাধারণ উন্নতি প্রত্যেকের নিজ নিজ চেষ্টা ও উৎসাহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভারতের শাসন কর্ত্তারা ম্লেচ্ছজাতি, যদি সংস্কৃত শিক্ষার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই দেন, মনে কর যদি সংস্কৃত চর্চ্চায় পদে পদে প্রতিবন্ধকতাই করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরামর্শে আমরা কি আপনাদিগের স্বার্থে চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিতে পারি, না আমাদের অমূল্যরত্ন দস্যুকরে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? বিশেষতঃ গবর্মেণ্টের নিকট এতদূর প্রশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করাও আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপনাদিগের শাস্ত্রাদি পাঠ করিলাম, আর নাই করিলাম, গবর্মেণ্টের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতি নহে। আমাদের নিজের যত্ন ও উৎসাহ থাকিলে মনোরথ সিদ্ধির সহস্র সহস্র উপায় আপনিই উদ্ঘাটিত হইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ! এতদিন পর্য্যন্ত পাশ্চত্য শিক্ষার ভাবগ্রাহী হইয়া আসিলে এখন একবার সনাতন আর্য্যশাস্ত্রের সুমধুর আস্বাদ গ্রহণ কর। একবার সেই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিলে আর উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, মধুতে ভ্রমরের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। বর্ত্তমান প্রথানুযায়ী

উচ্ছৃঙ্খলার বাহ্য চাকচিক্যে কাহারও মন বিমোহিত হইবে না, তখন প্রকৃত উচ্চশিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কাহাকে বলে জানিতে পারিয়া অতুল আনন্দলাভ করিতে পারিবে। আর্য্যধর্ম্মের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থাও থাকিবে না, ভারতের সনাতন ধর্ম্ম যে কতদূর উন্নত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। যখন বাঙ্গালার এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত প্রত্যেকে সদ্‌গুরুপদিষ্ট হইয়া গৃহে গৃহে বেদের চর্চ্চা, বেদান্তের বিচার ও শ্রুতি অভ্যাস করিবেন তখন বাঙ্গালী আপনার সুখে আপনিই উন্মত্ত প্রায়, আপনার গৌরবে জগৎ পূজিত ও ধরণীতলে একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন। তখন জ্ঞানাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া অন্তঃকরণের কুবাসনা ও কুবৃত্তি সকল দগ্ধ করিবে, ও সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত পরমাত্মাকে ভুলিয়া কেহই বিষয় বিষে উন্মত্ত হইবেন না। তখন কি ধনী কি দরিদ্র বঙ্গবাসীর প্রত্যেক নিকেতন স্বর্গীয় শান্তির পবিত্র নিকেতন বলিয়া বোধ হইবে এবং আলৌকিক যোগ বিদ্যাবলে প্রত্যেকেই যথার্থ মুক্তি পথের অধিকারী হইতে পারিবেন। অতএব, ভ্রাতৃগণ, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

উপাসনা।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যোবেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরম্॥

বৈশাখ মাস সমাগত; প্রভাকর মীনভোগ সংহার করিয়া মেষ বিহারে প্রবৃত্ত। প্রাতঃকালে অনিল-দেব সৌরভ-সম্ভার উপহার আহরণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে নিদ্রিত জীবকে প্রবুদ্ধ করিতেছে। শন্ শন্ রবে যেন বলিতেছে উষার সংবেশ মধুময় হইলেও, পরিহার কর। আপাত মধুরিমায় মুগ্ধ হইও না। বিহঙ্গম মধুর-কূজনে বলিতেছে, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কর্ম্মে নিরত হও, সুসময় অতীত করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইও না। কুসুম-কানন বিকশিত কুসুমদামে পরিশোভিত, ভ্রমর নিকর গুণ্ গুণ্ রবে গুণ গান করিয়া প্রফুল্লিত পুষ্প-রাজিকে বিভু চরণান্তিকে উপস্থিত হইতে সঙ্কেত করিতেছে। ইহা বড়ই সুখের সময়,—নববর্ষ। বঙ্গজগণ পুলকিত, হৃদয় নবীন উদ্যমময়,—দেহে নূতন বলের উপচয়ের সময়। আশা কুহকিনী নানাভাবে লীলা

নির্ভর করিতেছেন আমরা সংসারী আশাই আমাদের সুখ।—নিরন্তর ত্রিতাপে পরিতপ্ত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছি, কেবল মায়াবিনী আশাই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। আশার দাস হইয়া সতত বাল্যলীলার ক্রীড়াপর, বিষয় সহ নিতরাং আমোদ। বিষয় বিষ হইলেও বাল্য বশতঃ অমৃতময় বোধ হইতেছে। আমাদের জীবন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল কিন্তু বৈশাখ মাস আর অতীত হইল না। সাধনায় ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া বড় বেগী হইলে, মেষ ছাড়াইলে বৃষে উপনীত। মেষ বৃষ পরিহার করিতেই ক্ষমতা জন্মে না, কি দিয়া কি বলিব! প্রবোধক অশেষ সামগ্রী, উপায় ও অবলম্বন থাকিলেও মন তাহার নিকট যাইতে চায় না; যদি যাইতে চায় কাল ধর্ম্মে কুসঙ্গে তাহা বিকৃত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময় বড়ই ভীষণ। ক্রিয়া কলাপ প্রায়ই নরক দ্বারের শরণি-স্বরূপ। ধর্ম্ম কথা সাধু-জনের গুহা নিহিত। বিধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের প্রচার। শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, আচার নাই, বিচার নাই, আছে কেবল বাবদূকতা, বিলাসিতা ও কামলীলা। এ জীবনের নববর্ষ কুবাতাস হিল্লোলে বিধ্বস্ত হইল, কদাচিৎ সদনুষ্ঠানের বাসনা উপস্থিত হইলেও নাস্তিকের প্ররোচক বাক্যে ডুবিয়া যায়। যদিও না ডুবে (ভয়ে ভীত হইয়া পরিণামে কি হইবে ভাবিয়া আরাধনার আয়োজন করি) অমনি লজ্জা আসিয়া বারণ করে। আবার নবীন রিপুগণ উহার সম্যক পরি-পন্থী। তাহাদের অসার প্রলোভনে যে মুগ্ধ না হইল সেই রক্ষা পাইল। নচেৎ, অনন্ত নিরয় আলিঙ্গন করিতে অলক্ষিত ভাবে হস্ত প্রসারণ করিতেছে কেন? পাঠক সাধুহৃদয় হইবার আশা থাকিলে নবীন রিপু হইতে দূরে থাকিবে। বালকের মত, অনভিজ্ঞের ন্যায়, আত্মবোধ বিহীন, নবীন-বচন-রচনে কর্ণপাত করিও না, মঙ্গল হইবে। শাস্ত্রানুসারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর, আরাধনায় প্রবৃত্ত হও, কর্ম্ম কর, নিবৃত্তি লাভ হইবে, হৃদয়ে শান্তি পাইবে। বিচার, উপাসনা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই নব্য হস্তে পড়িয়া বিকৃত ভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইতেছে,—উহা কলির প্রভাব। ভারত জগতের মধ্যে ঈশ্বরের প্রধানতম উপাসক। ভারতের অধিকাংশ শাস্ত্র কেবল তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছে, তথাপি নবীন বালকতায় আস্থা কেন? এখন উপাসনা ও উপাসক সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি আছে তাহার আলোচনা করা যাউক। পরে কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবে।

তুমি নবীন; আলোকে তোমার চক্ষু ফুটিয়াছে, শিক্ষিত বলিয়া অভিমান

জন্মিয়াছে। যুক্তির গন্ধগাঙ্কী শাস্ত্র শুনিলেই বিরক্তি উপস্থিত হয়, অযৌক্তিক বলিয়া শাস্ত্রটা উড়াইয়া দিতে পারিলেই হিত বোধ কর। আমরা বলি ইহাই তোমার ভ্রম, কুমতি, কুশিক্ষা ও কুদীক্ষা। আজ যে তুমি শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিতেছ ঐ শিক্ষা তুমি কোথা হইতে পাইলে? উহা কি যুক্তি জালে আবদ্ধ করিয়াছ, না, শিক্ষক ও গ্রন্থোক্তিকে আস্থা করিয়া অন্তরে সংগ্রহ করিয়াছ? পূর্ব্বকথা একবার স্মরণ করিলেই দেখিবে কেবল বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে বলিয়াই (অবিদ্যা হইলেও) যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছ। সুতরাং বিষয় বিশেষে শাস্ত্র বিশেষের প্রতি আস্থা থাকা প্রয়োজন। নচেৎ মানব কিছু জানিতে পারে না, শিখিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। জ্ঞানী ও বিদ্বান হইতে হইলে নিত্য ও কৃত উভয়বিধ শাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। (আমরা শাস্ত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব এজন্য দুই একটী কথায় শাস্ত্রের আবশ্যকতা শেষ করিলাম)। শাস্ত্র অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেয়, এবং হিত শাসন করে। বেদ জগতের আদিম শাস্ত্র এবং উহা অপৌরুষেয়। একই বেদ কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তিন খণ্ডে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক বেদ তিন প্রকরণে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। উহাই মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্। পরব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্য। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যথাবিধি উপনিষদের সেবা করিতে হইবে। বেদান্তবেদ্য পরম পুরুষকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপনিষদ সাহায্যে জানিতে হইবে; অন্যোপায়ে তিনি জ্ঞেয় নহেন। শ্রুতি তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,

"নাবেদ বিন্মনুতেতং বৃহন্তং তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"।

অবেদ-বিদ্‌গণ তাঁহাকে জানিতে পারে না। এখন অবেদ অর্থ যত প্রকার ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু বেদ না জানিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না এই অর্থই হইবে, পরাবিদ্যার শরণ লইতে হইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ঐ শ্রুতিতে যে বেদের কথা আছে উহাও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ নহে জ্ঞান-কাণ্ডাত্মক বেদ, অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষদ্। (শাস্ত্র প্রবন্ধে পশ্চাৎ বক্তব্য)।

বেদান্তের কিঞ্চিৎ অংশ আলোচিত হইলেই উপাসনার বিষয় সম্পূর্ণ-

রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে। তাহাতে জ্ঞান না থাকায় ও প্রকৃত তত্ত্বে অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেকে উপাসনায় বিচিকিৎসা উপস্থিত, এমন কি উহার অর্থটী পর্য্যন্ত অনেক নবীন শেমুষীমানগণ অবগত নহেন। উহারা বিদেশীয় তালে নৃত্য করিয়া থাকেন, এদেশীয় তাৎপর্য্যও বিদেশীয় হইয়া বুঝিতে থাকেন, কাজেই বিদেশীয় অর্থে অনর্থ হইয়া থাকে।

আমরা অহরহ দেখিতেছি সকলের সুখদুঃখ সমান নহে, কামনা সকলের তুল্যনয়। সকলে তুল্য ফল পায় না এবং সকল ফলও পায় না; সকলে সমস্ত কার্য্যে ক্ষমবান হয় না, চিত্ত ও সুখসাধন দ্রব্য সকলের সমান নহে। আশা থাকিলেও সকলে সকল উপার্জ্জন করিতে পারেনা। সকলের মনের গতি, প্রকৃতি একরূপ নহে। এইরূপ দেখিয়া নিশ্চয় হয় যে, অধিকারী ও অনুষ্ঠান একরূপ নহে এবং তাহাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মও একরূপ নহে। সুখ দুঃখের তারতম্যই তম্মূল কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম তারতম্যের অনুমাপক। আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য থাকাই তাহার অনুষ্ঠাতৃ পুরুষের প্রভেদ থাকার অনুমাপক। অতি সঙ্ক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বসাধারণ একধর্ম্ম নাই এবং সকলে সকল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম নহে।

ইউরোপীয়গণ অদ্যাপি ইহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহাদের অধিকারী ও ধর্ম্ম বিচার আদৌ নাই। সুতরাং বলিতে পারে বরাহ-নিসূদক চণ্ডাল ও রাজসমীপস্থ লর্ড এই উভয়ের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তুল্য। উহাদের শিষ্যানুশিষ্য অস্মদ্দেশীয় "বাবু কদম্ব"; সুতরাং বাবুদের উপাসনা কাণ্ডে মহা বিভ্রাট অবশ্যই ঘটিবে। বাবুগণ যাহাকে উপাসনা বলেন তাহা উপাসনা নহে উহা "প্রেয়ার বা নেমাজ" বা আর কিছু হইতে পারে। উপাসনা এই শব্দটী ইউরোপের কোন যন্ত্রে যন্ত্রিত হয় নাই। উহা যাঁহাদের শব্দ তাঁহারা যে অর্থ ও তাৎপর্য্যে ব্যবহার করেন তাহাই গ্রাহ্য, তাহার অপার্থ করিলে, হয় অনভিজ্ঞতা, না হয় বাতে প্রকোপ ইহার একতর নিশ্চয়। যে শব্দ যে অর্থে চির প্রচলিত, তাহার নূতন অর্থ করা রামু, কেষ্ট, দেনু, শিবুর কার্য্য নহে কেন "মিষ্টারের" ও সাধ্যায়ত্ত নয়। এখন দেখা যাউক বেদান্তাচার্য্যগণ প্রধমতঃ উপাসনা কাহাকে বলিয়াছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, গৌড়পাদ গোবিন্দ ও শঙ্করাচার্য্য ইহারাই বেদান্তে প্রধান আচার্য্য এবং

পরম্পরা ক্রমে উপদেশ সাহায্যে জ্ঞানি জীবন্মুক্ত। বেদান্ত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে ইহাদের কথাই প্রামাণিক এবং তদনুসারী অধস্তন আচার্য্যগণের কথাও গ্রাহ্য।

প্রথমতঃ দেখা যাউক শ্রুতিতে কি আছে। শিষ্য একান্ত মনে ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুর উপাসনা করিয়া ব্রহ্মতত্বের প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন আচার্য্য বলিলেন।

"নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেবতদ্ বিদিতাদাথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যেন স্তদ্ব্যাচ চক্ষিরে॥ ৩॥ তলবকারশ্রুতিঃ।

তথায় চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না, (কিছুই) জানিনা, কিরূপে অনুশাসন করিতে হয় তাহাও জানিনা, তাহা বিদিত ও অবিদিত হইতে অন্য ইত্যাদি।

এবংবিধ শ্রুতি বাহুলের অভাব নাই।

ঐ শ্রুতির পরেই ৫টী শ্রুতি ক্রমশঃ প্রকাশিত আছে।

"তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

ভাষ্যকার স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন" উপাস্যো বিষ্ণুরীশ্বর ইন্দ্রশ্চ প্রাণোবা ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। মত্বাত্মা।"

ভাষ্যকার ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষ্যারম্ভে উপাসনার একটী লক্ষণ করিলেন। যথা—

"উপাসনং তু যথাশাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বন মুপাদায় তস্মিন্ সমান চিত্তবৃত্তি সন্তান লক্ষণম্।"

যথা শাস্ত্র কোন অবলম্বন গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিত্তবৃত্তি তন্ময় করাকে উপাসনা বলে।

"উপাসনাস্ত্রিবোধর্ম্মোক্তাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।"

এইরূপে উপাসনা তাৎপর্য্য সহজে বুঝিবার জন্য বেদান্তসার-কার লিখিলেন,—

"উপাসনন্ত সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস ব্যাপার রূপাণি শাণ্ডিল্য বিদ্যাদীনি"—

সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস ব্যাপারকে উপাসনা বলে যেমন শাণ্ডিল্য বিদ্যা,

(সম্বর্গ বিদ্যা মধুবিদ্যা প্রভৃতি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বহুবিধ বিদ্যার উল্লেখ আছে।)

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি অধিকারী-ভেদে অন্তরবৃত্তি বিভিন্ন, সুতরাং অনুষ্ঠের প্রণালীও বিভিন্ন। সাধারণতঃ লোকদিগকে যেমন উত্তম মধ্যম ও অধম ভাগে বিভাগ করা যায়, তেমন তাহাদের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও বিভিন্ন হয়। উপাসনা প্রণালী ও তদ্রূপ ত্রিবিধা যথা,—অহংগ্রহ, তটস্থ ও অঙ্গাশ্রিত। অহংগ্রহানুষ্ঠানে সাক্ষাৎ করণ সাধ্য জন্মে।

"যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি।" শ্রুতি

"দেবোভূত্বা দেবানপ্যেতি।" শ্রুতিঃ

"সদাতদ্ভাব ভাবিতাঃ।" স্মৃতিঃ

যার যে দেবতার উপাসক সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্তি ঘটিলেই অহংগ্রহ উপাসনার ফল ফলিয়া থাকে। যিনি নিঃসংশয়িতরূপে আমি ঈশ্বর অর্থাৎ সোহংভাবে উপাসনা করিয়া আলম্বন বলে সিদ্ধলাভ করিতে পারেন তাঁহার অহংগ্রহ উপাসনার ফল হয়। সোহংভাব গ্রহণ করা হয় বলিয়া ইহাকে অহংগ্রহ বলে, ইহাতে ক্রমে মুক্তি ঘটে। তটস্থ উপাসনায় সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা নাই. ইহাতে কামাচারাদি অভ্যুদয় ফল হয়। অঙ্গগ্রহে প্রতীকাশ্রিত উপাসনা হইয়া থাকে, ইহাতে কর্ম্ম সমৃদ্ধি হয়। এইরূপে বেদান্ত বিদ্যাও বিদ্যাফল সপ্রপঞ্চ প্রচার করিয়াছেন। এবং অধিকারী অধিকারানুরূপ নির্গুণ, সগুণ, স্বরূপ. তটস্থ, অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তরূপে বর্ণিত। শমদমাদি সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই, গুরু বেদান্ত বলে অচিরে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। পরব্রহ্ম অস্পর্শ. অরূপ, অব্যয়, অশব্দ, বাক্য মনের অগোচর তাহাকে উপাসনা করা যায় না, কারণ তিনি উপাসনার বিষয় নহেন। উপাসনা মানস ব্যাপার, মনে তাঁহাকে ধরিতে পারে না "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। এই জন্য শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞেয়", সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য।

"দ্বেবাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তংচ মর্ত্তাঞ্চামর্ত্তঞ্চ"। শ্রুতিঃ

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে, মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্যভেদে ব্রহ্মরূপ দ্বিবিধ।

এইরূপ, সগুণ ও নির্গুণ বোধক শ্রুতি রাশি রাশি সংগৃহীত হইতে পারে। যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই উহা বিশেষ জানেন। উহার একটি

তাত্ত্বিক, অন্যটী মায়িক। নির্গুণ, নিরঞ্জন স্বরূপ, ইহা নিরুপাধিকা; স্রষ্টা, দয়াময় ঈশ্বর, ইহা সোপাধিক। উপাধির সংযোগে সগুণ, বিয়োগে নির্গুণ। অবিদ্যা অবস্থায়ই উপাস্য উপাসকাদি ভেদ জ্ঞান থাকে। এখন এসম্বন্ধে শঙ্করাবতার জ্ঞানগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন একবার দেখা যাউক।

"এবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যা বিষয়ভেদেন ব্রহ্মণে দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি।
তত্রা বিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণঃ উপাস্যোপাসকাদি
লক্ষণঃ সর্ব্বো ব্যবহারঃ"। শঙ্কর ভাষ্যম্।

এইরূপ বহু শ্রুতি বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয় ভেদে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে। অবিদ্যা অবস্থায় ব্রহ্মে উপাস্য-উপাসকাদি ব্যবহার।

আবার—"এবমেকমপি ব্রহ্মাপেক্ষিতোপাধি সম্বন্ধং
নিরস্তোপাধি সম্বন্ধঞ্চোপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ
বেদান্তেষু, উপদিশ্যতে"। শঙ্করভাষ্যম্

এইরূপ ব্রহ্ম এক হইয়া ও উপাধি ও নিরুপাধি সম্বন্ধে উপাস্য ও জ্ঞেয় ভেদে উপদিষ্ট।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র ও উহা স্বীকার করিয়াছেন।

"অপেক্ষিতোপাধি সম্বন্ধমুপাস্যত্বেন, নিরস্তোপাধি
সম্বন্ধং জ্ঞেয়ত্বেন ইতি"। বাচস্পতি মিশ্রঃ

প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িক আনন্দগিরি ও তাহাই বলিয়াছেন।

"বিদ্যাবিষয়োজ্ঞেয়ং নির্গুণত্বং সত্যম্। অবিদ্যাবিষয় উপাস্যং
সগুণত্বং"; আনন্দগিরিঃ।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া সুস্পষ্টরূপে জানাযায় যে যাহা বিদ্যার (জ্ঞানের) বিষয় তাহা নির্গুণ ও জ্ঞেয়। তাহাকেবল মাত্র জানিতে হয়। আর যাহা অবিদ্যার বিষয় তাহা সগুণ ও উপাস্য। সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা ও উপাসনাদি হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মের পূজা ও উপাসনা হয় না।—উপাসনার ফলের তারতম্য আছে।

"তত্র অবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদি লক্ষণঃ
সর্ব্বোব্যবহারঃ"। শঙ্করভাষ্যম্

অবিদ্যা অবস্থায় ব্রহ্মের উপাস্য উপাসকাদি ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়।

"তত্র কানিচিৎ ব্রহ্মণঃ উপাসনান্য ভ্যুদয়ার্থানি"। সেই উপাসনা আবার কতকগুলি অভ্যুদয় ফলের নিমিত্ত। জ্ঞান ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির নাম অভ্যুদয়। ইহা পূর্ব্বকথিত তটস্থোপসনা।

"কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি" শঙ্করভাষ্যম্।

কতকগুলি ক্রমমুক্তির জন্য। যেমন সূর্য্য লোকাদিতে জন্ম ক্রমে উর্দ্ধ উর্দ্ধ লোকে জন্ম, পরে প্রকৃত মুক্তি হয়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত অহংগ্রহোপাসনা।

"কানিচিৎ কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থানি, "শঙ্করভাষ্যম্।

কতকগুলি কর্ম্ম সমৃদ্ধির নিমিত্ত। যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ফলের উৎকর্ষকে কর্ম্ম সমৃদ্ধি বলে, ও ঐ সমস্ত উপাসনাকে অঙ্গগ্রত বলে।

"তেষাং গুণ বিশেষোপাধি ভেদেন ভেদঃ। এক এবতু পরমাত্মেশ্বরস্তৈ স্তৈ গুণ বিশেষৈ র্বিশিষ্টঃ উপাস্যো যদ্যপি ভবতি তথাপি যথাগুণোপাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে"। শঙ্করভাষ্যম্।

সে সকলের তদ্রূপ প্রভেদ কেবল গুণ বিশেষরূপ উপাধিদ্বারা কল্পিত। যদিও একই পরমাত্মা গুণবিশেষ বিশিষ্ট হইয়া উপাস্য হইতেছেন তথাপি গুণবিশেষ অনুসারে উপাসনা ফলের ভিন্নতা হইয়া থাকে। শ্রুতি স্পষ্টরূপে তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি"। শ্রুতি?

"যথা এসত্ক্রতুরস্মিন্‌লোকে পুরুষোভবতি তথেতঃ প্রেত্যভবতি"। শ্রুতি

যদ্যপ্যেক আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবর জঙ্গমেষু গূঢ়ঃ তথাপি চিত্তোপাধি বিশেষ তারতম্যাদাত্মনঃ কুটস্থ নিত্যস্যৈক রূপস্যাপ্যুত্ত রোত্তর মাবিষ্কৃতস্য তারতম্য মৈশ্বর্য্য শক্তি বিশেষৈঃ শ্রূয়তে, তস্য য আত্মানমা বিস্তরাং বেদেত্যত্র"। শঙ্করভাষ্যম।

যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গমে অদৃশ্যরূপে স্থিত আছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন চিত্তরূপ উপাধির তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ থাকায় কুটস্থ চিদ্রূপ পরমাত্মার প্রাকট্যের তারতম্য সম্ভব হয়। অর্থাৎ যাহার যেরূপ চিত্ত তাহার তদনুরূপ চৈতন্যস্ফুর্ত্তি এবং তদনুরূপ ঐশ্বর্য্যশক্তি হইয়া থাকে এ নির্ণয় শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। যে আপনাকে অত্যন্ত স্বপ্রকাশ রূপে জানে সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত

হয়। এই সমস্ত উক্তি বাহুল্যে উপাসনার প্রকার ভেদ ও অধিকারির তারতম্য বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপাসনা কি তাহা একরূপ বলা হইল।—যাহা সগুণ তাহাই সাকার "সগুণং সাকার বিদ্ধিঃ। সুতরাং সাকারেরই উপাসনা ও পূজাদি হইয়া থাকে, নির্গুণের হয় না।—সগুণ বা সাকার প্রতিপাদক বিস্তর শ্রুতি আছে।

অশব্দমস্পর্শনরূপমব্যয়ং
তথারসন্নিত্য মগন্ধবচ্চযৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং।
নিচাষ্যতম্মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে। ইতি শ্রুতি

ইত্যাদি শ্রুতি যেমন নির্গুণ প্রতিপাদক তেমন সগুণ প্রতিপাদক শ্রুতিও বিস্তর আছে।

"মনোময়ঃ প্রাণ শরীরো ভারূপঃ সত্য সঙ্কল্পঃ আকাশ
আত্মা সর্ব্ব কর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ"। ইতি
"য এষোন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু
হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণঃ।" ইত্যাদি।

অনেকে বলিতে পারেন "হিরণ্যশ্মশ্রু" প্রভৃতি রূপ ঈশ্বরে সঙ্গত হয় না, ইহা ভ্রম।

"স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশাৎ মায়ামযং
রূপং সাধকানু গ্রহার্থম্"।

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য।

সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমেশ্বরেরও ঐচ্ছিক মায়াময় রূপ হয়। ঐশ্রুতিতে ইহাও প্রতিপাদিত হয় যে, জগতের সাধকোত্তম আর্য্যগণ জড় সূর্য্যের উপাসনা করেন না। সূর্য্যে যে অসাধারণ শক্তি আছে তাহা ঈশ্বরাগত শক্তি কেবল জড় শক্তি নহে। এই বিবেচনায় সূর্য্য প্রতীকে ঈশ্বর বুদ্ধি উত্থাপন পূর্ব্বক অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম ঈশ্বরের ধ্যান করেন।

"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"। এই সূত্র ও ভাষ্যে উহার বিচার ও মীমাংসা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফল কথা যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা বা সূর্য্য শরীরের আত্মা তিনি নিষ্পাপ। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নিষ্পাপ নহে,

সুতরাং সূর্য্যান্তর্গত পুরুষ ঈশ্বর ভিন্ন কেহ নহেন। অতএব ভাষ্যকার "এব মিহাপি আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্ব পাপ্মোদয় লিঙ্গাৎ পর এবেতি বক্ষ্যতি।"

এবং ভগবদ্বাক্য ও আছে।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেবয়া।
তত্ত দেবাগচ্ছত্বং মমতেজোংশ সম্ভবঃ।" গীতা

যাহা ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান, তেজস্বী, তাহা আমার তেজের অংশ সম্ভূত বলিয়া জান।

মায়ায় বিগ্রহধারণের বিবরণ বিস্তর শাস্ত্রে আছে। শ্রুতি ও স্মৃতিতে অভাব নাই।

মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যস্মাং পশ্যতিনারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নত্বং মাং দ্রষ্টু মর্হসি।"

শ্রুতিতেও পূর্ব্ববর্ণিত রূপ ভিন্ন ২ দেবমূর্ত্তিরূপে আবির্ভাব বিবরণ শ্রবণ করা যায়। সামবেদীয় তলব কারোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডের সমস্তই উহার কথা।

"ব্রহ্মহদেবেভ্যো বিজিগ্যে—তেভ্যোহ
প্রাদুর্বভূব—বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবা চ
কি মেতৎ যক্ষমিতি। ২৫। ১২। ইত্যাদি।

এখন কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা লিখিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হয় যে, নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় এবং সগুণ ব্রহ্ম, উপাস্য। উপাসনা সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপার সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নাই। জ্ঞেয় হইলে জ্ঞানাধীন। জ্ঞানওত একরূপ মানস ব্যাপার। তবে উপাসনা না হইবে কেন? জ্ঞান একরূপ মানস ব্যাপার হইলেও উহা মানস ক্রিয়া নহে। উপাসনা ক্রিয়া বিশেষ, উহা মানস হইলেও কর্ত্তার অধীন। কর্ত্তা তাহা করিতে পারে, ইচ্ছা না হইলে না করিতেও পারে, অন্যথা করিতেও পারে। জ্ঞান প্রমাণ জন্য।

প্রমাণ আবার বস্তু স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে। কাজেই তাহা ইচ্ছানুসারে করা না করা ও অন্যথা করা যায় না। যেমন অগ্নি একটী বস্তু। উহা দর্শনমাত্রই যে অগ্নিবুদ্ধি জন্মিবে তাহা নিবারণ বা অন্যথা করিবার সাধ্য নাই। একবার বস্তু স্বরূপ অবগতি হইলে তাহার প্রতিষেধ হয় না। ব্রহ্ম অজ্ঞানের আবরণে আমাদিগের নিকট আবৃত। সেই অজ্ঞান নাশ পাইলেই বস্তু তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া যায়। এজন্যই তত্ত্ববিচারার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু ও বেদান্তের সেবা করিতে হয়। একটী রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যাবৎ রজ্জুস্বরূপ জ্ঞান না হইবে তাবৎ উহা সর্পাকারে ভয় প্রদান করিবে। যদি কেহ তাহা বুঝাইয়া দেয় যে উহা সর্প নহে, রজ্জু; তখন রজ্জু বোধ উৎপাদিত হইলে আর তাহার অন্যথা হয় না। সর্প ভীতিও থাকে না। তদ্রূপ সদ্‌গুরু অজ্ঞানাবরণ, "নেতি নেতি" করিয়া মিথ্যা বুঝাইয়া দিলেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া যায়। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে অচিরে ঐ ভ্রম বিদূরিত হয়, কিন্তু শত বার ব্রহ্ম ২ করিলেও ত ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশ পায় না, তবে আর ঠিক হইল কি? তাহা নহে। নিঃসন্দিগ্ধরূপে যে আত্মতত্ত্ব বুঝিয়াছে সে জগৎ মিথ্যাই দেখে, রজ্জুর মত নিশ্চয়রূপে অনুভূত হয় নাই বলিয়া কেবল ব্রহ্মনামে স্বরূপাধিগম হয় না, বেদ প্রমাণ জনিত ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান জনিত সংসারিত্বের বিরোধী। রজ্জুটী প্রকৃতরূপে হৃদয়ে যেরূপ অনুভূত হইয়াছিল, ব্রহ্ম সেরূপ অনুভূত হয় নাই, অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ আছে তাই স্বরূপাধিগম হয় না।

"ন গচ্ছতি বিনাপানং ব্যাধিরৌষধ শব্দতঃ।

বিনাপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥" শঙ্করাচার্য্যঃ

যথার্থরূপে অনুভব হইলে ব্রহ্মজ্ঞানও প্রকাশিত হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মাত্মবস্তুর অধীন। অতএব উপাস্য ও জ্ঞেয় কতদূর পৃথক্ তাহা একরূপ বলা হইল। এখন আর এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ব্রহ্মোপাসনা এই কথাটীই তবে ব্যবহার হইতে পারে না। তাহা নহে। যেখানে ব্রহ্মোপাসনার কথা আছে তথায় বুঝিতে হইবে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। পঞ্চদশীকার ধ্যানদীপে যদিও বলিয়াছেন নির্গুণের উপাসনা হইতে পারে,

তাহাতেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিগুণোপাসনা হইতে পারে এরূপ প্রতিপাদিত হয় নাই; পরোক্ষভাবে নির্গুণোপাসনা হয় তাহাই বলা হইয়াছে। পরোক্ষভাবে উপাসনা করিতে হইলেই আলম্বনের প্রয়োজন, নচেৎ শূন্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায় অধঃপতিত হইয়া যায় তাহার কোন ফল হয় না।

অতএব সনির্ব্বন্ধ বলা যাইতে পারে উপাসনা বলিলেই সগুণোপাসনা বুঝিতে হইবে। নির্গুণের উপাসনা বলা একরূপ হাস্যপরিহাসের কথা। অধুনা উন্নতি ধ্রুব বাবু-চক্র, সর্ব্ববিষয়ে উন্নীত হইতেছেন, বোধ-হয় তাহারই ফলে উপাসনা উন্নতি পাইয়া নির্গুণে উঠিয়াছে। বাবুদের আর এক আপত্তি দয়া ভক্তি প্রভৃতি নিরাকার হইয়া ও যখন অনুভূত হয় তখন নিরাকারের উপাসনা হইবে না কেন?

বাবুদের যেমন তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন ইহাও তেমন তর্ক। মনে, কোন কোন অবস্থা অবলম্বনে সময়ে সময়ে যে এক এক ভাব হয় তাহার কোনটী দয়া কোনটী ভক্তি ইত্যাদি। তোমারই মনের এক এক অবস্থার নাম ভক্তি দয়া প্রভৃতি। ভক্তি দয়া প্রভৃতি যদি মন ছাড়া অন্য এক পদার্থ হইত আর তুমি তাহা অনুভব করিতে পারিতে তবে এতর্ক সঙ্গত হইত। আদৌ তাহা নহে। ব্রহ্ম যে মনের অগোচর, মনে তাহাকে পায় না। যদি মনে ধরিতে পারিতে তবে অবশ্য অনুভব হইত। যদি ভক্তি দয়ার ন্যায় হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিতে তবে তোমার কথা শোভা পাইত। নির্গুণ উপাস্য নহেন, উপাস্য হইলেই গুণময়। ব্রহ্ম গুণাতীত। হৃদয়ে নিহিত থাকিলে ও অজ্ঞানপটে সমাচ্ছন্ন অজ্ঞান দূর করিতে যে সাধন তাহাই করিতে পার। গুণাতীত ব্রহ্ম মানসিক অবস্থা নহে। যদি তোমার মানসিক অবস্থা ব্রহ্ম হয় তবেত তোমার মনের সহিত এক সময়ে তাহার নাশ সাধন হইবে। এই সবাবিষ্কৃত ব্রহ্মতত্ত্ব বাবুদের চত্বরেই বাস করে, অন্যত্র নহে। আর ভক্তি দয়া প্রভৃতি সাবয়ব বস্তু অবলম্বনেই হইয়া থাকে। তোমার অবলম্বন কেবল নয়ন মুদ্রিত করা। নয়ন নিমীলন করিয়া বিষয়ের অনুধ্যান ভিন্ন আর কি কর। নয়ন নিমীলন ত সকলেই করিতে পারে। কেহ নিদ্রা যায়, কাহার বা তন্দ্রা হয়, কেহ বা অন্ধকার দেখে। কেহ বা প্রার্থনীয় দ্রব্যানুরূপ বিষয় সন্দর্শন করে। অমূর্ত্ত ব্রহ্ম দর্শন হয় কি? এ ধ্যান নহে, উপাসনা

নহে, নাস্তিকের বিষয়ানুধ্যান, চার্ব্বাকের সুখ-সাধন চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে!

আমরা উপাসনা কাহাকে বলে তাহা লিখিলাম। এবং শ্রুতিতে যে, সগুণ উপাসনাই উপাসনাপদের বাচ্যরূপে বর্ণিত আছে তাহাও প্রতিপাদন করিলাম। পূজার পূর্ব্বে "মিরার" পত্রে একটী ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যে বেদে মূর্ত্তি পূজা প্রমাণ করিতে পারিবে সে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইবে। সেই ঘোষণারও ইহাই সম্যক উত্তর। ঘোষণাকারি যদি এতৎ সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে অভিলাষ করেন, তবে অবশ্যই প্রস্তুত আছি। পরিশেষে সনির্ব্বন্ধ এই বলিতেছি বেদে ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপেই উপাসনার বিধান করিয়াছে, এ যাবৎ তাহাই প্রচলিত। নাস্তিকগণ তাহা কদাপি অন্যথা করিতে পারিবে না।

বস্তু বিচার। *

"১ম" (পুরুষ) ও "২য়" (প্রকৃতি) এই দুইটী আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এক্ষণে বিচার্য্য যে, ইহাদের মধ্যে বস্তু (অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব) কি? ইহা মীমাংসার পূর্ব্বে জানিতে হইবে যে, সংখ্যাবাচক (২) দুই কোথায় অবস্থিতি করিতেছে (অর্থাৎ কাহারো সত্তায় ২এর সত্তা কি ১ স্বয়ংই সত্তা ?) কপিলাদি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, যে খ, এ (শূন্যে) ২ অবস্থিতি করিতেছে। এ কিরূপ যুক্তি? খ এ (অভাবে বা শূন্যে) কি ২ (প্রকৃতি সূক্ষ্মতন্মাত্র ও স্থূল ভূতাদি) থাকিতে পারে? যাহা অভাব (কিছু নহে) তাহাতে কি কিছু (বস্তু অবস্থিতি করিতে পারে? যদি বলেন "২" আপনি আপনাতেই থাকে, এ যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ বস্তু (২) মাত্রেই আধেয়, আধেয় হইলেই অবশ্য আধার (আশ্রয় স্থান অর্থাৎ কোন একটী সত্তার বস্তুর বিদ্যমানতা) থাকিবে, এটী স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। যদি বলেন যে, দিক্, দেশ ও কালে বস্তু (২) অবস্থিতি করিতেছে। তাহাও বলিতে পারেন

---

* এটিও সেই স্বামীর প্রেরিত প্রবন্ধ সুতরাং আলোচনার্থ যথাযথ প্রকাশিত হইল। বেং সং।

স্থূচ কারণ দিক্‌, দেশ এবং কালও খ, র (শূন্যের) অন্তর্গত অর্থাৎ দিক্‌ দেশ, কালের স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা নাই, এক খ (শূন্য) ই দিক, দেশ এবং কাল, ইহাই স্বরূপ তত্ত্ব জানিবেন। অতএব বলুন যে "২" (প্রকৃতি) কি বস্তুতে অবস্থিতি করিতেছে?

"২"এর আধার (আশ্রয়-সত্তা) নির্ণয় করিবার অগ্রে খ (শূন্যের), অর্থাৎ যে খাকে সংখ্যাচার্য্য প্রকৃতির আধার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই খ,এর আশ্রয় (কিসে সত্তা) নির্ণয় হইলেই প্রকৃতির (২) তত্ত্ব নির্ণয় হইবে। বস্তুতঃ খ (শূন্য) জিনিষটা কি? * খ স্বরূপতঃই অবকাশ, অর্থাৎ অভাব—শূন্য (যাহা কিছুই নহে)। "যাহা কিছুই নহে" তাহার আবার আধার (আশ্রয় স্থান-সত্তা) কি? তাহা সত্য; কিন্তু খ (শূন্য) যে অভাব (কিছু নহে), সেই অভাব রূপ জ্ঞান কোথায় হইতেছে? চৈতন্যে (১-পুরুষে), অতএব চৈতন্যই (পুরুষই) খ,র আধার (সত্তা) হন। এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখুন, যে, খ "কিছু নহে" হইয়াও অভাবরূপ জ্ঞান বলিয়া নিরাকৃত হইল, এবং পুরুষ ইহার আধার (সত্তা) তাহাও স্থির হইল। যদি খ অভাব হইয়া ১এ থাকিতে পারে, তাহা হইলে ২ (প্রকৃতি) কিছু (বস্তু) হইয়া কেন না ১এ বিদ্যমান থাকিবে?

দ্বিতীয়ত খ,এ (শূন্যে) ২ আছে দ্বৈতবাদীগণ ইহা স্বীকার করাতেই ২এর আধার (সত্তা) ১ (পুরুষ)ই হইতেছেন † যেহেতু খএর (অর্থাৎ অভাব রূপ জ্ঞান) সত্তা ১এ (পুরুষে) আর ২এর (প্রকৃতি) সত্তা সেই খ,এ (শূন্যে)। সুতরাং ২ (প্রকৃত) ও ১এ (পুরুষে) বিদ্যমান আছে; অর্থাৎ ২ খ,র মত ১এর অভাবরূপ জ্ঞান না হইয়া "ভাবরূপ জ্ঞান" মাত্র, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে বিচার্য্য এই যে, ২এর স্বরূপ

---

* বিজ্ঞান বাদীগণ বলেন যে, খ অভাব বা শূন্য নহে, ইহাও বস্তু, কারণ খকে আমরা দীর্ঘ প্রস্থে মাপিতে পারি। এটি অযথার্থ বিচার, কারণ দীর্ঘ, প্রস্থ, ঊর্দ্ধ, অধ, পরিমাণ ও ব্যবধান যাহা কিছু দেখিতেছেন, সমস্তই ২এর (প্রকৃতি তৎকার্য্য বিশেষই) আছে; স্বরূপতঃ খএর (শূন্যের) যে ব্যাপ্য ব্যাপকতা প্রপঞ্চ মাত্র হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এটি অনুভব করিতে পারেন।

† ৩ (খ)—১, ২—৩, ∴ ২—১।

কি একবারে খ,র মত অভাব ?—সাংখ্যাচার্য্য ২এর স্বরূপ বস্তুত্ব অর্থাৎ নিত্য সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা ২কে বস্তু (নিত্যসত্ত্বা) কখন স্বীকার করিতে পারি না, কারণ খ,এ (অভাব) বস্তুর অস্তিত্ব হইতে পারে না, বস্তুতেই বস্তু বিদ্যমান থাকে।

সাংখ্যে অবস্তুকে বস্তু স্বীকার করা হইয়াছে এই যা কিরূপ যুক্তি ?—সাংখ্যের দ্বৈতবাদটি ব্যবহারিক, অর্থাৎ যেরূপ স্থূল দৃষ্টেতে তম ও প্রকাশ পৃথক দুইটি বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু আবার বিশেষ দৃষ্টিতে তম ও প্রকাশ একই বস্তু অনুমিত হয়; স্বরূপতঃ একই প্রকাশের ন্যুনতাই তম খ্যাত হয়। তম কোন পৃথক বস্তু হইলে, প্রকাশ" তম নাশ করিতে পারিত না; বিরুদ্ধ বস্তু মাত্রেই এই নিয়মের অধীন। অর্থাৎ এক বস্তুর ন্যুনতা বা আধিক্য হইলে আর এক বস্তুর তীরোভাব বা আবির্ভাব হয়। সর্ব্বত্র শূন্য দৃষ্টিতে এই নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাত্রেই ব্যবহারিক, বস্তুর স্বরূপ নহে; অর্থাৎ প্রথমে যে বস্তু জ্ঞান হয়, তাহা বস্তুর স্বভাব (স্বরূপ) নহে, পশ্চাৎ বস্তু বিষয় যে জ্ঞান হয়, তাহাই পদার্থের স্বভাব (স্বরূপ) জানিবেন। এই পশ্চাৎ সত্যজ্ঞানের (অনুমানের) দ্বারাই মহাজনেরা বস্তু বিচার করেন। অতএব এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয় হইল যে, ২ (প্রকৃতি) বস্তু হইয়াও খ,র মত অবস্তু; অর্থাৎ যদি বস্তু হইত, তা হইলে খ,য়ে (অভাবে) থাকিত না। সত্ত্বাতেই সত্ত্বা থাকে, অসত্ত্বাতে কখন সত্ত্বা থাকে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারা দেখা যায় যে, খ,এ (শূন্যে) ২ (প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বিশ্ব) অবস্থিতি করিতেছে, বস্তুতঃ অবস্তুতে বস্তু থাকা বা উৎপন্ন হওয়া নিতান্ত অযুক্তি, অতএব ২,কে কোন দ্বৈত সত্ত্বা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং যেরূপ খ নিত্য সত্ত্বার (১ পুরুষের) অভাবরূপ জ্ঞান সেইরূপ ২ ও সেই নিত্য সত্ত্বার (১ পুরুষের) ভাবরূপ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; অর্থাৎ একই নিত্য সত্ত্বার (১ পুরুষের) খ (অভাব) ও ২ (ভাব) রূপ দুইটি পৃথক জ্ঞান মাত্র, আর সেই ১ই বস্তু, ২ অবস্তু জানিবেন। এখন, বলিতে পারেন যে, যখন ২ যৎকিঞ্চিৎভাব রূপ অনুভূতি হইতেছে, তখন ২কে একবারে অবস্তু না বলিয়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধে শ্রুতিতে "সদাসত্তামনির্ব্বচনীয়ম্" সংজ্ঞা দিয়াছে।

ভাল, বলুন দেখি যে, যাহা বস্তুও নহে, অবস্তুও নহে, যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে অভাবও নহে, স্বভাবও নহে, তাহাকে "অনির্ব্বাচ্য মায়া" না বলিয়া কি বলিবেন?

খ,এ (শূন্যে) কপিলের "প্রকৃতি" এবং বিজ্ঞানবাদের "তাপ ও অণু" স্বীকার করা কিরূপ যুক্তি জানেন?—যেরূপ পিতার জন্ম হইবার পূর্ব্বে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল, সেইরূপ অমূলক যুক্তি। অর্থাৎ যখন খ,ই কিছু নহে, তখন সেই কিছু নহে কিছু (২) কেমন করিয়া থাকিবে?

এখন, বস্তু বলি কাহাকে?—যাহা অভাব ও (খ) নহে, ভাব (প্রকৃতি) ও নহে, নিত্যই অবিকৃত স্বরূপই থাকে, তাহাই বস্তু, অর্থাৎ এই প্রস্তাবের ১ (চৈতন্য)ই বস্তু (স্বভাব) জানিবেন।

বামা পাগ্লা।

তারাপুরের* বামাচরণ বলিলে বোধ হয় আমাদের ন্যায় অনেক সংসারীই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। কারণ, বামাচরণ কখনও গগন-ভেদী বক্তৃতা দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে দেশ-বিদেশে বিচরণ করেন নাই। বরং পাছে লোকে জানিতে পাইয়া বিরক্ত করে এইজন্য বামাচরণ আরও পাগল সাজিয়াছেন। তারাপুরে তারামাকে দেখিবার জন্য সহস্র যাত্রী সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে; কিন্তু বামাচরণকে দেখিয়া আসে কয়জন? সকলেই জানে, বামা-ক্ষেপা। কিন্তু বামার মত যদি ক্ষেপা জুটে, তবে বামার ক্ষেপামি বুঝিতে পারে। আর তুমি পাষণ্ড হৃদয় হয়ত বামাচরণকে দেখিয়া অসভ্য বলিয়া চাবুক লাগাইতে চাহিবে; কিন্তু যদি তুমি একবার বামাচরণের সেই অভ্রভেদী তারা-শব্দ শ্রবণ কর, তুমি স্তম্ভিত হইবে; তোমার রোমাঞ্চ হইবে; যতই কেন পাষাণ হৃদয় হউক না, নিশ্চই আর্দ্র হইবে। তুমি সাধুর সম্মান জান না; সুতরাং সাধু চিনিতে পার না।

তুমি বামাচরণকে চিনিতে পার চাই না পার, বামাচরণ কিন্তু তাহার তোয়াক্কা রাখে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বামাচরণের ইচ্ছাই যে, তাঁহাকে যেন কেহ কখন বিরক্ত না করে। সেই জন্যই বামাচরণ কখন নিবীড়

জঙ্গলের মধ্যে গগনভেদী তারা তারা শব্দে অরণ্য বিকম্পিত করিতেছেন; কখন বা পূতিগন্ধ-পরিপূর্ণ শিবা-সারমেয়াদির আবাস-স্থল মহা-শ্মশানভূমিতে বসিয়া নরমুণ্ড-মালা স্কন্ধদেশে ধারণ পূর্ব্বক সদ্য-নিক্ষিপ্ত শবোপরি উপবেশন করিয়া অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিতেছেন; আর মুখে কেবল তারা নাম উচ্চারণ করিতেছেন। শিবাগণ নির্ভয়ে বামাচরণকে বেষ্টণ করিয়া মৃত দেহ অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করিতেছে! বামাচরণের কোন দিকেই দৃষ্টি নাই। অনিমেষ নেত্রে যেন তিনি কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছেন। আবার ঐ দেখুন, বামাচরণ এবার যথার্থই ক্ষেপিয়াছেন। বামাচরণ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য; যেন মত্তহস্তী লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নর-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মানবদৃষ্টির বহির্ভূত কোন দুর্লক্ষ্য দেশে ছুটিতেছে। মুখে সেই 'মা তারা' শব্দ। দেখিতে দেখিতে বামাচরণ তারামন্দিরে যাইয়া উপস্থিত। তারা-মন্দির লোকে লোকারণ্য। একটি তিল ধারণেরও স্থান নাই। কিন্তু বামাচরণের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায় কে? সে গতি রোধ করে কে? সকলেই সসভ্রমে বামাচরণকে পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ অস্পৃশ্য পাগল বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ বা তাঁহার অবস্থার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু স্ত্রীলোক-মাত্রেই ভক্তি ভরে বামাচরণের চরণ-প্রান্তে অবলুণ্ঠিতা হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল!

(ক্রমশঃ)

৩য় ভাগ। সন ১২৯৫ সাল। ১২শ খণ্ড।

বামা পাগ্‌লা।

পূর্ব্ব প্রকাশিত।

এত কাণ্ড হইয়া গেল তথাপি বামাচরণ সংজ্ঞাহীন। তিনি বরাবর কাহা-কেও কিছু না বলিয়া মণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরাধ্যক্ষের আদেশ বামাচরণকে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; বামাচরণ যথা-ইচ্ছা বিচরণ করিবেন। সুতরাং তিনি একেবারে মায়ের সিংহাসনের উপর উঠিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভক্তের কি অপূর্ব্ব সাহস! কি প্রবল প্রতাপ! সাধারণ মনুষ্য যে সিংহাসনের শত হস্ত দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ধীরে ধীরে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিতেও ভীত হয়, ভক্ত কিনা আজ নির্ভয়ে নিঃশঙ্কোচে সেই অনন্ত-শক্তি-শালিনী জগন্মাতার কোলে উঠিল। সে শোভা যে দেখিয়াছে, আমাদের মনে হয়, তাহাদের বুঝি আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। বামার দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে, আর বামা চুপি চুপি বলে—মা! সকল সময় দেখা দিস্ না কেন মা! আমি যে তোরে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারি না! এই যে আমায় শ্মশানে কোলে নিয়ে ব'সে ছিলি কিন্তু আমি যেই ঘুমিয়ে গেলেম আর তুই ফেলে পালিয়ে এলি? তুই ছাড়লে আমি ত ছাড়ব না মা!" ক্ষণপরেই দেখি বামাচরণ আরক্ত লোচনে ভীষণ মুর্ত্তিতে কোল ছাড়িয়া মায়ের হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইয়া মাকে কাটিতে উদ্যত; যেন আবদেরে ছেলে মায়ের উপর রাগ করিয়া দৌরাত্ম্য করি-তেছে! আর, আপন মনেই কত কি বলিতেছে। এমনি ভাবে কথা

কহিতেছেন, যে, শুনিলে মনে হয়, মা জগদম্বা বুঝি কিছু বলিয়াছেন আর বামা তাহারই উত্তর দিতেছে। ঠিক যেন মাতা-পুত্রের কথোপকথন চলিতেছে। বামাচরণের প্রতি তাকাইলে নিশ্চয়ই মনে হয়, যেন মৃণ্ময়ী মা আজ চিন্ময়ীরূপে ভক্তের আব্‌দার শুনিতেছেন। ক্ষণ পরেই দেখি বামাচরণ সজোরে সিংহাসন হইতে এক লম্ফ প্রদান করিয়া হাস্য-মুখে করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে আবার সেই শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বামাচরণের নিত্য ক্রিয়া এই রূপ। তাঁহার যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তিনি সমস্তই মা জগদম্বার নিকট যাইয়া প্রার্থনা করেন। আহারের সময় মায়ের নিকটেই আহার যাচ্ঞা করেন; সাধনে কোনরূপে অক্ষম হইলে মায়ের নিকটেই যাইয়া বল প্রার্থনা করেন। মায়ের নিকট হইতে যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যেন মা তাঁহার আব্‌দার শুনিয়া যথোচিত প্রতিকার করিয়াছেন। বামাচরণ তারা-মা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, জানিতেও চাহেন না। মা ছাড়া আর কাহাকেও ভ্রূক্ষেপও করেন না। চাই তুমি মহারাজাধিরাজ হও, আর নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও দীনহীন হও, কাহারও সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসেন না। তাঁহার সম্বন্ধে একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়াছি সেইটি উল্লেখ করিয়া অদ্যকার মত আমরা এই খানেই বামাচরণের ইতিহাস সমাধা করিব।

বামাচরণ প্রতিদিন ক্ষুধার সময় আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া থাকেন,—মা আমার খিদে পে'য়েছে, আমায় খেতে দে।" এই সময় পূজকেরা প্রায় তথায় থাকিতেন। বামাচরণ আসিয়া দাঁড়াইলেই তাঁহারা তাঁহাকে প্রসাদ দিতেন। কিন্তু বামাচরণের ক্ষুধা না হইলে তিনি কখনই আসিতেন না। সুতরাং কোন কোন দিন তাঁহার আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইত। তজ্জন্য পূজকেরা বড়ই বিরক্ত হইতেন। একদিন বামাচরণের আসতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, পূজকেরা সমস্ত প্রসাদ বণ্টন করিয়া আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তার পর বামাচরণ আপনার ইচ্ছামত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে ভব-কলুষনাশিনী ভক্তহৃদয়োন্মাদিনী জগজ্জননি দণ্ডায়মানা। বামাচরণ ডাকিলেন—"মা! আমার বড় খিদে পেয়েছে। তোর প্রসাদ পাব বলে ছুটে এলাম, আমায় প্রসাদ দে না মা!" এইরূপে একবার,

দুইবার, ক্রমে তিন বার আস্তে আস্তে বামাচরণ মাকে ক্ষুধা জানাইল। কিন্তু পূজকেরা আজ ত তথায় নাই! সুতরাং কে বামাচরণের কথা শুনিবে!—কেই বা তাঁহাকে প্রসাদ দিবে? প্রসাদ ত সব ফুরাইয়া গিয়াছে! যাইহোক, যখন বারম্বার 'মা! মা!' বলিয়া ডাকিয়াও প্রসাদ পাইলেন না, তখন ভক্তের মুখ গম্ভীর হইল, চক্ষু দুইটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। বামাচরণ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মা! আমার বড়ই খিদে পেয়েছে। তুই ভিন্ন যে বামার আর কেহই নাই। তুই যদি আমার ক্ষুধার সময় চুপ করে থাকিবি, তবে আমায় আর কে খেতে দিবে!" এইরূপে নানা মতে মাকে বলিয়াও যখন মনোরথ পূর্ণ হইল না, তখন বামাচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—"দেখ মা! তুই ত জানিস্ যে, আমি তোর প্রসাদ না হইলে কিছুই মুখে তুলি না; আর তুই না দিলেও খাই না। জেনে শুনে যখন আমায় খেতে দিলিনে, তখন তোর বামা এই চল্লো! যখন তুই সেধে গিয়ে শ্মশান হতে আমায় ধরে এনে আদর করে খাইয়ে দিবি, তখন আমি আবার তোর প্রসাদ খাব। নইলে আর বামাচরণ এক গণ্ডুষ জলও মুখে দেবে না।"—এই বলিয়া বামাচরণ শ্মশানে যাইয়া বসিলেন। একাশনে এক মনে চক্ষু বুঁজিয়া বামাচরণ একবারে নিস্পন্দপ্রায় হইয়া বসিলেন। ক্রমান্বয়ে দিবস-ত্রয় অতি বাহিত হইল, তথাপি বামাচরণের সংজ্ঞা নাই।

তখন মা ভক্ত সন্তানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বুঝিলেন। তৃতীয় দিবস রাত্রিতে দিঘাপতিতে * নিদ্রাবস্থায় রাজা স্বপ্ন দেখিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়াই রাজা দাওয়ানকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আমি গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন তারা মা তারাপুর হইতে আসিয়া আমায় জাগাইয়া বলিলেন যে, তুমি এখানে সুখে নিদ্রা যাইতেছ, আর আমি আজ তিন দিবস তারাপুরে উপবাসিনী, তোমার পূজকেরা আমার ভক্ত বামাচরণকে উপবাসী রাখিয়াছে। আমিত ভক্তের আহার না হইলে জলগ্রহণ করি না। সুতরাং আমি আজ তিন দিবস অনাহারে কাটাইতেছি। তুমি সত্বর যাহাতে আমার ভক্ত আর কষ্ট না পায়, তাহার সুব্যবস্থা কর।' স্বপ্ন-দর্শনাবধি আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে এবং মনে নানা প্রকার আশঙ্কার উৎপত্তি হইয়াছে।—অতএব তুমি অদ্যই

* দিঘাপতির রাজাই তারাপুরের অধিপতি এবং তারা-মন্দিরাধ্যক্ষ।

তারাপুরে রওনা হও। তুমি তথায় যাইয়া ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিলে আমি জল-গ্রহণ করিব না।"

দাওয়ানজী রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তারাপুরে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ক্ষোভে বিস্ময়ে ও ভয়ে তাহার শরীর আতঙ্কিত হইল। তিনি অনেক সাধ্য সাধনার পর বামাচরণের ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। ধ্যান ভাঙ্গিবামাত্র বামাচরণ দাওয়ানজীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—'কেমন মা! এইবার তো সাধতে হলো। বামা কি তোর তেমনি ছেলে?"

স্থানাভাব বশতঃ সঙ্ক্ষেপে এইখানেই শেষ করিলাম পরে বামাচরণের সুবিস্তীর্ণ ঘটনাবলি লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

তৎত্বমসি শ্বেতকেতো।

অরুণির পুত্র উদ্দালক স্বীয় তনয় শ্বেতকেতুকে কহিলেন "সৌম্য! সুষুপ্তিকালে পুরুষের যে অবস্থা হয় তাহা আমার নিকট হইতে অবগত হও"।

শ্বেতকেতু কহিলেন "ভগবন্ অবহিত হইয়াছি, উপদেশ করুন্"।

উদ্দালক কহিতে আরম্ভ করিলেন—

"বৎস! ত্রিবৃৎকরণ প্রকরণে তোমার নিকট 'সৎ' আখ্যাযুক্ত সেই পরা-দেবতার কথা বলিয়াছি। এই নামরূপ প্রপঞ্চময় জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল নিরবচ্ছিন্ন একমাত্র সৎ (সত্ত্বামাত্র) পদার্থ ছিল। সেই 'সৎ' ইচ্ছা করিল আপনা আপনি বহু হইয়া উৎপন্ন হই ও সেই ইচ্ছানন্তর আপনারই শক্তি প্রভাবে আপনা হইতেই সূক্ষ্ম তেজঃ অপ্‌ অন্ন ও ক্রমে ত্রিবিৎকরণ দ্বারা স্থূল তেজঃ অপ্‌ অন্ন ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট অণ্ডজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ জীবদেহ সৃষ্টি করিল। * পরে সূর্য্য যেমন এক হইয়া ও জলা-শয়ে জলাশয়ে প্রতিবিম্ব দ্বারা স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন সেইরূপ সেই সদাখ্য পরাদেবতা নিজ সৃষ্ট দেহরাশির মধ্যে প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক শরীরে জীবাত্মা রূপে প্রতীয়মান হইলেন। সৌম্য! সৃষ্টির এই রহস্যের কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, তোমার ইহা স্মরণ আছেকি?"

---

* এই বৎসরের নবম খণ্ডের (পৌষমাসের) বেদব্যাসে ত্রিবিৎকরণ শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

শ্বেতকেতু কহিলেন "ভগবন্! আমি সমস্তই স্মরণ করিতেছি, অতঃপর কি তাহাই আমাকে উপদেশ করুন্"।

উদ্দালক কহিতে লাগিলেন—

"বৎস! পুরুষ যখন সুষুপ্তি উপভোগ করে তখন এই সদাখ্যপরা দেবতার সহিত মিলিত হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়। আত্মা তখন মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই সৎশব্দ বাচ্য পরাদেবতাতে মিলিত হইয়াযান। মনুষ্য যখন নিদ্রিত (সুষুপ্ত) হয় তখন লোকে তাহাকে স্বপিতি (ঘুমাইতেছে) বলে। স্বপিতি অর্থে "স্বম্ অপীতো ভবতি" (স্ব অর্থাৎ তাহা যথার্থ আপনি—সেই পরা দেবতা— তাহাতে যুক্ত হয়)। এই 'স্বমপীতো' ভবতি ইহা হইতে লৌকিক স্বপিতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। জগতের যাহা প্রকৃত সত্য ও পুরুষের যাহা যথার্থ "আমিত্ব" তাহা সেই সৎশব্দ বাচ্য পরাদেবতা, কেননা এই পরিদৃশ্যমান নামরূপ-ব্যাকৃত জগৎ কেবল কল্পিত মাত্র, ইহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। ঐন্দ্রজালিক যেমন মায়া প্রভাবে মিথ্যা ভিত্তির উপর নানাবিধ বস্তু-প্রপঞ্চ দেখায় সেইরূপ 'সৎ" শব্দবাচ্য পরাদেবতা স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে আপনা হইতেই এই নামরূপ কল্পিত জগৎ দেখাইতেছেন, বস্তুতঃ আছেন কেবল তিনি মাত্র জগৎ প্রপঞ্চ যাহা কিছু তাহা বাজিকরের ভেল্‌কি মাত্র—উহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। মনুষ্য মায়া প্রভাবে অভিভূত হইয়া আমার দেহ আমার পুত্র, আমার কন্যা প্রভৃতি আমিত্বসম্বন্ধবিশিষ্ট ভাবের কল্পনা করিয়া লইতেছে বাস্তবিক জগতে দেহ, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পদার্থের কোন সত্তা নাই সকলই কেবল সেই সদাখ্য দেবতার ভঙ্গি মাত্র, অতএব জগতে পুরুষের যথার্থ আমিত্ব (স্ব) সেই "সৎ", মনুষ্য যখন সুষুপ্ত হয় তখন সেই পারমার্থিক (স্ব) এর সঙ্গে মিলিত হয় অর্থাৎ তখন জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া "সৎ" রূপস্থ হয়।

মনুষ্য যখন জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে তখন পুণ্যাপুণ্য নিমিত্ত সুখ দুঃখাদি বহুবিধ আয়াসের দ্বারা নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে। সেই শ্রান্তি দূর হইবার জন্যই তাহার সুষুপ্তি। তখন জাগ্রৎ অবস্থায় পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়দিগের রাজা মন ও তখন নিদ্রিত হইয়া পড়েন, কেবল দেহ কুলায়ে একমাত্র আত্মা জাগরিত থাকেন। আত্মা

তখন তাঁহার নিজের স্বরূপে উপনীত হয়েন; লোকে যেমন জরাদি ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও জরাদি অন্তে আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিগত ক্লান্তি হয় আত্মাও তেমনই জাগ্রৎ অবস্থায় অবিদ্যা জনিত পাপপুণ্য সম্পর্কে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া সুষুপ্তি অবস্থায় আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনার ক্লান্তি দূর করেন। আর একটী সহজ দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যেমন সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ একটী শকুনি এদিক্ ওদিক্ উড়িয়া কোথাও স্থান না পাইয়া পরিশেষে তাহার বন্ধন স্থানকেই আশ্রয় করে, সেইরূপ জীবাত্মা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অবিদ্যাকল্পিত নানাবিধ সুখ দুঃখরূপ নানা দিকে ধাবিত হইয়া কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া পরিশেষে সুষুপ্তি অবস্থায় আপনার অবলম্বন স্থান সেই পরা দেবতাকে সৎ আশ্রয় করেন। জীবাত্মা তখন পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন—পরমাত্মাই জীবাত্মার বন্ধন স্বরূপ। ইহাই সুষুপ্তি রহস্য ইহাতে তুমি বুঝিতে পারিলে সেই 'সৎ'ই মনুষ্যের একমাত্র কারণ ও আশ্রয়।

ত্রিবৃৎ করণ প্রকরণে—এই কথাই তোমাকেই বুঝাইয়াছি। তাহা হইতে দুই একটি কথা পুনর্ব্বার বলিতেছি। তুমি যাহা ভোজন কর, অপ্ (জল) তাহা নয়ন করে অর্থাৎ তোমার ভুক্ত দ্রব্যকে দ্রব করিয়া রসাদি ভাবে পরিণত করিয়া তোমার শরীরের উপাদন করিয়া দেয়। এই অন্ন (ভক্তদ্রব্য অপ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল ও তোমায় জঠরস্থ হইয়া অপ্ দ্বারাই পরিণামিত হইল, অতএব দেখ তোমার দেহের মুল অন্ন ও সেই অন্নের মূল অপ্ এই অপের মূল আবার তেজঃ (ত্রিবৃৎকরণ প্রকরণ দেখ) ও সেই তেজের মূল 'সৎ'। বৎস! জগতের সমস্ত জীবই সেই 'সৎ' কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ও পরিণামে সেই 'সৎ' পদার্থেই বিলীন হইবে। কিরূপে সেই 'সৎ' পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম তেজঃ প্রভৃতির প্রকাশ হইয়া ত্রিবৃৎ করণ দ্বারা ক্রমে স্থূল মনুষ্যদেহ হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মনুষ্যের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাহার বাক্য মনের ভিতর উপসংহৃত হয় অর্থাৎ তাহার বাক্য তখন

** সুষুপ্তি অবস্থা সাধারণ নিদ্রাবস্থা হইতে পৃথক্। সুষুপ্তি কালে কোন রকম স্বপ্ন বা কোন রকম অনুভূতি থাকে না। সুষুপ্তির পর পুরুষের "সুখে ঘুমাইয়াছিলাম কিছুই অনুভব করিনাই" এই প্রকার জ্ঞান হয়।

তাহার মনে ডুবিয়া যায়, তাহার মন প্রাণে ও প্রাণ তজেতে বিলীন হয় এবং সেই তেজঃ পরিশেষে পরাদেবতায় উপসংহৃত হয়। সেই পরাদেবতা (সৎ) অতি সূক্ষ্ম ও সেই পরাদেবতাই জগতের একমাত্র কারণ, সেই পরাদেবতাত্মক এই নিখিল বিশ্ব, সেই পরাদেবতাই একমাত্র সত্য (আর সকল অবিদ্যা-কল্পিত সতের বিবর্ত্তমাত্র), সেই পরাদেবতাই আত্মা (মনুষ্যাদি প্রত্যেক জীবের)। শ্বেতকেতো! তোমার শরীর ইন্দ্রিয় ও আত্মা সকলই সেই পরাদেবতার বিবর্ত্তমাত্র অতএব তুমিও তাহাই—সেই পরাদেবতা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"

শ্বেতকেতু কহিলেন "ভগবন্, যাহা বলিলেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। ভাল, সুষুপ্তি অবস্থায় যদি সকলে বাস্তবিকই সেই 'সৎ' পদার্থে মিলিত হয় তবে তখন তাহাদের 'মিলিত হইয়াছি' এরূপ জ্ঞান থাকে না কেন?'

উদ্দালক কহিলেন "সৌম্য! যেমন মধু-মক্ষিকা নানা দিক্ স্থিত নানাবিধ বৃক্ষের রস একত্র আহরণ পূর্ব্বক মধু প্রস্তুত করে কিন্তু সেই মধুভাবে পর্য্যবসিত রস সমূহের প্রত্যেকের জ্ঞান থাকে না 'আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস' সেইরূপ সুষুপ্তিকালে সকল জন্তু 'সৎ'এর সহিত সঙ্গত হইলেও তাহাদের আমি মনুষ্য, আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ, আমি বৃক, আমি বরাহ আমি কীট, আমি পতঙ্গ, আমি দংশ, আমি মশক ইত্যাদি বিবেক থাকে না। সেই সূক্ষ্ম 'সৎ' পদার্থই জগতের আত্মা, তাহারই একমাত্র যথার্থ অস্তিত্ব, তুমি তাহা হইতে ভিন্ন নহ 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!'

শ্বেতকেতু কহিলেন "ভগবন্, এখনও আমার সন্দেহ মিটিলন না ভাল, সুষুপ্তি অবস্থায় সেই পরাদেবতার সঙ্গত হইয়া যেন (জীব সকলের জ্ঞান থাকে না 'আমি পরাদেবতার সঙ্গত হইয়াছি' কিন্তু সুষুপ্তির অন্তে ত তাহাদের জ্ঞান হইতে পারে 'আমি সেই পরাদেবতা হইতে আগত হইতেছি'।"

উদ্দালক কহিলেন "সৌম্য! আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যেমন গঙ্গাদি এই সকল নদী কেহ পূর্ব্ব হইতে কেহ পশ্চিম হইতে, কেহ উত্তর হইতে, কেহ দক্ষিণ হইতে আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, মিলিত হইয়া সমুদ্রের সহিত

এক ভাবাপন্ন হইয়া যায়। তখন তাহাদের জ্ঞান থাকে না আমি গঙ্গা পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়াছি আমি সিন্ধু উত্তরদিক্ হইতে আসিয়াছি ইত্যাদি**। আবার সেই সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উঠিয়া প্রথমে মেঘে ও পরে বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া সেই সেই গঙ্গাদিতে ফিরিয়া আসে তখন তাহাদের জ্ঞান থাকে না আমি 'অমুক নদীর জল সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আসিতেছি' সেইরূপ বৎস! সুষুপ্তি কালে জীব 'সৎ' দেবতার সহিত মিলিত হইয়া ও সুষুপ্তি অন্তে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াও সেই সৎ-সঙ্গতির কথা ভুলিয়া যায়। শ্বেতকেতো! সেই পরদেবতাই একমাত্র সত্য—তুমি তাহা হইতে ভিন্ন নহ—তৎত্বমসি শ্বেতকেতো!

মুণ্ডক শ্রুতিঃ।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নাম রূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে—

প্রশ্ন শ্রুতিঃ।

ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে নানারূপে এই এই দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

"শাস্ত্র।"

কলি-কলুষ নাশন ভগবান ব্রহ্ম সনাতন মায়া পট বিস্তার করিয়া লীলা বিকাশ করিতেছেন, আমরা মায়া-মোহে বিমুগ্ধ হইয়া নিয়ত জগদ্বৈচিত্র অবলোকন করিতেছি। বৈচিত্রের অন্তরালে যে পরমতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে দর্শন সত্ত্বেও আমরা তাহা দর্শন করিতে সমর্থ নহি। ঐ যে ভাস্কর মরীচি-মালা বিস্তার পূর্ব্বক পূর্ব্বাশার কোলে খেলা করিতে ২ রুদ্রমূর্ত্তি—অবলম্বন করিল, জগৎ হাসিতে, নাচিতে খেলিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে পশ্চিমা-

---

** এই নদী সমুদ্রের দৃষ্টান্ত শ্রুতি নানা স্থানে নানারূপে উদ্ধার করিয়াছেন।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নাম রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।"

কাশ বিবিধরাগে রঞ্জিত করিয়া তপনদেব অস্তাচলে গমন করিতে লাগিল। আমরা উহাই দেখি কিন্তু উহার অন্তরালে যে বরণীয় হিরণ্ময় বপুঃ রহিয়াছে, যাহার প্রভায় প্রভাকর প্রভাকর, তাহা দেখি না দেখিতে প্রয়াস নাই, কারণ আমরা স্থূলদর্শী। আবার আমাদের স্থূলদর্শন অপেক্ষা যাহাদের দর্শন স্থূলতর তাহারা সৌরলীলা-ততদূরও পর্য্যবেক্ষণ করে না। স্থূলতর দর্শিগণের দৃষ্টি আরও স্থূলতমে। সূক্ষ্মদর্শিগণ জগতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিলোকন করিয়া শেষ দর্শনে, দর্শন পর্য্যাবসান করেন। আমাদের সকলেরই দর্শন আছে, সকলেই দ্রষ্টা অথচ দর্শন-গতি বিভিন্ন। ইহার কারণ কি? ঐ যে বন-বাসী বিহগকুল স্বভাব-সিদ্ধ কূজনে ভাবুক হৃদয়ে ভাবতরঙ্গ উত্তালী-কৃত করিতেছে, আর সুজন সঙ্গত বিহগবর ততোধিক রাম-নাম গান করিয়া ভক্তের ভক্তিভাব উদ্দীপন করিতেছে, কেন এই পার্থক্য হইল? এবম্বিধ কার্য্য পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে আপাততঃ এই স্থির হইবে যে একমাত্র শিক্ষাই এরূপ বিভেদ করিয়াছে। আমরা বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রায়ই কর্ত্তব্য নিরূপণ করি। এবং আসুর-ক্রিয়াকলাপের মহিমায় মোহিত হইয়া উহাই জীবন-কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ করি। এইরূপে আমাদের করণীয় প্রায় শেষ করিয়া আমরা অশেষ অকল্যাণের ভীষণ মুখ সন্দর্শন করি। এই যে সংসার-স্রোতঃ দুর্দ্দম বেগে নিয়ত প্রধাবিত হইতেছে উহার উৎপত্তি কোথায়? কিরূপে এ মানবগণ প্রথম উৎপন্ন হইল? উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সংসার ব্যাপারে বিনিযুক্ত হইল, সংসার-কাননে কেহ শিক্ষিত, কেহ অশিক্ষিত, এই শিক্ষার মূল কি? শিক্ষা কোথা হইতে আসিল? যে শিক্ষার অভাবে মানব পশু-সমান, এমন কি স্ফুটিত বাগজাল বিস্তারেও শিক্ষা বিহীন মানব অশক্ত। শিক্ষা না পাইলে মানব কথা কহিতে পারিত না; এই শিক্ষা কোথা হইতে আসিল? শিক্ষার অঙ্কুর কোথায় স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হইল? একবার ভাবিয়া দেখিলে এই স্থির হইবে যে, যাঁহার প্রসাদে আমরা উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও পরিক্ষীণ হইতেছি, জগৎ কার্য্য নিরন্তর নিয়মিত থাকিয়া কার্য্য শেষ করিতেছে, তাঁহার অনুগ্রহেই শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে। এবং সেই শিক্ষণীয় বচন-রচনা হৃদয়ে ধারণা করিয়া "শাস্ত্র" প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি জনক জননী ক্রমশঃ সন্তানকে শিক্ষিত করিয়া, সংসা-

রের কার্য্যোপযোগী করিয়া অনিত্য সংসারধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এইরূপ জগতের শিক্ষা প্রচার জন্য প্রথম কতিপয় ব্যক্তি ঈশ্বরানুগ্রহে জ্ঞানী হইয়া শিক্ষার প্রবর্ত্তনা করিয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, উঁহারাই প্রজাপতি, ঋষি প্রভৃতি। আদি কর্ত্তা জগৎ সর্জ্জন করিলেন সর্জ্জন ক্রিয়ার পূর্ব্বে দৃশ্যমান বস্তু জাতের, উৎপত্তি, স্থিতি ও নিরোধ অবস্থা অনুধ্যান করিয়াছিলেন। অনুধ্যান ভিন্ন এরূপ জগৎ ব্যাপার নিয়মতঃ চলিতে পারিত না, ইহা মতিমান মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

দৃশ্যমান জগৎ এই মাত্রই সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টি প্রলয় চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। যুগচতুষ্টয় পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক মনুর কালশেষ হয়, উঁহাই এক মন্বন্তর। একমন্বন্তরের অবসান হইলে প্রলয় হয়, প্রলয়ান্তে আবার সৃষ্টি ও অন্যতর মনুর কাল চলিতে থাকে। প্রতি কল্পে (মনুরশাসন কাল) সৃষ্টি আরম্ভে পূর্ব্বসৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা পূর্ব্ববৎ সর্জ্জন আরম্ভ করেন। তখন শ্রষ্টার জ্ঞানময় অন্তরে যে সরস্বতীর আবির্ভাব হয় উঁহাই বেদবাণী, উঁহা অপৌরুষেয়। বেদ সংসারী পুরুষ কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থ নহে। আমাদের বিনা প্রযত্নে যেরূপ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতেছে, তদ্রূপ মহাপুরুষের নিশ্বাসবৎ এই বেদবাণী আবির্ভূত হইয়াছে। শ্রষ্টা সর্ব্বশক্তিমান্,—বাক্শক্তি বিরহিত পুরুষের সর্ব্বশক্তিমত্তা সিদ্ধ হয় না। আমাদের চেষ্টায় বাক্ নিঃসৃত হয় এবং আমরা উহার অর্থচিন্তা করিয়া অর্থজ্ঞান পূর্ব্বক প্রকাশ ও ব্যবহার করি এইজন্য আমাদের রচিত গ্রন্থাদি কৃত অর্থাৎ পৌরুষেয়। বেদ বিনা প্রযত্নে পুরুষ নিশ্বাসের ন্যায় আবির্ভূত।

"অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ
যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ,,— ইত্যাদিশ্রুতি

আমরা যেগ্রন্থ রচনা করি, যে বাক্য বলিয়া থাকি, পূর্ব্বে মনে তাহার তাৎপর্য্য স্থির করিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করি, এইজন্য ইহা পৌরুষেয়। বেদ তাহা নহে, উঁহা যুগপৎ শ্রষ্টার জ্ঞানময় অন্তরে প্রকাশিত, এবং তদনুগৃহীত আজানসিদ্ধ সনৎকুমার প্রভৃতিদ্বারা মর্ত্ত্যধামে প্রচারিত।

"যত্রবাক্যার্থজ্ঞান পূর্ব্বকম্ বাক্যজ্ঞানং বা ক্যস্রষ্টৌকারণং

তত্র পৌরুষেয়তা, অত্র চ যৌগপদ্যান্নসাঃ।

কৃত গ্রন্থের কর্ত্তা বিখ্যাত থাকে, অজ্ঞাত থাকিলেও অনুসন্ধানে স্থির হয়। যদ্যপি অরণ্যানী মধ্যস্থ জীর্ণকূপাদির ন্যায় গ্রন্থকর্ত্তার বিবরণ অজ্ঞাত থাকে তথাপি অনুসন্ধান করিয়া রচিত বিষয় আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারি উহা কৃতগ্রন্থ। বেদ-কর্ত্তা কেহনাই, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মারক ইহাই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সাম্প্রদায়িকগণ, বৈদিক ঋষিগণ, কেহই বেদকে পৌরুষেয় বলেন নাই, প্রত্যুত অপৌরুষেয় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। বেদের বিভাগকর্ত্তা, সংগ্রহকর্ত্তা. এবং মীমাংসাকর্ত্তা ভগবান ব্যাসদেব, বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া বারম্বার ধ্বনি করিয়াছেন। আর অধুনা "শারুস্মৃদু" ম্লেচ্ছগণ ও তাহাদের শিষ্য প্রশিষ্য অস্মদ্দেশীয় বাবু-কদম্ব, বুঝিলেন বেদ মানুষ বিরচিত। এই সমস্ত গুণ-পুরুষের কথা এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। বেদ পৌরুষেয় হইলে রচকের নাম প্রসিদ্ধ থাকিত। নানা শাখা সমন্বিত, নানা বিদ্যার আকর, সমুদায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বাবভাসক মহৎ শাস্ত্র বেদের কর্ত্তা সংসারী পুরুষ হইলে অবশ্যই তাহার নাম প্রসিদ্ধ থাকিত। অজ্ঞাত থাকিলেও অনুসন্ধানের চেষ্টা হইত। কোন প্রজাপতি প্রসিদ্ধ দেবর্ষি ও মহর্ষি প্রভৃতির মনে আদৌ এরূপ ভাবেরই আবির্ভাব হয় নাই।

তাঁহারা স্থিররূপে বুঝিয়াছিলেন এবম্ভূত মহৎ শাস্ত্র পরমেশ্বর ভিন্ন মানুষের রচনা করিবার সামর্থ্য নাই. সেই জন্য সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, নাস্তিক ত্রাস ভগবান শঙ্করাচার্য্য মধুরস্বরে বলিয়াছেন।

"মহতঃ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেক বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞ কল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোস্তি।"

যদি এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত, অঙ্গীকার করিয়া সময়ে ২ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত বলিতে রুচি থাকে তাহাও বিকৃত রুচি। তাহা হইলে রচকের প্রসিদ্ধি থাকিত। যদি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণকে রচক বলিতে বাসনা থাকে তাহাও নাস্তিক্যময় বাসনা।

যেন যদৃষিণা দৃষ্টং
সিদ্ধিঃ প্রাপ্তাচতেন বৈ।

মন্ত্রেণ তস্য তৎপ্রোক্তমৃষিভাবস্তদাত্মকঃ,
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যে মন্ত্রে যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই তাহার ঋষি। গায়ত্রী বেদের সার, গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে ব্রাহ্মণ হওয়ার সাধ্য নাই। গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র। যদি বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রীর স্রষ্টাবল তবে বশিষ্টাদি পূর্ব্বতন ঋষিগণের উপনয়ন ও গায়ত্রীদীক্ষা হইয়াছিল না। বিশ্বামিত্রের ও উপনয়ন সময়ে গায়ত্রীলাভ ঘটিয়া উঠিতেছে না। সুতরাং মন্ত্র-ঋষি মন্ত্রকার নহে। সামবেদে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে ব্রহ্মা হইতে গায়ত্রীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

গায়ত্রো মুখাদপতদিতিহ ব্রাহ্মণম্।
গায়ত্রা ব্রহ্মণমুখাৎ। ভাষ্যম্।

বিশ্বামিত্র কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া গায়ত্রী বলে সিদ্ধকাম হন, সেই জন্য বিশ্বামিত্র ঋষিরূপে স্মৃত হন।

বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মারও স্বাতন্ত্র্য নাই, তাঁহাকেও বেদানুগত হইয়া পূর্ব্বানুরূপ সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, অতএব "পুরুষাস্বাতন্ত্র মাত্রঞ্চাপৌরুষেয়ত্বং—
বাচস্পতি মিশ্র।

"এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবান সৃজতোস্গ্র মিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃং স্তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতিস্তোত্রং বিশ্বা নীতি শস্ত্রমভি সৌভ গেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ।

প্রজাপতি "এতে, এই শব্দ স্মরণ পূর্ব্বক দেবতার, "অস্গ্রং" শব্দ স্মরণ পূর্ব্বক মনুষ্যের, "ইন্দবঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণের, "তিরঃ পবিত্রং" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক গ্রহগণের, আসবঃ,, শব্দপূর্ব্বক স্তোত্রের, "বিশ্বান্" শব্দ পূর্ব্বক শস্ত্রেরও 'অভি-সৌভগ" শব্দ কথন পুরঃসর অন্যান্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অন্তশ্রুতিতেও "সমনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ"

প্রজাপতি মনের দ্বারা বাক্যরূপ মিথুন হইয়াছিলেন। বাক্য বেদবাক্য, মিথুন যুগল অর্থাৎ অর্থযুক্ত বেদবাক্য।

"অনাদি-নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। স্মৃতিঃ

স্বয়ম্ভূ প্রথমে উৎপত্তি-বিনাশ বর্জ্জিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে সকল বাণী হইতে এই সমস্ত প্রবৃত্ত হইয়াছে।

"নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে সমহেশ্বর ইতি। স্মৃতিঃ

পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দ লইয়া, স্মরণ করিয়া ভূত সমূহের নামের, রূপের ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বেসাঞ্চ সনামাণি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্যএবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে। স্মৃতিঃ

তিনি আদৌ এ সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম ও অবস্থা বেদশব্দ হইতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

যিনি যে কোন বস্তু প্রস্তুত করুন সকলকেই আগে তাহার বাচক শব্দ মনে করিতে হয়, তাহা স্মরণ করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহা সম্পন্ন হয়। শব্দ ও অর্থ মনে না আসিলে কেহই কিছু করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এতদ্দৃষ্টে জানা যায় সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মনেও অস্মদাদির ন্যায় বৈদিক শব্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব বেদ মানুষবিরচিত নহে। যদি একান্তই কৃত বলিবার সাধ থাকে তবে পরমেশ্বর কৃত বল। সংক্ষেপে পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা উপপাদিত হইল বেদ অপৌরুষেয়, উহাই বাণী, সরস্বতী এবং মূল-শাস্ত্র। পরমেশ্বর আজানসিদ্ধ ঋষিগণ দ্বারা জগতের শিক্ষার জন্য বেদ প্রকাশ করেন।

পরমেশ্বর যেমন ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সদ্ভাবগুলি দ্বারা অন্তঃকরণ বিভূষিত করিয়াছেন তেমন তাহার প্রবর্ত্তন জন্য শাস্ত্র ও আচার্য্যের সংস্থানও করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেদাদি শাস্ত্র ও সনক সনন্দাদি আজান সিদ্ধমহাত্মাগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা শাস্ত্রাচার্য্য ভিন্ন অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব কথা জানিতে পারি না,—অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে পারি না। প্রত্যক্ষীভূত কার্য্যগুলি ও আপ্তোপদেশ ভিন্ন অবগত হইতে পারি

না। হিতাহিত নিরূপণ করা মাদৃশজনের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেবল উপ-দেশ সাহায্যে, যাহা কিছু অবগত হইতে পারি। হিতশাসন করে বলিয়া "শাস্ত্র" এই নাম রক্ষিত হইয়াছে। হিত-শাসকের দাস হইতে মানবমাত্রে-রই সাধ থাকে। এই জন্য মনুজগণ শাস্ত্রের অনুগত। "হিতশাসনাৎ শাস্ত্রম্।" আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমশঃ সংসারে সংসক্ত হইয়া উঠি। দেখি সংসার, ভাবি সংসার এবং বুঝি সংসার। সুতরাং পরমতত্ত্ব অপরি-জ্ঞাত থাকে। শাস্ত্র সেই অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেয়, এজন্য "অজ্ঞাত জ্ঞাপকং শাস্ত্রং" এরূপ লক্ষণ বিনির্দ্দিষ্ট আছে। যাহা কেহ জানে না, অন্য উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্র কেবল তাহাই জানায়, উপদেশ করে। অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপন করিতে হইলে, হিতাহিত বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইলে, কতক বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং কতকবিষয়ে নিবৃত্তি করিতে হয়। ইহাই প্রকৃতত্ত্ব। "সদা সত্য কহিবে" উহাতে স্বর্গ হয়, ইহার প্রবৃত্তি স্বর্গলাভ, এই ফল শ্রুতিদ্বারা সত্যে প্রবৃত্তি করে। শাস্ত্রভিন্ন কিরূপে জানিব যে সত্যে স্বর্গ হয়। আবার "মিথ্যা কহিও না", কহিলে নরক হয়। নরক ভয় প্রদর্শন দ্বারা মিথ্যা হইতে নিবৃত্তিকরে। মিথ্যা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া সত্য পথে থাকিলে হিত হইবে, এই হিতশাসন দ্বারা শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব। এই সমস্ত কথা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্র সমস্ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জনক।

"প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসা যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে।"

বাচস্পতি মিশ্রকৃত বচন।

অপৌরুষেয় বা পৌরুষেয় গ্রন্থগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিজনক যে বাক্য দ্বারা জীবের উপদেশ লাভ হয় তাহাকে শাস্ত্র বলে। শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য এক। একমাত্র প্রয়োজন হইলেও সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে তদনুকূল অশেষার্থ প্রতিপাদন করা শাস্ত্রের কার্য্য।

"এক প্রয়োজনোপনিবদ্ধ মশেষার্থ প্রতিপাদকং হি শাস্ত্রম্।"

সংসারী মানবমাত্রেই ভ্রম-প্রমাদ সঙ্কুল। সুতরাং কৃতগ্রন্থে ভ্রম থাকি-বার সম্ভব। অভ্রান্ত বাক্য ভিন্ন নির্ভর করিতে সাহস হয় না। সেই অভ্রান্ত

বাক্য বেদ। ঈশ্বর যেমন একদা এই জগৎ ব্যাপার প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন, যে শক্তি একবার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই ঐশী শক্তির ফলে জগৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া এক সময়ে শেষ হইবে। প্রতিদিন নব নব জগৎ সর্জ্জন কার্য্য হইতেছে না। এক দিনই সৃষ্টি হইয়াছে। তেমন বেদও নিত্য নূতন সৃষ্ট হওয়ার আবশ্যক নাই। এক দিনই প্রকাশিত হইয়াছে এই জন্ম বেদের ন্যায় সনাতন গ্রন্থ আর নাই। হইবেও না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক ধর্ম্ম ঈশ্বরানুগ্রহে প্রচারিত হইয়াছে। সৃষ্টি কালে বেদের প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ সেবনকারী ঋষিগণও আবির্ভূত হইয়া কর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও কর্ম্ম-সন্ন্যাস শিক্ষা দিয়াছেন। মরীচি প্রভৃতি প্রবৃত্তধর্ম্মে আর সনকাদি নিবৃত্তিধর্ম্মের শিক্ষক।

"স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্ম্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্ম-গ্রাহয়ামাস বেদোক্তং। ততোন্যাংশ্চ সনক সনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞান বৈরাগ্য লক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

ভগবানশঙ্করাচার্য্য

শাস্ত্র সমস্ত দুইভাগে বিভক্ত, অকৃত ও কৃত। অকৃত শাস্ত্র আবার দুইভাগে বিভক্ত। বেদ ও বেদান্ত। যদিও উভয়ই বেদ, তথাপি কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক শ্রুতি সাধারণতঃ বেদ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং জ্ঞান কাণ্ডাত্মক শ্রুতি বেদান্ত বা উপনিষদ বলিয়া প্রচলিত,—উভয়ই বেদ। বেদ, ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ক। যে যেরূপ উপযুক্ত তাহার জন্য বেদের এক এক ভাগ উপযোগী। এতদভিন্ন বেদে অন্যান্য বিদ্যাও আছে। বেদ সর্ব্ব বিদ্যার মূল। বৈদিক জ্ঞানের সহায়তা করে বলিয়া বেদাঙ্গ গ্রন্থও আদরের। দর্শন শাস্ত্রের মধ্যেও মীমাংসাদ্বয় বৈদিক জ্ঞানলাভের সম্পূর্ণ উপযোগী। বৈদিক জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না। এজন্য ব্রহ্মকে "বেদান্তবেদ্য" ও "ঔপনিষদ্ পুরুষ" বলে। বেদান্ত-সাধন ভিন্ন পরব্রহ্মকে জানা যায় না, "না বেদবিন্মনুতেতং" ইতি শ্রুতিঃ।

অবেদবিদ্‌গণ তাহাকে জানিতে পারে না। এস্থলে অবেদ বিদ্ অর্থ অবেদান্তবিৎ।

পরব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়। কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা গ্রহণ করা যায় না।

"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্ ইতি। শ্রুতিঃ

পরমেশ্বর, জড়পদার্থবৎ প্রত্যক্ষীভূত হন না। অনুমান প্রমাণের ও বিষয় নহেন; কারণ সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত অনুমান জন্মেনা। উপরোক্ত শ্রুতি ও যুক্তিতে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহিঃপ্রবৃত্ত এবং তাহাদের বিষয় ও বাহিরে। ইন্দ্রিয়গণ উপর উপরই দেখে, অন্তরে কি তাহা দেখিতে বা গ্রহণ করিতে বা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে। সেই জন্যই সর্ব্বান্তরতম ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। অতএব ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রমাণক। সেই শাস্ত্র বেদান্ত (উপনিষদ্)। এবং তদনুকূল শাস্ত্রাদি ও সৎপথের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় এই জন্য বেদান্ত দর্শন সাত্বিক শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

"সাত্বিকং তত্র বেদান্তং মীমাংসা রাজসংস্মৃতম্।
তামসং ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ হেতুবাদাভি শাস্ত্রতম্।"

১ স্ক, ১ম, অ; ১৪ শ্লোক দেবীভাগবত।

বেদ সর্ব্বশাস্ত্রের মূল। বেদের মধ্যে বেদান্তভাগ তত্ত্ব জ্ঞান-সাধক। উহাই বেদের শিরোভাগ। উহাদ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় বলিয়া উহাকে উপনিষদ্ বলে। উহাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া উহাকে আত্মবিদ্যা, আধ্যাত্মিক বিদ্যা বলে। একান্তে গুরূপদেশ বলে আত্ম তত্ত্ব সাধন করিতে হয়, এবং যাকে তাকে উহার তাৎপর্য্য বলিতে হয় না, এজন্য উহাকে রহস্য বিদ্যা বলে। ইহা দ্বারা সেই অক্ষর অবিনাশী চিন্ময় ব্রহ্ম তত্ত্ব জানা যায় বলিয়া ইহাকে পরা বিদ্যাবলে। বেদের অন্তভাগ পর্য্যন্ত আর সমস্ত অপরা বিদ্যা। বেদান্ত বিদ্যা পরা হইলেও সকলের পক্ষে সুফল দায়ক হয় না। আম-মৃৎপাত্রে ঘৃত রক্ষিত হইলে সেই পাত্র অচিরে গলিয়া যায়, নষ্ট হয়। তেমন বেদ বিদ্যাও অপাত্রে ন্যস্ত হইলে বিপরীত ফল দেয়। বেদের এই এক আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য যে, যে যে প্রকৃতির লোক, সে তভাবেই বেদকে দেখে। পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেহ, মন পবিত্র না হইলে বৈদিক জ্ঞান জন্মে না। আচারে সাধু না হইলে বেদবিদ্যা বিস্ফুরিত হয় না। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।"—

অধুনা নবীন বাবুগণ বলিয়া থাকেন হিন্দুগণ শাস্ত্রের দাস ও শাস্ত্রান্ধ। আমরা বলি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ দাস হইলেই ভারত আবার ভাস্বর হইবে। ভারত যখন শাস্ত্রাধীন ছিল তখনই ভারত জগৎ-গুরু হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত করিয়াছে। যখন তাহার ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে তখন হইতেই ভারত অধঃপাতে যাইতেছে। আহা! আবার কবে সে দিন হইবে? প্রতি দেহে জ্ঞান-গঙ্গা অবিরাম বেগে প্রবাহিত হইয়া আশ্রম পরিপুত করিবে, ভক্তি প্রশ্রবণ দুর্দ্দমবেগে উচ্ছলিত হইবে। গুরুচরণে অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মিবে। সত্য, সারল্য, সংযম প্রভৃতি দেবগুণ প্রকাশিত হইয়া প্রতিগৃহে নির্ম্মল শারদ চন্দ্রমার প্রভা বিকাশিত হইবে। কুতর্ক, অসদালাপ পরিহার পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রণিধানে মতি জন্মিবে? আসুরী মতি ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া ভারতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিল। দুর্গন্ধের বাতাসে দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন করিল। বাবু-বুদ্ধিতে শাস্ত্র অকিঞ্চিৎকর। অসুরের নিকট স্বেচ্ছাচার ভিন্ন সংযম বিশেষরূপে ক্লেশদায়ক হয়। ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি অনুসারে বিচরণ করা অসুরের কার্য্য, আর তাহাদিগকে দমন করিয়া আয়ত্তরাখা শাস্ত্রাধীনের কর্ত্তব্য। শাস্ত্র ভিন্ন সৎপথ প্রদর্শন করিবার সাধ্য বর্ত্তমান কালের পানাশনোপভোগমাত্র।" পুরুষকার "বাবু-কদম্বের" নাই। ম্লেচ্ছাচার অনুকরণ বাবুর কার্য্য। আর্য্যাচার অনুসরণ শাস্ত্রান্ধের কার্য্য। ভগবান কলিমাহাত্ম্য বিস্মৃত না হইলে আর "বাবু-বৃহের" সুমতি হইবে না। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সমুচিতরূপে প্রতি হৃদয়ে নিহিত না হইলে আর ভদ্রতা নাই। শাস্ত্র ব্যতীত হিতশাসক আর নাই। অন্ধের যষ্টি, রোগের মহৌষধ, ভবসাগরের উত্তরণ চিরভাসমান নৌকা, শাস্ত্র। শাস্ত্র-পথের পান্থ না হইলে কুপথে বিচরণ করিতে করিতে বিচার জ্ঞান তিরোভূত হইবে। অন্তিমে শাস্ত্রবেদ্য ভূত-ভাবন কৃপানিধান ভগবান শ্রীচরণ সরোজদলে আর স্থান দিবেন না। শাস্ত্রই অশরণের শরণ, অগতির গতি।

জন্মান্তর (প্রতিবাদ)।

গত জ্যৈষ্টমাসের "বেদব্যাসে" শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জন্মান্তর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার উপসংহারকালে প্রকৃত

জন্মান্তরের একটু আভাস থাকিলেও জন্মান্তর সমর্থনের যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রকৃত ফল কিছুই হয় নাই। তাঁহার প্রমাণিত জন্মান্তর আর শাস্ত্র সম্মত জন্মান্তর এক নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ আস্তিকতার পোষক না হইয়া প্রকারান্তরে নাস্তিকতার পক্ষ সমর্থন করিতেছে।—ক্রমে বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখা যাক্ শাস্ত্রমতে জন্মান্তর;—কি?

শাস্ত্র বলেন, আত্মা নিত্য, চেতন, ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় ও সুখ দুঃখাদির ভোক্তা; যেমন আকাশ সেই অনাদি কাল হইতে সমস্ত জগতের অন্তরে বাহিরে সংবদ্ধ হইয়া অমর অজর ভাবে রহিয়াছে ও অনন্তকাল থাকিবে; সেইরূপ, আত্মাও জরা মরণ আদি মধ্য রহিত হইয়া এই জগতে সর্ব্বত্রগরূপে বিরাজমান।

কত কত দুর্ভিক্ষ, কত মহামারী—এই নশ্বর ভূমণ্ডলে, আপনার আপনার প্রতাপ জারি করিয়া, নশ্বর অচেতন জড়পিণ্ডরাশিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া আপনি কালসাগরে ডুব দিতেছে, কিন্তু আত্মার তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই। কত শত প্রাকৃতিক উপপ্লবে, পর্ব্বত, নগর, নদনদী, বন বনস্পতি বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে তথাপি আত্মা অবিকৃত, চিরকাল এক ভাবে অবস্থিত (১)। আত্মার, রূপ নাই, গন্ধ নাই, রস নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই, আত্মার গতি নাই, ক্রিয়া নাই।—আত্মায় আছে সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ জ্ঞান, যত্ন, আত্মার আছে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম। এই আত্মাই বিশেষ বিশেষ শরীরাবচ্ছেদে স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল—সুখ দুঃখ ভোগ করেন। শরীর সুখ দুঃখের অবচ্ছেদক বটে কিন্তু চেতন নহে, উহা জড়পিণ্ড। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, যাহা কিছু বল তৎসমস্তগুণই এই শরীরের। শরীর এক বস্তু আর আত্মা আর এক বস্তু। এই আত্মার সহিত দেহের অপূর্ব্ব সম্মিলনই আত্মার বা প্রাণীর জন্ম। নশ্বর দেহের পুনঃ পুনঃ নাশ হওয়ায় নিত্য আত্মাকে কর্ম্মফলে বার বার শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে আত্মা, যে দেহের

---

(১) নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। ২৩।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ২৪

সহিত সম্মিলিত হ'ন, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দেহ-সম্বন্ধ ও পরবর্ত্তী দেহ-সম্বন্ধকে জন্মান্তর বলা যায়। ইহা ভিন্ন নিত্য আত্মার অন্তরূপ জন্ম বা জন্মান্তর হইতে পারে না।

এই শরীর ধারণে যে সৎকার্য্য বা অসৎ কার্য্য করা যায়, তাহার ফল পুণ্য বা পাপ আত্মাতে সঞ্চিত থাকে, তাহার ফল সুখ বা দুঃখ—কাহারও এই শরীর ধারণেই হইয়া থাকে, কাহারও বা ভাবি শরীর ধারণে ভোগ করিতে হয়। মনে কর আমি ইহজন্মে বাঙ্গালী আছি পরজন্মে ইয়ুরোপীয় হইলেও তদবস্থায় আমাকে সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। বাঙ্গালী হওয়া বা ইয়ুরোপীয় হওয়ার প্রতি কর্ম্মফল কারণ। যাদৃশ উপাদানে আমার এই দেহ গঠিত হইয়াছে পরজন্মের দেহ তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার উপাদানে গঠিত হইলেও ইহজন্মের কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। জন্মান্তর সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তই শাস্ত্র-সম্মত। (২)।

এক্ষণে দেখাযাক্ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অনুমিত জন্মান্তর কিরূপ?

(জ্যৈষ্ঠমাসের বেদব্যাস ৪৭ পৃষ্ঠা শেষ প্যারা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিলে বুঝিতে পারিবেন)।

তিনি বলেন "মনুষ্য" দেহী বা আত্মা নহে,—দেহ। আত্মার রূপ নাই, সুতরাং আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি বা জন্মান্তর অনুমিত হইতেছে না। পরন্তু যাহা রূপ-

---

(২) নিমিত্ত মক্ষর কর্ত্তা বেদো ব্রহ্মগুণী বশী।
অজঃ শরীর গ্রহণাৎ সজাত ইতি কীর্ত্যতে ॥ ৬৯ ॥
ইহ কর্ম্মোপভোগায়সংসরতি সোহবসঃ ॥১৬॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণী ইত্যুপক্রম্য অব্যক্ত মাত্মাক্ষেত্রজ্ঞঃ
ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে।...১৭৮। বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য
কেষাঞ্চিদ্যি জায়তে। ইহ বামুত্র বৈকেষাং ভাবস্তত্র
প্রয়োজনম্। ১৩৩। অন্য পক্ষি স্থাবরতা মনো বাককায়
কর্ম্মজৈঃ দোষৈঃ প্রয়াতি জীবোঽয়ং ভবং যোনিশতেষু চ ॥ ১৩১ ॥
যথাহি ভরতোবর্ণৈর্ব্বর্ণয় ত্যাত্মন স্তনুম্।
নানারূপাণি কুর্ব্বাণ স্তথাত্মা কর্মজাস্তনূঃ ॥ ১৬২ ॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৩য় অধ্যায়
বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি,।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানিদেহী—। ২২।
ভগবদ্গীতা ২য় অধ্যায়।

বান্ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অচেতন জড়পিণ্ড, সেই দেহেরই জন্মান্তর অনুমিত হইতেছে। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় "দেহের অবস্থা বিশেষই জন্মান্তর, সদসৎ কার্য্য ফলও দেহনিষ্ঠ।" আত্মা না মানিলেও এরূপ জন্মান্তর মানাতে কোন ক্ষতি নাই। প্রত্যুত চিরপ্রচলিত "জন্মান্তর" কথাটার একেবারে উচ্ছেদ না করিয়া যথা কথঞ্চিৎ তাৎপর্য্য প্রকাশ করায় নাস্তিকদিগের লাভ আছে। তাইবলি "বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধ, আস্তিকতার পোষক না হইয়া প্রকারান্তরে নাস্তিকতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে।" আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে শাস্ত্রমতে জন্মান্তর কি এবং সদসৎ কার্য্য ফল কাহাতে থাকে।

এখন দুইটী মত তুলনা করিয়া দেখ, পরস্পর কত বিভিন্ন। বলিতে কি বিদ্যাবাগীশ মহাশয় "লিঙ্গাত্মা" কথাটার উল্লেখ না করিলে হয় ত তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন চার্ব্বাক মতাবলম্বী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিতাম্। ভাগ্যক্রমে আমাকে সে পাপজনক ভ্রমে পতিত হইতে হয় নাই।

এক্ষণে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ভবিষ্যতে "জন্ম ও জন্মান্তর" সম্বন্ধে শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি অসানুরে কিছু লিখিতে বাসনা রহিল।

কংগ্রেস ও দাঁইহাট হরিসভা।*

হিন্দুজাতি অধঃপতিত। জাতীয় জীবন নষ্টপ্রায়। ভারত ব্যাপিয়া সমাজমধ্যে একটা ভীষণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে সে দাহ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন হিন্দু মাত্রেই নিজ প্রনষ্ট গৌরব স্মরণ করিয়া ব্যথিত, মর্ম্মাহত এবং লজ্জিত হইতেছেন। লুপ্ত স্মৃতি পুনর্জাগরিত হইয়াছে। হিন্দুর স্বীয় জীবনে কতকটা ধিক্কার জন্মিয়াছে। এখন সকলেই প্রতিকার চেষ্টায় তৎপর হইয়াছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই নিজ সমাজের উন্নতিতে যত্নপর। সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মাথা ঘামাইয়া

---

* ফাল্গুণ মাসের বেদব্যাসে "সদনুষ্ঠান" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা "প্রবন্ধান্তরে আমাদের মন্তব্য সহ সভার উদ্দেশ্য ও বিবরণ প্রদত্ত হইল" এইরূপ লিখিয়া ছিলাম। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ গতবারে প্রবন্ধটি পত্রস্থ হয় নাই। সুতরাং এবারে তাহা প্রকাশিত হইল।

সমাজের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কতক চিন্তা ফলদায়িনী হইয়েছে, কতক বা সম্পূর্ণ বিষময় ফল প্রদান করিয়া গত প্রায় সমাজকে আরও মুমূর্ষু করিয়া তুলিতেছে। কেহ পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্ত্তনে প্রয়াসী, কেহ রাজ নৈতিক উন্নতি বিধান দ্বারা হিন্দুজাতিকে উন্নত করিতে যত্ন পর কেহ বা হিন্দুসমাজকে একবারে ধ্বংশ করিয়া নুতন ভিত্তি গাঁথিয়া নূতন সমাজ গঠনে উদ্যোগী। ফল যাহাই হউক অধিকাংশের, উদ্দেশ্যই যেসমাজ-কল্যাণ কামনা ইহাই বাস্তব দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এইরূপ সমাজ-হিত চিন্তারূপ কার্য্যের একটি ফল ন্যাশন্যাল কংগ্রেস বা জাতীয় সমিতি। জাতীয় সমিতি কেবল হিন্দু সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন, সমগ্র ভারতের কল্যাণে বদ্ধ পরিকর। হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান, আর্য্য, অনার্য্য সকলকে জড়াইয়া জাতীয় সমিতি এক মহাব্রতে ব্রতী হইব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সমিতির সভ্যগণ বলিয়া থাকেন যখন ইংরাজ আমাদের রাজা তখন তাহাদের মনাকর্ষণ জন্য ইংরাজী ব্রতে ব্রতী না হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবে না। যদিও ব্রত সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের ধারণা জাতীয় সমিতির যে কি প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। বিজ্ঞেরা উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করেন অনভিজ্ঞেরা বিনা উদ্দেশ্যেই কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য একবারেই নাই বলিলে উহার উপর তীব্র দোষারোপ করা হইল। যদিও আমাদের এতদূর দোষারোপ করা ভাল শুনায় না, কিন্তু এতাবৎ জাতীয় সমিতির কার্য্য দেখিয়া উহার যে প্রকৃত কি উদ্দেশ্য তাহা এখনও আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। যতদিন জাতীয় সমিতি নিজকার্য্যের দ্বারা তাঁহার প্রকৃত লক্ষ্য কি তাহা না দেখান ততদিন আমরা উহাকে বালকের উদ্দেশ্য বিহীন ক্রিড়া ভিন্ন আর কি বলিব।

জাতীয়-সমিতির যে কোন লক্ষ্য নাই তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি। শিশুকে আমরা উদ্দেশ্য বিহীন বলি কেন? অবশ্য তাহার কার্য্য দেখিয়া। বালক চাঁদ ধরিতে চায়, বালকের খেয়ালের ঠিক থাকে না। এক এক দ্রব্যের জন্য ক্রন্দন করিল তাহা পাইতে না পাইতে আর এক জিনিষের জন্য মহা ধুম বাধাইয়া দিল। মন বৃত্তির যখন যেরূপ উত্তেজনা হয়, বালক তাহাই চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু বৃত্তি চরিতার্থের আস্বাদন লাভে প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা লিপ্সা না থাকায় এবং বৃত্তি চাঞ্চল্য বশতঃ উহা চরিতার্থ হইতে না হইতে অন্য বৃত্তি সঙ্গে২ উত্তেজিত হওয়ায় তখনই পুর্ব্ব-বৃত্তির সমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কিছুরই স্থির থাকে না। এইরূপ মুহূর্মুহু চাঞ্চল্য বশতঃই বালকের কার্য্য এতহেয় হইয়াছে। কার্য্য জন্যই বালক সর্ব্বথা হেয়, আমাদের ন্যায় শৃঙ্খল নহে বলিয়া বালক হেয় নহে। তাহা হইলে ধ্রুব প্রহ্লাদের এত গৌরব হইত না। অতএব ইহা যখন সিদ্ধান্তিত সত্য যে কার্য্যতেই বালকত্ব প্রকাশ পায়, তখন আমরা কার্য্য

দেখিয়া সমিতির কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অবশ্য ক্ষমতাবান্। যখন দেখিতেছি যে সমিতির কোন কার্য্যেরই প্রতি দৃঢ়তা নাই—কারণ তাহা অসম্ভব—তখন সমিতির দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের আশা সুদূরপরাহত।

সমিতি চান চাঁদ ধরিতে—ইংরাজের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া ইংরাজের স্বার্থে বিঘ্ন জন্মাইতে। ইহা বালকের ক্রিড়া নয়ত কি বলিব? সুচতুর ইংরাজকে কৌশলে মুগ্ধ করে এরূপ বুদ্ধিমান প্রাণী এখনও জগতীতলে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। ইংরাজ নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণরূপ অটুট রাখিয়া কদাচিৎ কোন পরোপকারে প্রস্তুত হইতে পারেন, অথবা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। নচেৎ ইংরাজ ন্যায় অন্যায়, উপকার অপকার, যশঃ অযশঃ কিছুরই তোয়াক্কা রাখিতে চান না। যদি তুমি মনে কর ইংরাজীধরণে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া দেশ কাঁপাইয়া ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিব। তাহা তোমার নিতান্ত ভ্রম। ইংরাজী-রাজনৈতিক-তত্ত্ব ইংরাজ যত বুঝেন তাহার সহস্রাংশের একাংশ তুমি বুঝ না। তোমাদের রাজনৈতিক উন্নতি হইতেছে কি না হইতেছে তাহা তুমি বুঝিবার বহুপূর্ব্বে ইংরাজ বুঝিয়া থাকেন এবং তাহার জন্য যতটুকু সতর্ক হওয়া আবশ্যক তাহাতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। তুমি বিজিত, জেতৃ সকল অবস্থায় নিজ স্বার্থ বজায় রাখিয়া তোমার উপর আধিপত্য করিবেই করিবে।

আজ চারি বৎসরেরও অধিক হইল জাতীয় সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। অতি সমারোহের সহিত ইহার চারিটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দেশমধ্যে মহা হুলস্থুল ব্যাপার হইয়া গেল। যেন মহা রাজসূয় যজ্ঞ উদ্যাপিত করিতে এক বিরাট আয়োজনের সূত্রপাত হইতেছে। এত ব্যাপার ঘটিল কিন্তু ফল কি ফলিল? উদ্দেশ্য কি স্থির হইল? সুতরাং প্রথম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়াগ-যজ্ঞের অবসান পর্য্যন্তসমস্ত কার্য্য প্রণালীর অভ্যান্তর পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, যে কারণে বালকের কার্য্যকে উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য বলিয়া অশ্রদ্ধের বোধ করা যায়, জাতীয় সমিতির কার্য্যেও সেই সমস্ত কারণ বিদ্যমান। যদি চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা বেশী কিছু অপ্রাপ্য থাকে তাহাও যেন ধরিতে জাতীয় সমিতি বদ্ধ পরিকর। যাহা কখন স্বপ্নেও পাইব না তাহা পাইতে উল্লম্ফণ, আস্ফালন করিলে লোকে পাগল বলে, পরিহাস করে, তাচ্ছল্য করিয়া থাকে; কারণ প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষাত কখন পুরিবে না। তাই প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সমিতির কার্য্যকলাপ দেখিয়া সন্তুষ্ট নহেন। সমিতির যাঁহারা প্রকৃত বন্ধু তাঁহাদের মধ্যেও অল্পে অল্পেসন্দেহ ঢুকিয়াছে। এখন তাঁহারা অনেকটা বুঝিয়াছেন যে তাঁহারা আশার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। সেই জন্য প্রয়াগাধিবেশনে কতকটা হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যত দিন যাইবে বুদ্ধি স্থির হইবে। উদ্দেশ্যও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে থাকিবে। যে উদ্দেশ্য কোনকালে সিদ্ধ হইবার আশা নাই তাহা দুর্ব্বল বাঙ্গালীর হৃদয়ে কতদিন স্থান পাইবে? যখন "রাজনৈতিক হালে

আর পানি "পাইবে না তখন হিন্দুকুল ধুরন্ধরেরা হিন্দু সমাজ লইয়া টানাটানি করিবেন। কারণ, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেরত আর মা-বাপ নাই, হিন্দু-সমাজের পক্ষে লর্ড ডফারিণের মত, শাসন কর্ত্তাও নাই। সুতরাং স্বদেশহিতৈষণা দেখাইয়া নিজের নাম জাহির করিতে এক অবলম্বন জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছেন, আর তদুপরি ধুরন্ধরেরা যত ইচ্ছা স-বুট লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিয়া ভারত উদ্ধার করিতেছেন। সমিতির প্রকৃতই যদি শক্তির সঞ্চার হয় তাহা হইলে সে শক্তি কখনই প্রবলের দিকে প্রযোজিত না হইয়া দুর্ব্বলের উপরই আধিপত্য করিতে প্রয়াস পাইবে। শক্তি নিজধর্ম্ম (ক্রিয়াশীলতা) পরিহার করিয়া কখনই নিস্তব্ধ থাকিবে না। রাজনৈতিক লক্ষ্য সিদ্ধ না হইলে সমাজ (বিকৃত) সংস্কারের উপর সে শক্তি সঞ্চালনে বিশেষ চেষ্টা হইবেই হইবে। আমরা অদ্য এই ভবিষ্যদ্বাণি করিয়া রাখিলাম যে বর্ত্তমান জাতীয় সমিতি অল্পদিন পরেই হিন্দুসমাজ-বিধ্বংশী-সমিতি বলিয়া পরিচিত হইবে। যাহা এখন অল্পে ২ ধুমায়িত হইতেছে কিছু দিন পরেই তাহা প্রবল বহ্নিরূপে প্রকাশিত হইবে। ন্যায়ের প্রধান সূত্র "পর্ব্বতো-বহ্নিমান্ ধুমাৎ" যেন মনে থাকে। ঐ যে ভাঙ্গা বৈঠকে একটা করিয়া গুপ্ত সমিতি বসিয়া থাকে, যাহা এখন সামান্য ভাবে প্রধুমিত হইতেছে, উহা কালে ভীষণ মূর্ত্তিধারণ করিবে। আগুণ লাগিয়াছে, বাতাসও বহিয়াছে, প্রতিবাসী সমস্তই নিদ্রিত, জলাশয় একবারে জলশূন্য, কুটির প্রাসাদ সমস্তই রৌদ্রতাপে বিশুষ্ক; সুতরাং বহ্নি একবার ব্যপ্ত হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা আসিলে ও আর নির্ব্বাপিত করিতে পারিবেন না। অতএব হিন্দুসমাজ সাবধান!!

প্রয়াগের ভাঙ্গা বৈঠকে যে সমাজ সংস্কারকগণের এক সমিতি বসিয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য ও প্রস্তাব গুলি যাহারা আজ ও শুনেন নাই তাঁহারা একবার শুনুন,—

১ম। অবাধে বিধবা-বিবাহ প্রথা চলিতে দেওয়া হইবে।

২য়। বাল্য বিবাহ একবারে রহিত করা হইবে।

৩য়। বিলাত গমনাগমনের পথ একবারে নিষ্কণ্টক করা হইবে। ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথার একবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আর রাখা হইবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন বুঝিলেন জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য কি? এই প্রস্তাবনা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য বিহিত বিধানে চেষ্টা করা হইতেছে। মিথ্যা সত্য নানা উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। রাজার নিকট বলা হইতেছে যে আমরা সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত, যাহাতে উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য সফল হয় আপনি তাহার সহায়তা করুণ। রাজাও তাহাই চান; কারণ, তাঁহাদের মতে উহাই সভ্যজনাচরিত ব্যবহার। সুতরাং বহ্নিতে বায়ু সঞ্চালিত হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু সমাজ বিদ্বেষীদিগের আনন্দের আর সীমা নাই। এখন হিন্দুগণ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী! অধ্যাপকগণ! জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য কি ...নিলেন?

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অকপট হিন্দুসমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সামাতর কার্য্য কলাপে ভীত হইয়া পূর্ব্বাহ্নেই হিন্দু সমাজকে এই ঘোর শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইয়াছেন। দাঁইহাট হরিসভার সাম্বাৎসরিক উৎসবে সেই আয়োজনের কথঞ্চিৎ সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। "আমি হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি" বলিলেই রাজা যাহাতে উহাদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হন সেই মত চেষ্টা করা এখন কর্ত্তব্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক মণ্ডলীই প্রকৃত হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি। সমাজ তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত। তাহাই ইন্দ্রবাবু যাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের দৃঢ় বন্ধন হয়, তাঁহাদের মর্য্যাদা ও বল রক্ষা হয়, এবং তাঁহাদের অভাব দূরীকৃত হয় সেই জন্য বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও নানাবিধ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া প্রভৃত চেষ্টা করিতেছেন। দাঁইহাট হরিসভার তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া প্রকৃতই আমরা স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাদিগের চক্ষের উপরে যে সমস্ত স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার দ্বারা যে এই কল্যাণকর উদ্যোগ অচিরে সুফল প্রসব করিবে তাহা আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি। হিন্দু আড়ম্বর ঘৃণা করেন, কার্য্য সাধনই হিন্দুর লক্ষ্য; সুতরাং ইন্দ্র বাবুর হুজুগ্ শূন্য কার্য্যে এখনও আন্দোলন উঠে নাই। দাঁইহাট হরিসভার সদনুষ্ঠান মুদ্রিত হইয়া সমগ্র ধর্ম্মসভায় এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর সমীপে প্রেরিত হইয়াছে। এই সময় একবার হিন্দু সমাজ জাগ্রত হউন। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ক্রমান্বয় উপেক্ষার এখন যে বিষময় ফল ফলিতেছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত্রুদিগের প্রতাপ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে রাজার সহায়তা পাইলে সমাজের আভাবনীয় অনিষ্ট ঘটিবে। যাহাতে রাজা প্রকৃত হিন্দু সমাজ কি তাহা বুঝিতে পারেন তাহার উপায় করা হউক।

সমগ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী এবং অধ্যাপকগণ মধ্যে যাহাতে একটি প্রবল শক্তির সঞ্চার হয় তাহার জন্য আবাল-বৃদ্ধ হিন্দু প্রাণপণ চেষ্টা করুণ। সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী যাহাতে হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেন, স্বাধীন মার্গে চলিতে যত্নশীল হন, এবং নির্ভিক অন্তরে সত্যের পক্ষ অবলম্বনে সমর্থ হন, তাহার সহায়তা করা হউক। তাহা হইলেই হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। রাজাও হিন্দু সমাজ কাহাকে বলে বুঝিয়া সমাজের মত লইয়া সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন।

উপসংহারে আমরা বহু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দাঁইহাট হরি সভার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও স্বধর্ম্মপরায়ণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। ভগবানের নিকট কায়-মন-বাক্যে প্রর্থনা করি তাঁহাদের এই সদনুষ্ঠান অচিরে সুফল প্রসব করিয়া বিপন্ন হিন্দু সমাজের উদ্ধার সাধন করিতে সক্ষম হউক। হরি সর্ব্বক্ষণ সহায় থাকুন। ওঁ হরিঃ ওঁ।